মীর-মানস

মুনীর চৌধুরী

আ হ ম দ পা ব লি শিং হা উ স

প্রকাশক

মহিউদ্দীন আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

চৈত্র ১৩৭১

এপ্রিল ১৯৬৫

প্রচ্ছদপট

কালাম মাহমুদ

মুদ্রণে

আলহাজ আবদুল গফুর

দি ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৭৮, মৌলবী বাজার, ঢাকা—১১

মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এ মনীষীর অবদানের স্বরূপ এখন আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়নি। নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিভংগী নিয়ে নির্ভরযোগ্য আলোচনার অভাব আমাদের সাহিত্যে নগ্নভাবে বিদ্যমান। জনাব মুনীর চৌধুরীর 'মীর-মানস' আমাদের সাহিত্যের সে অভাব অনেকখানি পূরণ করতে পেরেছে বলে মনে করি। এতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ন নিষ্ঠা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। পাঠক সমাজের ঐকান্তিক আগ্রহে বইখানির দ্বিতীয় মুদ্রণে উৎসাহিত হয়েছি।

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক : বাংলা একাডেমী

ভূমিকা

কয়েক বছর আগে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব এম-এ ক্লাশে মীর মশার্‌রফ হোসেন পড়াবার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করেন। এই গ্রন্থ রচনার প্রথম অনুপ্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করি। পরে ছাত্রছাত্রীরা সে উৎসাহ নির্বাপিত হতে দেয়নি। বাড়ীতে বসে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' পড়বার সৌভাগ্য ঘটে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেবের কল্যাণে। সৈয়দ মুর্তাজা আলী সাহেব পড়তে দেন 'উদাসীন পথিকের মনের কথা।' রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তির দৌলতে লণ্ডনে বসে মীরের অন্যান্য বই দেখবার সুযোগ লাভ করি। নিতান্ত বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মী হয়েও ডক্টর আনিসুজ্জামান বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ সুহৃদের ন্যায় বিভিন্ন পর্যায়ে রচনার পরিমার্জনায় সাহায্য করেছেন। আমার প্রতি সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারেও সর্বস্তরে অব্যাহত ছিল।

এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ সহজে পরিশোধ্য নয়।

নীলক্ষেত
১৯৬৪

মুনীর চৌধুরী

সূচী

মীর-মানস

১.১. কোনো কবি-সাহিত্যিকের মানসপ্রকৃতি ও শিল্পকর্মের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করার কতকগুলো সাধারণ নিয়ম একাধিক সমালোচকদের কাছ থেকে সমাদর লাভ করে আসছে। রীতিগুলো যে একেবারে অভাবনীয় এবং অপরিবর্তনীয় এমন বলা যায় না। তবে এর শৃঙ্খলাপূর্ণ অনুশীলন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত লেখক সম্পর্কে পাঠক-সাধারণের খণ্ডিত ও অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণাকে সহজে সংহতি ও স্বচ্ছতা দান করে।

প্রথম কর্তব্য পরিবেশকে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা। শিল্পীর জীবন যে স্থান ও কালের অধীন ছিল, তার ব্যাপক পরিচয়কে উদঘাটিত করা। কিন্তু সে পটভূমি ভাব ও কর্মের সহস্র ধারায় অভিসিক্ত, তার সকল আবর্ত হয়ত সরাসরি চিত্তবিশেষকে স্পর্শ করে নি। তাই প্রয়োজন হয় সেই পরিব্যাপ্ত বিরাট পশ্চাৎপটের বিশেষ এলাকা সীমাচিহ্নিত করা, যার সংক্রমণ-বিশেষ শিল্পীর মানস-গঠনকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, তার নানা অনালোকিত প্রবণতাকে প্রখর করে তুলেছে। পরিবেশ থেকে প্রামাণ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্য চয়ন করে, তার সংগে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক স্থাপন করে শিল্পীর সামগ্রিক মানস সংঘটনের একটা মূল্যবান স্থূল প্রতিকৃতি রচনা সম্ভব। এই বিচারেরই বিপরীত পিঠ বা পরবর্তী স্তর হলো শিল্পীর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে তাঁর বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলনকে লোচন করা এবং তার নানা সংকেতকে অনুসরণ করে শিল্পীর পরিপূর্ণ মানস-মণ্ডলের চিত্র রচনা করা। তৃতীয় পর্যায়ে আমরা শিল্পবিচারের ঋজুতর মানদণ্ড আরোপ করে লেখকের কোনো বিশিষ্ট রচনারীতির কোনো সুনির্দিষ্ট রূপের রসোৎকর্ষ ও কলাকৌশলকে পাঠকের ধারণাধীন করে তুলতে সচেষ্ট হই।

বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য মূলত: দ্বিতীয় স্তরের। কখনো কখনো প্রসঙ্গ রক্ষার অনিবার্য তাগিদে প্রথম ও তৃতীয় এলাকার প্রান্ত স্পর্শ করেছি মাত্র।

২.০. মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব বিচার পেশ করবার আগে অন্যান্য গবেষক এই বিষয়ের ওপর নানা গ্রন্থে-প্রবন্ধে যে

সকল মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন, তা সংক্ষেপে জরীপ করা যাক। নানা মুনির নানা মতের সীমানা নির্দেশের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকেও স্পষ্টতা দান করতে সক্ষম হবো। মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হোল :

ক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্বর্ণকুমারী দেবী, 'মীর মশাররফ হোসেন', 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ২৮ নং, ২৯ নং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা, ১৩৫৫)।

খ। কাজী আবদুল ওদুদ, "বিষাদ-সিন্ধু," 'শাশ্বত বংগ', (কলিকাতা, ১৩৫৮) পৃ: ১২৪-১২৬।

গ। আবদুল লতিফ চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেন,' (সিলেট, ১৯৫২)

ঘ। মুহম্মদ আবদুল হাই, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬), পৃ: ৬৯-১১৪।

ঙ। আশরাফ সিদ্দিকী, "মীর মশাররফ হোসেন," 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা,' ১ম সংখ্যা (ঢাকা, ১৯৫৭), পৃ ১৭-২৫। সম্পাদিত 'জমীদার দর্পণে'র ভূমিকা ও পরিশিষ্ট (ঢাকা, ১৩৬২)। মাসিক মোহাম্মদী, মাহে-নও ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ।

চ। কাজী আবদুল মান্নান, "উদাসীন পথিকের মনের কথা," 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,' (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ ৪২-৬৩।

ছ। মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী, "বাজীমাত," 'বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা' (ঢাকা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫)।

জ। আহমদ রফিক, 'শিল্প-সংস্কৃতি-জীবন,' (ঢাকা ১৩৬৬)। দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ "মীর মশাররফ : অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার রূপায়ণ" পৃ ৯৮-১১২।

২.১. বলা বাহুল্য এই রচনাসমূহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। রচনাটি প্রাচীনতম হলেও পরবর্তী কোনো লেখকই মীর সাহেবের সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে অধিকতর ব্যাপক বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যক্ত করতে সমর্থ হননি। মীরের জীবন ও সাহিত্য

সম্পর্কে চুম্বক আকারে যত সংবাদ এখানে সরবরাহ করা হয়েছে, এমন অন্য কোথাও নজরে পড়ে না। বিস্তৃততর তথ্য অনুসন্ধানের যেসব সংকেত এই পুস্তিকায় ছড়ানো রয়েছে, তাকে সম্বল করেই আমরা মীর-সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছি। 'গ্রামবার্তা'র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার যে মীর মশাররফ হোসেনকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে মীরের কোনো কোনো রচনার রদবদল করেছিলেন, বঙ্কিম যে 'বঙ্গদর্শনে' মীরের দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেন, 'ভারতী'তে 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রশস্তি প্রকাশ, 'প্রদীপে' 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ওপর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ, 'বসুধা'য় মীরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা—মীর-সাহিত্যের বিস্তৃত বিচার এবং এই পর্যায়ের আরো নানারকম অজানিত তথ্যের হদিস ব্রজেনবাবুই প্রথম দেন। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে মীর-মানস ও মীরের সাহিত্যকীর্তির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ না হলেও, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি সংকলিত করে এবং প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্যসম্পদের প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ দান করে তিনি সংক্ষেপে সাধ্যমত সম্পূর্ণ মশাররফ হোসেনকে চিত্রিত করেছেন। এই বিচার-বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ সুনির্বাচিত সুশৃঙ্খলিত তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক বর্ণনামূলক সংযোজনা এখন পর্যন্ত তুলনায় ক্ষীণ এবং গৌণ।

হয়ত স্বাভাবিক কারণে একটা বিষয়ে ব্রজেনবাবুর মীমাংসা সীমাবদ্ধ একপেশে। বাংলাদেশের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠির কিছু জীবন্ত কৌতূহল এই পুস্তিকা পাঠের দ্বারা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে না। এ লেখায় জোর পড়েছে মীর সাহেবের সাহিত্যাদর্শের অসাম্প্রদায়িক বিশুদ্ধতার ওপর, মীর-মানসের হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ-লোপকারী প্রয়াসের ওপর, তাঁর ভাষার সংস্কৃতানুসারী সাধুতার ওপর। অবিশ্লেষিত থেকে গেছে মীর-মানসে মুসলমানি ঐতিহ্যের চক্রমণ, মীর-রচনাবলীর মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনার বহুরূপী প্রকাশ। মীর-রচনাবলীর এক বৃহৎ অংশ যে এই প্রশ্নের বিশদ বিচার দাবী করে, সে কথা অস্বীকার করবে কে!

২.২. আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুল লতিফ চৌধুরীর রচনা মূলতঃ বর্ণনামূলক, তথ্য পরিবেশনই তার প্রধান লক্ষ্য। দু'জনের মধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর রচনা সংখ্যার বাহুল্যে এবং অনুসন্ধান-কর্মে অক্লান্ত শ্রমশীলতার জন্য পাঠক-সাধারণের কাছে অনেক বেশী প্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ। তবু যেসব কারণে তার আলোচনা কৌতূহলী বিশেষজ্ঞের কাছে যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা আস্থা উদ্রেককারী নয়, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত আশরাফ সিদ্দিকী পরিবেশিত পুঞ্জীভূত তথ্যের অন্তর-পরিচর্যা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সামগ্রিক উপলব্ধির পরিচয় বহন করে না। এই কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সরলতা, বিচ্ছিন্নতা ও আকস্মিকতা মীরের দুনিয়া বা ধান্দা সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রকৃত নেত্রমুক্তি ঘটায় না। সম্প্রতি প্রকাশিত (মাহে নও, ডিসেম্বর ১৯৬০, ঢাকা) "হিতকরী" প্রবন্ধে কবে এই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, কোন্ কালে কে তার সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, এজেন্ট ছিলেন, কোন্ ছাপাখানা থেকে ছাপা হোতো, সে ছাপাখানার মালিক কে ছিলেন ইত্যাদি লঘুগুরু সংবাদের জটিল তালিকা দিয়েছেন। কেবল যখন "হিতকরী" প্রথম পর্যায়ে মীর মশাররফ হোসেন দ্বারা সম্পাদিত হোতো তখন এই পত্রিকায় কারা লিখতেন, কি নিয়ে লিখতেন, কোন্ ঢংয়ে লিখতেন সেই অতিবিহিত সংবাদটাই প্রচার করলেন না। ১৮৯৯ খ্রীঃ বা ১৩০৬ বাংলা সনে "হিতকরী" নব পর্যায়ে খাঁটি ও নিখুঁত মুসলমানি ভাবে প্রচারিত হওয়ায় মীর-মানসের কোনো উল্লেখযোগ্য স্তরোত্তরণ সূচিত হোলো কি না, মীরের সমগ্র সাহিত্যকর্মের বিবর্তনধারার সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি আছে কি না, সে সব কথা অমীমাংসিত থেকে গেল। 'জমীদার দর্পণে'র আলোচনা প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকী কাঙাল হরিনাথ সম্বন্ধে যে পর্যাপ্ত তথ্যের অবতারণা করেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা গোটা প্রবন্ধের আয়তনের অনুপাতে গৌণ, মূল সিদ্ধান্তের পোষকতার বিচারেও মামুলী। স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল যে কাঙাল হরিনাথের জীবন-চেতনা বরাবর এক তালে চলে নি, লালন ফকির এসে তার মূলে মোচড় দিয়ে গেছেন। মীর সাহেব উভয় স্তরেই কাঙালের সুহৃদ ছিলেন।

প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে এই ভাবদ্বৈতের কোনো স্পষ্ট স্বীকার নেই, ব্যাখ্যা নেই। এমন কি কাঙালের সংগে লালনের সাক্ষাৎকারের সময় নির্দেশের জায়গায় এসে লেখক অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। শুধু বললেন, কাঙাল যখন কুমারখালীতে তখন। তথ্য জড় করেও সত্য প্রতিষ্ঠার বেলায় মীরের চিত্তদর্পণের একাংশকেই মাত্র মূল্য দান করলেন। তাও এমন এক অংশের যার ধারণা লাভ করা খুব শ্রমসাপেক্ষ ছিল না।

আশরাফ সিদ্দিকীর সাহিত্য-বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো সর্বাপেক্ষা সরল ও দুর্বল। নাটক হিসেবে 'জমীদার দর্পণে'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে, মীরের সমাজ-চেতনার নির্বিরোধ বাঙালিয়ানার পরিচয় দিতে গিয়ে, মীরের ভাষার খাঁটিত্ব বোঝাতে গিয়ে গর্জমান ইংরেজী বাংলা উদ্ধৃতির যে আড়ম্বর প্রকাশ করেছেন তা বর্জনেই সিদ্ধান্ত বেশী পোক্ত হোতো। মীরের পূর্বসূরীদের নামের তালিকা দিয়াছেন গুরুত্বপূর্ণ কালক্রম লংঘন করে, মুখ্যগৌণের ভেদ অস্বীকার করে তাঁহাদের সবাইকে দায়ী করেছেন সংস্কৃত রীতির নকলকার বলে। শেষ অনাবশ্যক সাফাই হিসেবে মীরের গতানুগতিকতাকে তুলনা করেছেন 'জলে যেন ভাসে মীন' এই প্রবাদ বাক্যের সুলভ সত্যতার সংগে।

গবেষণামূলক প্রবন্ধে উদঘাটিত তথ্যের বিদ্যমানতা সম্পর্কে পাঠকের পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। একবার সেটা নষ্ট হলে সবই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা পাঠ করে সকল সময় ঠাহর করা যায় না যে, কোন্ তথ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সত্যি প্রত্যক্ষ, কোন্ ক্ষেত্রে সেটা পরোক্ষ, আর কখন একেবারেই কল্পিত। 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য় "মীর মশাররফ হোসেন" প্রবন্ধে তিনি মীর-বংশের যে পীঠিকা তৈরী করেছেন, তা প্রমাদপূর্ণ। মীর সাহেব আরবী ফারসী নানা ভাষা এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, একথার কোন প্রমাণ নেই। মশাররফ হোসেন কোনো কালেই মেম বিয়ে করেন নি। কি হয়েছিল তার অকপট বর্ণনা আছে 'বিবি কুলসুমে', 'আমার জীবনী'তে নয়। মেম-সংক্রান্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল কুলসুমকে বিয়ে করার অনেক

পরে, আগে নয়। আশরাফ সিদ্দিকীর তথ্যবহুল প্রবন্ধে সত্যাসত্যের এমন এলোমেলো মিসাল সতর্ক পাঠকের শ্রদ্ধাবোধকে বিচলিত করে।

আবদুল লতিফ চৌধুরীর বইয়ের ভিত্তি ব্রজেনবাবুর পুস্তিকা। তবে যে সকল বই লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন, সেগুলো সম্পর্কে স্বভাবতই বিস্তৃততর পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'বিবি কুলসুম' ও 'এসলামের জয়ে'র ওপর লেখা অংশগুলো পড়ে অনেক পাঠক উপকৃত বোধ করবেন। কিন্তু যে সকল বই লতিফ সাহেব দেখেন নি অথচ তার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে মতামত হয় নিতান্ত মামুলী ধরনের, নয় রীতিমত বিভ্রান্তকারী হয়েছে। যেমন সুকুমার সেনের ওপর বরাত দিয়ে 'রত্নবতী'কে বলেছেন রোমাণ্টিক উপন্যাস। আশরাফ সিদ্দিকীও 'রত্নবতী'কে রোমান্সমূলক উপন্যাস বিবেচনা করে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। 'রত্নবতী' প্রকৃতপক্ষে অবিমিশ্র অদ্ভুতরসাত্মক উপকথা। তার ধর্ম উপন্যাসের চেয়ে রূপকথার অনেক কাছাকাছি। লতিফ চৌধুরী ও আশরাফ সিদ্দিকী কেউ গ্রন্থটি দেখেন নি বলে স্বাধীন ও পৃথক মত প্রকাশ করায় কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। লতিফ চৌধুরী 'আমার জীবনী'র সার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই গ্রন্থ 'মীর সাহেবের বাল্যকাল থেকে দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বের কৌতুকাবহ জীবন-আলেখ্য'। আসলে বইটি শোকাবহ।

অবশ্য লতিফ চৌধুরীর মূল্যবোধ যে সর্বত্র অগ্রাহ্য এমন কথা আমরা কখনো বলি না। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' প্রসঙ্গে নীচের মীমাংসা পরিণত রসদৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধের পরিচায়ক:

সাহিত্যিক মূল্য ও রচনাকৌশলের দিক দিয়ে কমলাকান্তের দপ্তরের সঙ্গে গাজী মিয়াঁর বস্তানীর তুলনা হয় না। কমলাকান্তের দপ্তর দীপ্তবুদ্ধি, অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা ও অকাট্য যুক্তি বিচারের ফল। গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে প্রখর বুদ্ধি ও রসদৃষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে গাজী মিয়াঁ যে কমলাকান্ত অপেক্ষা ভূয়োদর্শী,

একথা স্বীকার করতে হবে। গাজী মিয়াঁর বস্তানীর ভাষা কমলা-কান্তের দপ্তরের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট : বস্তানীর ভাষার সাথে আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বেশ মিল আছে। (পৃ ২১)

"বাজীমাত্" প্রবন্ধে লেখক মোহাম্মদ ইদরিস আলিও মীর-মানসের বিচারে সুস্থির রসবোধ এবং অস্থির ইতিহাস-চেতনা উভয়কে অবহেলা করেছেন। যদি না করতেন তাহলে কখনই বলতে পারতেন না যে,

> 'বাজীমাত্' ব্যঙ্গ-রঙ্গ রচনা। তৎকালে প্রচলিত ব্যঙ্গরচনার মতই এর মধ্যে স্থূলতার প্রশ্রয় আছে। এদিক দিয়ে সূক্ষ্মতা এখনও অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়নি। ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই ব্যঙ্গের স্থূল রূপটা দেখিয়ে গেছেন।

বাজীমাতের প্রকাশ কাল ১৩১৫। 'তৎকালে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবন অতিক্রম করে গেছেন। এই তৎকালে প্রচলিত ব্যঙ্গরচনায় স্থূলতা যদি কোথাও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে, তবে তা সাহিত্যের আসরে নয়, বটতলায়। বটতলার আর একাল সেকাল কি! তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে রঙ্গরস-সৃষ্টির বিবর্তন-ধারায় ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও দান একই বিন্দুতে স্থিতিশীল নয়। কালের বিচারেও 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পঞ্চাশ বছরের পার্থক্য, তাৎপর্যের বিচারে, অনেক সময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েক শত বৎসরের তুল্যমূল্য। দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়েই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন নামে মাত্র, আসলে আয়ত্ত করেছিলেন গুরুমারা বিদ্যে। ঈশ্বর গুপ্তের পর দীনবন্ধু দামী ও দীপ্যমান ব্যঙ্গ-রঙ্গ সৃজনের ক্ষেত্রে আনকোরা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাঙালীর রসচেতনার স্তর ও পরিধি শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পরে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মই অশ্লীলতা ও কুরুচি, স্থূলতা ও গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ-স্বরূপ। ঈশ্বর গুপ্ত কি দীনবন্ধুর গুণকীর্তন করতে বসেও বঙ্কিম বদ্‌জোবান সম্পর্কে নিজের অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রাখেন নি।

কাজী আবদুল মান্নান-লিখিত প্রবন্ধটির বর্ণনামূলক অংশ মূল্যবান। তবে 'উদাসীন পথিককে' মীর-মানসের সর্বোত্তম প্রতিনিধি নির্বাচিত করা শিল্পশাস্ত্র-অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছিল না। নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের এমন কিছু অবর্ণনীয় রূপ এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। বাল্যস্মৃতি মন্থন করে এবং অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনে অতীত পারিপার্শ্বিকের যে চিত্র পুনর্গঠন করেছেন, তার মধ্যে অনেক রচনা-কুশলতার পরিচয় থাকলেও 'উদাসীন পথিকে'র আসল তাৎপর্য অন্যত্র অনুসন্ধানযোগ্য। মীর-মানসের এক অতি সংকটপূর্ণ ক্রান্তিকালে রচিত এই গ্রন্থে লেখক মনের কথা বলার সংকল্প গ্রহণ করেন। নিজের মনের গোপন কথার সঙ্গে গোটা পরিবারের ও বাইরের প্রকাশ্য ঘটনাবলীর যোগসূত্র নিপুণভাবে গ্রথিত হয় নি বলে এই বইয়ের কাহিনী অংশ একটা সামগ্রিক সুসংবদ্ধতা লাভ করে নি। তা সত্ত্বেও এই মনের কথার স্বরূপ বিচারে উদ্যোগী হলে সমালোচকের পক্ষে গ্রন্থ-রচনাকালীন মীর-মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হত। সে কাজটাই বেশী জরুরী ছিল। মান্নান সাহেব এই প্রয়োজনকে গৌণমূল্য দান করায় প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাবয়ব হতে চায় নি।

খণ্ডিত বিচারের একশেষ করেছেন আহমদ রফিক। 'জমীদার দর্পণ', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এবং 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'কে আশ্রয় করে লেখক মশাররফ হোসেনের অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার অকুণ্ঠ তারিফ করেছেন। 'জমীদার দর্পণে' না হলেও শেষের বই দুটোতে যে মীর-মানসের গণচেতনা ও অসাম্প্রদায়িকতা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, সমালোচক তা নিজ উদারতায় লক্ষ্যপথে আনেন নি। আনলে আরো লক্ষ্য করতেন যে, মীরের পরবর্তী সকল রচনাই স্বধর্ম, স্বসম্প্রদায় এবং স্বপরিবারের প্রতি একক প্রীতির নিদর্শন।

২.৩. কাজী আবদুল ওদুদই প্রথম মীর-মানসের দ্বন্দ্বমূলক মূল-সূত্রটি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা

'বিষাদ-সিন্ধু'-বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি মীর-মানসের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপরীতধর্মী সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা সকলই মীরের স্বভাবজ। বিগত কালের রসবোধ ও জীবনচেতনার যে প্রকাশ পুঁথি সাহিত্যে লক্ষ্য করি, মীর-মানস তার সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। "অনেকের ধারণা মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু,' 'জংগনামা' ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধু ভাষায় রূপান্তর মাত্র।" আবার 'বিষাদ-সিন্ধু'রই এমন অনেক দিক ও অংশ আছে, যা প্রমাণ করে যে, মাইকেল-বঙ্কিমের শিল্পানুভূতিরও তিনি উত্তরাধিকারী। "জগৎ ও জীবন, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর, তা নয়। মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।" কাজী আবদুল ওদুদের বিচারের এই সংকেত অনুসরণ করে আমরা মীর-মানসের স্বরূপ ও তার রূপান্তরের ধারা দুইই সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হই।

মীর-মশাররফ হোসেন সম্পর্কে সাবেক পাকিস্তানে প্রকাশিত যাবতীয় রচনার মধ্যে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র অংশটুকু তথ্যের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বিচার-বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহ্যমানতার গুণে হয়ত অপ্রতিম নয়, কিন্তু তাই বলে সেগুলোর মূল্য সামান্য নয়। লেখক মীর-মানস সম্পর্কে একাধিক মীমাংসার অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটির লক্ষ্য, আরেকটু স্পষ্টতার সঙ্গে মীর রচিত মানসের বৃত্তি ও বৃত্ত, ধর্ম ও মূল্য যথাযথ রূপে নিরূপণ করা। যে তিনটি মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের সংশয় এখনো কাটে নি, তার দুটো হলো মীর-মানসের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা এবং সমন্বয়ধর্মিতা প্রসঙ্গে, তৃতীয়টি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের তুলনায় মীরের আসন-নির্বাচন বিষয়ে।

মীরের সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা বা শিল্পী জীবনের নিঃসঙ্গতা বলতে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই এই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন সমাজ-সচেতন খুবই ছিলেন, কিন্তু কোনো রকম সভা-সমিতি বা

প্রতিষ্ঠান আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি থেকে শুরু করে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, ওহাবী থেকে বঙ্গভঙ্গ কোনো কিছুই যেন মীর-মানসকে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে যেতে পারে নি। হাই সাহেবের মতে মীরের এই নিস্পৃহতা মূলতঃ শৈল্পিক, তার নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগের ফল। অবশ্য একটু পরে একথাও তিনি বলেছেন যে, "...এমনও হতে পারে যে তিনি ইচ্ছে করেই এসব জাতীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, এতে প্রবেশ করে এর অংশভাগী হতে চান নি।"

'জমীদার দর্পণ' থেকে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' পর্যন্ত পাঠ করে কখ াই মনে হয় না যে, এই জীবন পথিক দুনিয়াদারীর ব্যাপারে শিল্পী-সাধকদের মতো উদাসীন। বরঞ্চ যিনি বলাৎকারী হায়ওয়ান আলীর মতো জামদার চরিত্র সোৎসাহে আঁকতে পারেন, যমদ্বারের মানুষরূপী আস্ত পিশাচ-পিশাচীদের অবিকল প্রতিকৃতি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তিনি আর যাই হোন, নির্বিকার পুরুষ নন। মীরের এই শ্রেণীর রচনার পেছনে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রান্ত হৃদয়ের উত্তাপ ও আলোড়ন এত প্রবল যে শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা পদে পদে নিগৃহীত হয়েছে। অপর দিকে শেষ বয়সের রচনাবলীর সমাজবিমুখ ধর্মানুপ্রাণতাও কেবল মাত্র বয়স্ক সামাজিকদের সাধারণ অবসাদ ও নিরাসক্তিকে প্রকাশ করে, কোনো শিল্পীজনোচিত নির্লিপ্ততাকে নয়।

শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্লিপ্ততা সামাজিকের ব্যক্তিগত নৈর্ব্যক্তিকতা ও নির্লিপ্ততার ঠিক বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। শিল্পী পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনকে নিজের চিত্তদর্পণের সহস্র রঙ্গে-বিভঙ্গে প্রতিফলিত দেখেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মথিত হন না। মীর-মানস নিজের পরিচিত দুনিয়ার নিকট ঘটনাবলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আচ্ছাদিত। এই কারণে যে ঘটনা তাঁকে সরজমিনে গ্রাম, গৃহ, পরিবার, পেশার সূত্রে সরাসরি আঘাত করে নি, তিনি সে বস্তুকে স্বাভাবিক ভাবেই উপেক্ষা করে এসেছেন। এ অবহেলা ঘোরতর রকম মানবিক, শৈল্পিক নয়। মীর তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মানষ হিসেবে যে পরিমাণ যুক্ত, অনেক ক্ষেত্রে, শিল্পী হিসেবে সে

পরিমাণে তা থেকে মুক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে হাই সাহেব তাঁর মূল সিদ্ধান্তের উপান্তে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা মিথ্যা নাও হতে পারে। বিবি কুলসুম থেকে তাঁর একটি সংকেত উদ্ধৃত করছি:

> স্বদেশী আন্দোলনে কুলসুম বিবি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলন-কারীদিগের দুই তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের খবর সন্ধান করিয়া বলিতেন যে—ইহাদের এরূপ ঝকমারী কেন? ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, ওদিকে ধনকুবের—অদ্বিতীয় রাজশক্তিসম্পন্ন বৃটিশ জাতি, বিদ্যা-বুদ্ধিতে জগত শ্রেষ্ঠ, সভ্যতায় জগতে সর্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী, বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর, এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ—বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে? দিদিমনিরা সভা-সমিতি করিয়া হাতের বলয় এবং অন্য অন্য অলংকার পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া দেশ উদ্ধার করিতেছেন। তোমাকে কাব্য বিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছে! দশ হাজার বিষাদ সিন্ধু সস্তাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে। মনিবে তিনমাস, চাকরে তিনমাস ঘুরাইয়া দিবি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে আনিও না। ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না।... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দু'বেলা উপাসের হাঁড়ী মাথায় বহিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের হিত সাধন সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা-সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।

সভা-সমিতি সম্পর্কে মীরের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের এই কারণ সাচ্চা হলেও তাকে শিল্পী-সুলভ বলা চলে না।

মীর-মানসের সমন্বয়ধর্মিতা তাঁর রচনাবলীর প্রথম অর্ধেক অংশে সত্য। বাদবাকী রচনার বিচারে এই গুণনির্দেশ অপ্রযোজ্য।

৩.১. লাহিনীপাড়া, দেলদুয়ার, পদমদী। কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর, এই তিন পূর্ববঙ্গীয় গ্রামাঞ্চলে মীর মশাররফ হোসেনের

কৈশোরোত্তর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে। কৃষ্ণনগর-কলিকাতার সংগে একবার সামান্য যোগাযোগ ঘটে বাল্যে ও কৈশোরে। দুর্ভাগ্যবশত: সে জীবনেও সৎ-সঙ্গের অভাব ছিল। নাগরিক জীবনের যে এলাকায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলিকাতা সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও বোধকে আত্মসাৎ করে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মুখর ছিল, মীর-মানসের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরোক্ষ এবং দূরাগত। সতের বৎসর বয়সে (১৮৬৪) উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতা আসেন। ঠিক হয়েছিল আলীপুরের আমীন পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাসায় থেকে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু,

> ''লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনি না। ..চাঁদ মিয়ার মুখেও না। সে কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণী ঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন। আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আঘ্রাণ মন মজান, প্রাণ মাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পুজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহর আত্মা...। (আমার জীবনী)

আঠার বছর বয়সে মীরের সঙ্গে নাদির হোসেনের দ্বিতীয় কন্যা আজিজন নেসার বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সম্ভবত: এই সংক্ষিপ্ত কলিকাতা পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাল্যকালের পড়াশুনার বৃত্তান্তও গ্রাম্য মলিনতা থেকে মুক্ত নয়। হাতে খড়ি "মুন্সী সাহেবের কাছে, কারণ মুরুব্বিরা বিশ্বাস করতেন যে, "মুন্সী সাহেবের হাতে খড়ি দিলে দারোগা-গিরি চাকরী না হইয়া যায় না।" পাঁচ বছর বয়সে কোরান শরীফের প্রথম পারার বেশ কিছুটা পড়ে ফেলেছেন। "তবে অক্ষর পরিচয় বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরান পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্শী মহোদয়েরও কোরানের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে?" চৌদ্দ বছর বয়সে কুমারখালী ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ। মীরের আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে:

ইংরাজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিডিমিডি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লা-রসুলের নাম মুখে আসিবে না।... ইংরাজী পড়িলে, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, শরাব খায়। জবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকের জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।... (আমার জীবনী)

এই সময়ে বাংলা চিঠিপত্র এবং হেঁয়ালী লেখাই ছিল মীরের অন্যতম কাজ। স্কুলে ফারসীও একরকম পড়ান হোতো। "অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি গদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছু এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্‌শীজিকে সঙ্গে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিষ্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।" বালক মীর পুঁথির বড় ভক্ত ছিলেন। যদিও "পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।" পনের বছর বয়সে 'যৌবন জোয়ারারম্ভে' "অভ্যাস দোষে, এরূপ হইল যে পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে।" সম্ভবত: ১৮৬৩তে পদমদী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়তেন। ষোল বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সতেরতে কলিকাতা আগমন এবং প্রথম বিবাহ। নিয়মিত পাঠাভ্যাসের অন্য কোন সংবাদ এর পর থেকে আর পাই নাই।

৩.২. মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির যে চিত্র মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তার বৈভবের মধ্যেও একটা মধ্যযুগীয় স্থৌল্য প্রবল। মীর মশাররফ হোসেনকে তাঁর মাতামহী অনেক দু:খে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন:

যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন?...সতীনের যন্ত্রণার আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা

পর্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারেখারে গিয়াছেন। আমরা ত কোন্ ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জ্বলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা।...?

মীর মশাররফ হোসেনের চরিত্রে প্রথম কলঙ্কদোষ ঘটে ঘরের দাসী-বাঁদীর সংসর্গে। ষোড়শ বর্ষে চন্দনমৃগীর নবাব মীর মহাম্মদ আলীর বজরায় মনোমোহিনী দেহপশাবিণীর আহলাদ নাচগান রগড় রহস্যের নিকট-সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তার বিষময় ফল ভোগ করেন। বারুণী ঠাকুরাণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কখন কি পরিমাণে ঘটে, তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি না থাকায় তার কাল নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সপ্তদশ বর্ষে গ্রাম্য প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়ে যাকে ভালবাসতেন তার বদলে অন্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে নতুন প্রেমিকা দ্বাদশ বর্ষীয়া কিশোরী কুলসুমকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। মীর-পরিবারের পীর 'বিনদীয়ার হজরত' কুলসুমকে মুরিদ বলে গ্রহণ করেন এবং নিকাহের অনুমতি দেন। এই ১৮৭৩ থেকে মীরের নবজীবন সূচিত হোলো।

> কুলসুমকে নেকাহ্ করার পূর্বে আমি মানব সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত ছিলাম না।.. পাঁচ ইয়ার লইয়া পঞ্চ মকারের সেবা...। বিবি কুলসুম আমার গৃহে আসিলেন, গৃহিণী হইলেন। তাহার প্রথম কার্যই হইল আমার মতিগতি ফিরান, আমাকে সৎপথে আনা। ভূত প্রেত ছাড়ান। ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে; ঔষধ ধরিতে আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের কৃপায় ধর্মশাস্ত্রমত একত্র সম্মিলনে ক্রমেই ভালবাসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। (বিবি কুলসুম)

দ্বিতীয় বিবাহের অন্তত: প্রথম দশ বৎসর মীরের সংসারে সপত্নীবাদের হিংসানল দাউদাউ করে জ্বলেছে। আজিজন্নেসা "সপত্নী হিংসাবাদে দিন দিন মনেব গতি ও সদিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসন নীতি আরম্ভ করিলেন, শাসন গর্জনে কুলসুমের সহিত শত্রুতাচরণে, তাহাকে জব্দ করিবার মানসে নানাপ্রকার কৌশলজাল গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন।" এমন কি "আজিজন

বিবি মীর সাহেব আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আঁটিয়াছেন। অতি সহজ উপায়, দুইটি উপায়—কৌশলে হস্তগত করিয়া হস্তপদ বাঁধিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ। অথবা গলা টিপিয়া মারিয়া রেলওয়ে লাইনের উপর রাখিয়া দিলেই যে-কেহ দেখিলেই বুঝিবে এরূপ মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।" ('বিবি কুলসুম')। অষ্টাদশ বর্ষে বাংলা ১২৮৬ সনে বিবি কুলসুম সন্তানবতী হন। পরবর্তী পনের বছরে বিবি কুলসুম একাদশ সন্তানের জননী হন। মীর-মানসের সৃষ্টিশীল বিকাশও এই পর্বে সর্বাপেক্ষা উর্বর ও সার্থক। এই পরিতৃপ্ত জীবনের প্রত্যয়বোধকে মীর সাহেব যেভাবে 'বিবি কুলসুম' বইয়ে ব্যক্ত করেছেন তার একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি:

> ১২টার মধ্যে স্নান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাঁধা নিয়ম। একত্র আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। ··· কাছারি হইতে আসিয়াই তাঁহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব। ৩০ মিনিটের বেশী নহে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়া দেওয়া কুলসুম বিবির কর্তব্যকার্য ছিল। ৭টা বাজিলেই উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পুস্তক পাঠ, না হয় গ্রামোফোনে গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা করা। রাত্র আটটা বাজিলে আহার—আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পরেআমার নি জ লিখার কায। যেই ১২টা বাজিয়া গেল—আমিও শয্যায়। কুলসুম বিবি যেদিন নূতন কোন লিখার কথা শুনিতেন, সেদিন আর শয়ন শয্যায় যাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া গেলে বিছানায় শুইতেন না। শৌচাগার গমন, বস্ত্র পরিবর্তন—প্রভাতীয় উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চা আণ্ডা আলু সিদ্ধ আমার জন্য প্রস্তুত। আমি আমার জীবনে সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুমের জন্য বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি। বিবি কুলসুমের মৃত্যু বাংলা ১৩১৬ সনে। সেই বৎসরে প্রকাশিত 'বিবি কুলসুম' মীরের শেষ রচনা। তার দু বছর পর মীর মশাররফ হোসেনও দেহাবসান করেন।

এই সুফল ও সুনির্মল দাম্পত্য জীবন অনভিপ্রেত ঘটনার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে নি। পরিশোধিত মীর-চরিত্রের সকল প্রবৃত্তি নবজীবনের অনুপ্রেরণাধীন ছিল না বলে সন্দেহ করি। নিজের জীবন বর্ণনা প্রসংগে 'বিবি কুলসুমে'র শেষ পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার কথা এই ভাবে উল্লেখ করেছেন :

> ...হঠাৎ দেখি বিবি কুলসুম 'মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া বাড়ীর একটি দাসীকে মারিতে একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে তাড়া দিয়াছেন। আমি কিছুই বলিতেছি না। কারণ কোন বিষয়ে বিবি কুলসুমের হঠাৎ রাগ দেখিলে আমি চুপ করিয়া থাকি। ...আমি বলিলাম, আমি মিথ্যাবাদী নহি, বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহারও সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই।

ঐ বইতেই বাংলা ১২৯২ সনের আরেকটি গল্প বলা আছে। তখন মীর সাহেবের কলিকাতার ঠিকানা ১১ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। প্রিয়তম বন্ধু মুন্সী সাহেব মীর সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পান খেতে গলির মধ্যে ঢুকেছেন। কোনো একটি ঘরের দুয়ারে দুই অপেক্ষারতা ইঙ্গ-বঙ্গ দেহপশারিণীকে লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ রঙ্গরসের অবতারণা করায় তারা বিশেষ রুষ্ট হয়ে কিছু কটু বাক্য ব্যবহার করে। "তাহার পর ঘটনাক্রমে এরূপ হইল যে শ্যামবর্ণা—যাহার কালা আদমীর প্রতি বেশী ঘৃণা—বৎসরকাল মধ্যে তাহার গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল।"

৩.৩. মীর মশাররফ হোসেন যখন সাহিত্য সেবা শুরু করেন তখন বঙ্কিমের এবং যখন শেষ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মীরের 'বসন্তকুমারী নাটকের' এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' মীরের 'জমীদার দর্পণে'র তের বছর আগে লেখা। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সবই 'বিষাদ-সিন্ধুর' আট-দশ বছর আগে প্রকাশিত। 'কমলাকান্তে'র সংগে 'গাজী মিয়াঁ'র পার্থক্য পঁচিশ বছরের। মীর মশাররফের জীবিতকালেই রবীন্দ্র-

নাথের ছোটগল্প 'নষ্টনীড়', উপন্যাস 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' নাটক 'বিসর্জন', চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী', কবিতা 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্কিমের সঙ্গে কোনো কোনো সূত্রে মীরের জীবন চেতনা ও শিল্পকলার যোগাযোগ আবিষ্কার সম্ভব হলেও রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াস অবিহিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগের নজরুল ইসলামের সঙ্গে মীর-মানসের রেশতেদারী কল্পনা করা আরো অসঙ্গত। মীর-মানসের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার ঐতিহ্য ও উৎস উপলব্ধি করতে হলে কালক্রম লংঘন করে বঙ্কিমেরও অনেক পেছনে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। এমন কি, মাইকেল-দীনবন্ধু-টেকচাঁদ-বিদ্যাসাগরও নয়, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত-রাঙ্গলালই হলেন মীর মশাররফ হোসেনের নিকটতম পূর্বসূরী। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে যোগসূত্রটি সরাসরি নয়, দূরসংস্থিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখতেন কাঙ্গাল হরিনাথ, কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তায়' লিখতেন মীর মশাররফ হোসেন। কাঙ্গালের লেখার সংশোধন করতেন ঈশ্বর গুপ্ত, মীরের রচনা কাঙ্গাল। জ্যেষ্ঠ গুপ্তের মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকরে'র ক্ষীয়মান প্রতিপত্তির কালে যখন কনিষ্ঠ গুপ্ত সম্পাদক, তখন তার সহ-সম্পাদক ভুবন-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মীরের পরিণত রচনার রদবদল করার স্বাধীনতা গ্রহণ করতেন। বিবি কুলসুম লেখাপড়া শিখেছেন মীরের তত্ত্বাবধানে। বিবি কুলসুমের প্রিয় কবি ছিলেন রঙ্গলাল। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল উভয়েই ছিলেন সেকালের কবি। নয়া জামানার কলিকাতা কালচারের স্পর্শলাভ করলেও তাঁরা সে বস্তুকে সৃজনকর্মে পুনর্জন্ম দান করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ শোষণ করে নিতে পারেন নি। নবযুগের বহির্প্রান্তীয় পরশ ইংরেজীতে নিম্নমানের অধিকার পেছনের টানকে পরাভূত করতে পারে নি। মীরের সংকট গভীরতর। তাঁর মানস প্রস্তুতির পটভূমির স্থূল ভূগোল হিসেবেও কলিকাতা নগরীর অবস্থান অস্বচ্ছ এবং অপ্রত্যক্ষ; বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের এই প্রতিকূল পরিমণ্ডলের বাসিন্দা হয়েও মীর মশাররফ হোসেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে।

অপর দিকে অস্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা কালচারের উদ্দণ্ড হিন্দুনীতি যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, তারও দুটো রূপ ছিল। একটা একটু পণ্ডিতী ধরনের। অনেক অংশ নাগরিকতামণ্ডিত ও যুক্তি-মার্গীয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের পুনর্গঠনে এঁদের প্রয়াস মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক। শিক্ষিত মুসলমানের চিন্তাজগৎকে প্রভাবান্বিত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য এঁরা আরবী ফারসী সংস্কৃত ইংরেজী ভাল করে আয়ত্ত করেছিলেন। মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশ্‌হাদী, শেখ আবদুর রহিম এই গোত্রভুক্ত। দ্বিতীয় ধারাটি তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ, সরল এবং গ্রামীণ। লেখায় এঁরা পুঁথি সাহিত্যের আদর্শকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন, বলায় ওয়াজ বহেসীর যুক্তিতর্কের তরীকাকে। জন জমিরুদ্দিন, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌, নইমুদ্দিন এই পথের পথিক। বলা বাহুল্য যে কোনো চিন্তাধারার শ্রেণীকরণের আমাদের মতো এ ভাগাভাগিও কিছুটা কৃত্রিম, বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার্থে সত্যবস্তু থেকে নির্মিত। উভয় ধারার সঙ্গেই মীরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মীর-মানসের ক্রম-বিকাশের প্রথম অধ্যায় দীনবন্ধু-মাইকেল-বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী চেতনার গৌরববোধে সমুজ্জ্বল। শেখ আবদুর রহিমের 'হাফেজ' (১৮৮৭) পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা দিয়েছেন। স্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি-প্রকাশে অকুণ্ঠ হয়েও এঁরা তখন আজকালকার উপদ্রবী অর্থে সাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাছাড়া এই পর্বে এখনও মীর সাহেবের প্রধান উৎসাহ সাহিত্যসৃজনে, সাধ্যমত মুসলমানী উপাদানের শিল্পগত রূপায়ণে। তৃতীয় পর্বে, মীরের বৃহত্তম সংখ্যক রচনা শিল্পানুপ্রেরণাহীন। ধর্ম বিষয়ক বাহ্য ও গৌণ ধারণাদিতে আকীর্ণ মীর-মানস এই পর্বে কেবল উপ-পুঁথি-সাহিত্য সৃষ্টি করেই তুষ্ট ছিল।

৩. ৪. মীর-মানসের নানা অঙ্গ ও ভঙ্গী ভাগ করে বোঝাবার জন্যে সমগ্র মীর-রচনাবলীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

ক। তাঁর প্রথম বিয়ে ১৮৬৫ সালে, দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন ১৮৭৩

সালে। অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থসমূহের নাম 'রত্নবতী', 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু', 'বসন্তকুমারী নাটক', 'জমীদার দর্পণ'।

খ। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ সাল অপেক্ষাকৃত সৃষ্টিহীন পর্ব। সপত্নী-বাদের বিষময় চক্রান্তে পড়ে মীর পরিবারে শান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। এমন কি "১২৯০ সালে কুলসুম বিবি বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ভাত কাপড়ের কষ্ট। --- আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল" ('বিবি কুলসুম')। ১৮৭৯-তে প্রথম সন্তান লাভ, ১৮৮১-তে দ্বিতীয়, ১৮৮৩-তে তৃতীয়। এই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ ১৮৭৫, ২৫এ সেপ্টেম্বরের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র একটি বিজ্ঞাপন. 'এর উপায় কি' প্রহসন সম্পর্কে।

গ। ১৮৮৪-তে দেলদুয়ার আগমন। ১৮৯২-তে নবম সন্তানের জন্ম-লাভ পর্যন্ত দেলদুয়ারে অবস্থান। দাম্পত্য-জীবনের এই পরিতৃপ্ত সন্তান-বহুল পর্বেই 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯২) ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) সৃষ্টি হয়। দেলদুয়ারে জমিদারী স্টেটের ম্যানেজার হিসেবে নানান জাতের লোকের নানারকম নগ্ন ও কুৎসিত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং অবশেষে ১৮৯২-তে দেলদুয়ারকে 'যমদ্বার' জ্ঞানে ত্যাগ করেন।

ঘ। ১৮৯২ থেকে ১৯০২ এই দশ বৎসরের একমাত্র রচনা 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯, ১ম খণ্ড)। এটি পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর-মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর।

ঙ। ১৯০৩ থেকে ১৯১০। রচনার সংখ্যাধিক্যে উর্বরতম এই অন্তিম পর্বে মীর-মানস, শিল্পবিচারে, অবসন্ন ও উদাসীন। মানব-জীবনের রহস্য আর তাঁকে শিল্পানুপ্রেরণা যোগায় নি, ধর্মজীবনের গভীরতর উপলব্ধি তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে নি। বেশীর ভাগ রচনাই অলৌকিকতামণ্ডিত, কিংবদন্তীপূর্ণ, অসংস্কৃত পুঁথি সাহিত্যের ইসলামের পুনর্নির্মাণ। আংশিক ব্যতিক্রম 'এসলামের জয়', আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার জীবনী' ও 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম-জীবনী'।

৩.৫. মীরের মানস-বিবর্তনে একটি প্রধান বিদারণ-রেখা দেলদুয়ার ত্যাগের সমকালে কল্পনা করা যেতে পারে। এর আগের রচনাসমূহে

মশাররফ হোসেন গভীর ও সরল জীবন-চেতনায় যতটা আস্থাবান পরে তেমন নন। এই পর্বের 'জমীদার দর্পণে' কেবল যে রোষদীপ্ত উচ্চকণ্ঠ গণদরদ ঘোষিত হয়েছে তা নয়, আবু মোল্লা ও নূরুন্নেহারের করুণ অনাবিল ঘরকন্নার চিত্রাঙ্কনে গাঢ়তর জীবনবোধের আভাস আছে। প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় জর্জরিত মানুষ আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের যে মহামূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, বঙ্কিমের মত মীর মশাররফ হোসেনও প্রথম জীবনে তার রূপকার ছিলেন। প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ রেবতীতে (বসন্তকুমারী নাটক) তার উন্মেষ, রূপজ মোহে আত্মবিক্রিত এজিদে (বিষাদ-সিন্ধু) তার পূর্ণ পরিণতি। মানবী জায়েদার ট্রাজেডিও কম মর্ম-স্পর্শী নয়। মীরের ধর্মানুভূতিও এই পর্যায়ে উদার, শিল্পীজনোচিত। সামাজিক বিচারবুদ্ধিতে একে অসাম্প্রদায়িক এবং 'সমন্বয়ধর্মী'ও বলা যেতে পারে। 'গো-জীবনে' তিনি সরাসরি এই মনোভাব যুক্তিতর্ক যোগ করে পেশ করেছেন। সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রেমময় শিল্পীসত্তা 'বিষাদ-সিন্ধু'তে এই অভিযোগ উত্থাপন না করে পারে নি যে:

> কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি কল্পনার সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে সর্বশক্তিমান্ ভগবান! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কারতিমির সদ্‌জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে মনের গতিরোধ, তাহাতে জাতীয় কবিগণেরও বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহা-দের যে কল্পনাশক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাষেই যথেষ্ট, আর বেশী দূর যাইব না। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই

নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য পদে সম্বোধন করা হইয়াছে, মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছি। আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন। কারণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে। ('বিষাদ-সিন্ধু', উদ্ধার পর্ব, ৪র্থ প্রবাহ)

মীর-মানসের সংকট-সূচনা প্রকৃতপক্ষে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) থেকে। নীলকুঠির লালমুখো সাহেবের সঙ্গে নিজের পিতার আঁতাত অত্যাচারিত নীলচাষীর প্রতি লেখকের সমবেদনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। গাড়োয়ান জকির কোনো রূপবতী সখের ময়নাকে রূপার লোভ দেখিয়ে নিজ ঘরে আনা ছাড়া কেনী সাহেবকে দিয়ে অন্য কোনো লোম-হর্ষক পাপকর্ম করান নি। অন্ততঃ সামনাসামনি নয়। কেনীপত্নী তো মীরের শ্রদ্ধা লাভ করেছে। সাগোলাম নিপীড়িত চাষীপ্রজার জন্য সংগ্রাম করে গ্রন্থে বড় হতে পারে নি। কারণ মীরের এই ভগ্নিপতিটি পারিবারিক সম্পত্তি-দখলের ব্যাপারে মীর-পিতার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করেছিল। নিজের পিতামাতার জীবন আদর্শায়িতরূপে উপস্থাপিত করতে গিয়েও মীর সাহেব বিভিন্ন আপাতবিরোধী দৃশ্যের অবতারণা করে ফেলেছেন। এককালের 'জমীদার-দর্পণে'র নাট্যকার আজ এই বইয়ে দীন-বন্ধুকে মনের সুখে গালিগালাজ করেছেন। এসব সত্ত্বেও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দুঃখীজনের জন্য যে দরদ প্রকাশ পেয়েছে, শোষিত হিন্দু-মুসলিমের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহী শিল্পীর যে সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, ঐতিহাসিক ঘটনাকে রসপুষ্ট করে তোলবার জন্যে জটিল মানবহৃদয়ের যে পশ্চাৎপট নির্মিত হয়েছে, সবই প্রমাণ করে যে মীর-মানস এখনও তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পচেতনার মহত্তর প্রথম অধ্যায়ের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নি।

সংকট ঘনীভূত হয়েছে ১৮৯২-র পর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯) রচনার আশেপাশে সৃষ্টিহীন দশ বৎসরে। বস্তানীর জগৎ নারকীয়, ভালমন্দের ভেদজ্ঞান সেখানে লুপ্ত। মানবীয় হৃদয়ের অপার রহস্য মুগ্ধদৃষ্টিতে

প্রত্যক্ষ করার পরিবর্তে লেখক কেবল মানুষ পশুর ঘৃণিত সামাজিক আচরণকে চীৎকার করে জাহির করেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতেও মীরের বিশ্বাস বাষ্পীভূত:

ডিপুটী সাহেব বসিলেন, গায় গায় ঘেঁসাঘেসী করিয়া আদরে আহলাদে যেন কত পীরিতি, কত প্রণয় ভাব দেখাইয়া, গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিলেন, বসাইলেন। কিন্তু মনে মনে তিন হাত ফাঁক্। বিদ্বেষের ভাবও খুব আছে। তবে বাহিরে নয়, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। হিন্দু, মুসলমানের জীবনের শত্রু। তবে যে ভাব, ভালবাসা মুখের মায়া, 'আমি তোমারই' সে কেবল আপন লাভ আর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।

('গাজি মিয়াঁর বস্তানী)

একাধিক তুলনীয় চরণ আছে 'বাজীমাতে' (১৯০৮)। যেমন:

বিশ্বাসঘাতক হিন্দু দুষ্ট প্রবঞ্চক,
যেই পাতে খায় ফোঁড়ে এমনি পাতক।

অথবা,

তারা যে হিন্দুর পুত্র সংসারেতে পোকা। ইত্যাদি।

মীর-মানসের এই পরিবর্তনের অব্যবহিত কারণ তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্ণয় করা সম্ভব হলেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনশীল ধারাও হয়ত এর জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী। পাশ্চাত্য শিক্ষা নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কার্যত জাতিবৈরী ভাব থেকে মুক্তিদান করে নি। সাহেবের লেখা ইতিহাসে মুসলমান শাসক মাত্রেই কামুক ও পীড়ক রূপে অঙ্কিত। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে পাদ্রীর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ও রসুলুল্লাহ্ সম্পর্কে গর্হিত কথা অনেক দিন থেকে চালু ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শিক্ষা ও সাহিত্যের বিষাক্ত পরিণাম ফলতে শুরু করেছে। সেকালের মুক্ত-বুদ্ধির অগ্রনায়ক ব্রাহ্মধর্মের নেতারা পর্যন্ত ক্রমে অলক্ষ্যে হিন্দুয়ানীর প্রচারকে পরিণত হলেন। 'জাতীয় সভা'র কাজ হয়ে দাঁড়াল 'হিন্দু মেলা'র তদারক করা। যুগপুরুষ রাজনারায়ণ বসু ঘোষণা করলেন:

মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু-সমাজেই আমাদিগের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়—যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ এক হৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

১৮৮৭-তে রাজনারায়ণ বসু "মহা হিন্দু সমিতি নামক একটি মহা সমিতি স্থাপনের আশা নিয়ে" 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রকাশ করলেন। বিরাশী থেকে সাতাশীর মধ্যে বঙ্কিম লিখলেন 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' ইত্যাদি। বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে মীরকেও স্পর্শ করেছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

সমাজের কল্যাণ-সাধনে নিরুৎসাহ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী-প্রচারে বিমুখতা, মানুষের মহত্ত্বে অনাস্থা, ইহলোকের সৌন্দর্যে অশ্রদ্ধা, সবই ১৮৯২ থেকে ১৯০৯-এর মধ্যে মীর-মানসে তিল তিল করে দানা বেঁধেছে। মীরের শিল্পানুভূতিও ক্রমশঃ পলায়মান। শেষ আট-দশ বছরে সংখ্যায় অনেক বই লিখেছেন বটে, কিন্তু পূর্বতন মীরের সত্যদৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি দুই-ই এখানে অনুপস্থিত। বইয়ের নাম প্রমাণ করে যে এগুলোর বিষয়বস্তু সরাসরি ইসলামী ও ধর্মবিষয়ক। যেমন 'মৌলুদ শরীফ', 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'মোস্লেম বীরত্ব', 'খোতবা', ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে "ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য তাঁর শিল্পী মনকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছে তারই বহির্বিকাশ" এই বইগুলোর মধ্যে আমরা দেখি, এমন বলা চলে না। সেই জন্যে নজরুলের সঙ্গে মীরের তুলনাও অচল। মীরের এই জাতীয় রচনায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা হৃতপ্রতিভা বৃদ্ধ মীরের সামাজিক সত্তার আচার-আচ্ছন্ন সংস্কার-বশ ধর্মকর্মের কথা, প্রাকৃত বিশ্বাসে গৃহীত, পুঁথি পরিবেশিত ধর্মবিষয়ক বাসনা ধারণাদির উপকথা মাত্র। স্থূলতারও অকুলান নেই। মেরাজ বর্ণনায় কবি লিখেছেন যে বেহেস্তে :

অপূর্ব যুবতী নারী
দাঁড়াইবে সারি সারি
মণিময় রত্ন আভরণে।
সাজিয়ে অপূর্ব সাজে
বীণা বীণ হাতে বাজে,
আর বাজে ঘুঙ্গুর চরণে ॥
দাসী তুল্য সেবিবারে
সকলেই ইচ্ছা করে
যাতে সুখ হইবে যাহার।
মনের আনন্দে সেই
সুখী হবে বিধি এই,
হুর সনে করি ব্যবহার ॥

অথবা নরকে,

সুখেতে হারাম করি
হেসে হেসে গর্ভ ধরি
প্রসবিল যে নারী সন্তান।
সে পাপের পরিণাম,
অগ্নি শিশু অবিরাম
প্রসবে প্রবেশে যথা স্থান ॥

এসব দেখে-শুনে রসুলুল্লাহ্ জেব্রাইল ভাইকে ডেকে বললেন যে তাঁর উম্মতরা কখনও এত এরকম আজাব সইতে পারবে না। পাগড়ী খুলে তিনি সেজদায় স্থির হলেন। তখন দৈববাণী হোলো:

ওহে প্রিয় মোহাম্মদ (দ:) তোমার আব্দার।
রক্ষা হবে তুমি আজ অতিথি আমার ॥

'বিবি খোদেজার বিবাহ' থেকেও অনুরূপ অগ্রহণীয় পাদবদ্ধ চরণাদি কাতারে কাতারে উদ্ধৃত করা সম্ভব।

একটা কথা এইখানে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সৃষ্টি-কর্তা মশাররফ হোসেন কি এই শ্রেণীর কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও আবেদনের

স্বরূপ সম্পর্কে সত্যি হতচেতন ছিলেন? হয়তো নয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রতিভার সাধারণ ক্ষয়, পরিবেশের হীনতায় শিল্পচেতনার বিকার, অবস্থাবিশেষে সহজ রোজগারের প্রতি মানুষ মাত্রেরই দুর্বলতা, সব স্বীকার করে নেবার পরও মীর–মানসের এই বিবর্তনের একটা শৈল্পিক আদর্শগত কারণ লোচন করা সম্ভব। জীবনের উপান্তে এসে মশাররফ হোসেন বৃহত্তর মুসলিম পাঠকের নৈকট্য কামনা করেছেন, পনের আনা নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর মুসলিম জনতার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্দেশ্য: তাদের জ্ঞান ও রুচির উন্নতি বিধান। উপায়: সে মানস যা ভোগ করে অভ্যস্ত, সেই পুঁথি সাহিত্যের রূপ রস ভাষাকে কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করে পুনঃপ্রচার করা। 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র ভূমিকা মীরের এই সচেতন পরিকল্পনার একটি প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। আমরা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

> বর্তমান সময়ে বঙ্গবাসী মুসলমান সমাজে তিন শ্রেণীর পাঠক বর্তমান। এক শ্রেণীর পাঠক মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক পাঠ করেন। মুসলমানি বাঙ্গালা লিখিত পুস্তক সংখ্যা করা কঠিন। লিখকগণ সকলেই মুসলমান। পূর্বে আমির-হামজা, বাহার দানেস, জৈগুন, সোনাভান, আবুশ্যামা, ইউসুফ জোলেখা, লাইলী মজনু, গোলে বকাওলী, চাহার দরবেশ, জঙ্গনামা প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পুস্তক সকল বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমান সময়ে কত পুস্তক...গণনা করা কঠিন। এক এক খানি পুস্তকের নামের পরিচয়েই বিষয়ের ও লিখকের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—আলমশ্যামী, মাণিকপীর, কাজিহয়রাণ। কলীর বউ ঘর ভাঙ্গানী, শ্যমন-বিমান, সুরতজামাল, লালমন, বীর হনুমানের লড়াই ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের কাট্‌তিও অধিক। পাঠক সংখ্যাও অত্যধিক। ২য় শ্রেণীর পাঠকগণ মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী, পুঁথি পড়ার আবশ্যক হইলে, ধর্মগ্রন্থাদি যাহা মুসলমানি বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্গানুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে তাহার প্রতিই অধিক টান। তবে নূতন নাম···পুস্তক প্রকাশিত হইলে—। এই

শ্রেণীর মহোদয়গণ এসলামি ভাষায় লিখিত—কি সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রিকা যাহাতে মাত্র খবর থাকে তাহা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন না। এই দুই শ্রেণীর পাঠকগণের বিশ্বাস যে পদ্যে লিখিত না হইলে—কেতাব কি প্রকারে হয়?

পদ্যপদ সংযোজিত না করিতে পারিলে সে আবার লিখক কিসের; এ কথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার মুসলমানি বাংলা পুস্তক বটতলার বাজার হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকও পদ্যপদ ভিন্ন নহে। সমুদয় পয়ার ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। অনেক পুস্তকে আবার রাগ-রাগিণী তালের পরিচয়ে গানও আছে। এই প্রকার নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। কত হিন্দু মহাশয় ছাপাখানা করিয়া মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইতেছেন। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যাই অধিক। বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, দত্ত, শীল, বসাক মহাশয় মল্লিকা আকার, কেয়ামত নামা, গো কোরবানীর ফজিলত, হাজরাত ইসমাইলের বিবরণ—বিক্রয় করিতেছেন; লজ্জাতন্ নেসার লজ্জাতে মরিতেছেন। ইহাতেই স্পষ্টই প্রমাণ মুসলমান সমাজে পদ্যের বড়ই আদর।..

এখন তৃতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধে কথা—কথা কিছুই নাই। তবে শাখা আছে পত্র আছে—মূল কাণ্ড সংখ্যায় অতি অল্প! ইহাদের রুচি পরিমার্জিত, সাধুভাষার দিকেই অধিক টান। এই শ্রেণীর মধ্যেই ভাল লিখক বর্তমান। সহজেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সিদ্ধহস্ত। যথা—রেয়াজদ্দীন, আবদুর রহিম, মোজাম্মাল হক, আবদুল হামিদ, পণ্ডিত রেয়াজদ্দীন এবং নওসের আলি প্রভৃতি প্রিয় ভ্রাতাগণ। ইঁহারা আবর্জনা ছাড়াইয়া মুসলমান সমাজে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা প্রচলনে বিশেষ যত্নবান। কিন্তু সমাজের চৌদ্দ আনা লোককে ফেলিয়া দুই আনা লোক লইয়া সাহিত্য-সোপানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন করুন। কিন্তু দুই চারজন লিখক চৌদ্দআনা দলের সহিত মিশিয়া মিশিয়া ক্রমশ দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হইলে কি ভাল হয় না?

'বিবি খোদেজার বিবাহ'

এরূপ সরল ভাষায় পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপনাভাস। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকগণের চক্ষে পড়িলেও পড়িতে পারে, কিন্তু শাখাপত্র শ্রেণীর চক্ষে পড়িবার কথাও নহে। আশাও করি না। এক প্রকার সে আশা দুরাশা। কারণ মৌলুদ শরীফ জাতীয় বিবরণ জাতীয় ধর্মকথা, বাজে গল্প নহে, আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্মসংস্রবী, আদব তমিজ সংস্রবী, শব্দসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশক প্রতিশব্দ না থাকিলেও কিছু না কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লিখক প্রিয় ভ্রাতা, ডালখিচুড়ির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।...সুতরাং নব্য দলে---আদরণীয় হইবে না---লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। তার মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

৩.৬. কালানুক্রমিক শ্রেণীকরণ অতিক্রম করে কেবল বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও আবেদনের বৈশিষ্ট্য বিচার করেও মীর-রচনাবলীকে নানা গুচ্ছে ভাগ করা যেতে পারে।

'বসন্তকুমারী নাটকে' মীর-মানসের জীবনরস-রহস্য-ভেদের যে প্রয়াস উন্মোচিত হোলো, তা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে ইসলামী ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্‌সমূলক উপাখ্যান 'বিষাদ সিন্ধু'তে।

সামাজিক শ্রেণীসংঘাতের যে সমালোচনার সূত্রপাত 'জমীদার দর্পণ' নাটকে, তার বর্ণনামূলক বিস্তার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়, তার বিকার 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় মীরের উৎসাহ প্রথম প্রকাশ পায় 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়'। এই বিশেষ সাহিত্যিক রূপের আস্বাদন মীর-মানসের সংকটকালেও তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে। এমন কি মীর-প্রতিভা শেষ পর্যায়ে যখন এক রকম নিঃশেষিত তখনও কেবলমাত্র এই শ্রেণীর দুটি রচনায়, 'আমার জীবন'ও 'বিবি কুলসুমে'

মীরের সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়াশীলতা অক্ষুণ্ণ। মশাররফ হোসেনের শৈশব-কৈশোর যৌবন ও প্রৌঢ় জীবনের যে চিত্তাকর্ষক আত্মবর্ণনা এগুলোর মধ্যে বিধৃত, সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও তার মূল্য অপরিসীম। সম্ভবতঃ 'বিষাদ-সিন্ধু'র পর মীর-মানসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই শ্রেণীর রচনায়।

'মৌলুদ শরীফ' থেকে আরম্ভ করে 'খোত্‌বা' পর্যন্ত মীরের রচনাবলী স্বতন্ত্র মানদণ্ডে বিচার্য।

বসন্তকুমারী নাটক

মীর মশাররফ হোসেন-রচিত ১২৯৪ সালে প্রকাশিত 'বসন্তকুমারী নাটকে'র একখানি "দ্বিতীয় সংস্করণ" রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন আইনদ্দীন বিশ্বাস। ছাপা হয়েছে ময়মনসিংহ থেকে, চারুচন্দ্র প্রেসে, ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত কর্তৃক। নাট্যাংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯, দাম রাখা হয়েছিল আট আনা মাত্র।

প্রথম বারের 'বিজ্ঞাপন'টি এই "দ্বিতীয় সংস্করণে"ও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, এই বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ মাসে, ১২৭৯ সালে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় ব্রজেনবাবু এই তারিখই গ্রহণ করেছেন এবং ঐ একই সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত 'গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু' কাব্যগ্রন্থকে মীর মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় রচনা এবং 'বসন্তকুমারী'কে তৃতীয় গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন। উভয় গ্রন্থের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান মাত্র তের দিনের। কিন্তু মুদ্রিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশের সন-তারিখের সঙ্গে রচনাকালের ধারবাহিকতার মিল সব সময়ে নাও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে 'বসন্তকুমারী' পরে ছাপা হলেও লেখা হয়েছিল আগে এবং রচনাকালের ক্রম অনুসারে মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থসমূহের পরিচয় দান করতে হলে বলা সঙ্গত হবে যে, তাঁর প্রথম সৃষ্টি 'রত্নবতী' উপন্যাস, ১২৭৬ সালে বা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় রচনা 'বসন্তকুমারী নাটক' ১৮৭৩ সনে। তৃতীয় গ্রন্থ 'গোরাই সেতু' কাব্য ১৮৭৩ সনে। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে মীর মশাররফ হোসেন নিজেই বলেছেন, "আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী নাটক প্রস্ফুটিত হইল।"

মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত পরিমিত এবং অসম্পূর্ণ। তাঁর রচনার সঙ্গেও আমাদের পরিচয়ের বহর দুঃখজনক ভাবে সীমাবদ্ধ। তিনি পঁচিশ থেকে ছত্রিশ খানা বই লিখেছেন। তার মধ্যে আমরা কেউ পাঁচ থেকে সাত খানার বেশী পড়িনি। শীগগির যে পড়তে

পারব এমন কোন সম্ভাবনাও দেখা দেয় নি। সমসাময়িক যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা শিল্পীর কর্মজীবনের নানা দিকের পরিচয় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ধারণ করে আছে সে সমস্ত সাময়িক পত্রের কোন হদিস এ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্যে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা এবং তাঁর রচনার এক অতি ক্ষুদ্রাংশের উপর নির্ভর করেই আমরা মীর মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী-মানসের পূর্ণ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হই। এই বিচার ও মীমাংসা অনেকখানিই কল্পনানির্ভর। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু', এমন কি 'এসলামের জয়' যে জীবনবোধের পরিচায়ক, তার মধ্যে এক ধার্মিক-প্রেমিক-স্বাপ্নিক পুরুষ-প্রতিভার হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায়। মনে হয়, যেন এই শিল্পী কোলাহলের নয়, নিঃসঙ্গতার; সমাজের নয়, জীবনের; প্রতিষ্ঠানের নয়, হৃদয়াসনের। এই রকম একটা ধারণা জন্মে যে, দেশের আন্দোলনের বিক্ষোভের অংশীদার হয়ে জাতির বিড়ম্বিত ভাগ্যকে কল্যাণ-মণ্ডিত করে তোলার চেয়ে এই শিল্পীর অধিকতর আগ্রহ নিয়তি-নিপীড়িত মানুষের দেহের পরিসীমার মধ্যে যে বেদনা-দাহ-মন্থন-জাত হলাহল-অমৃত সৃষ্টি হয়, তারই বন্দনা করা। এবং এই ধারণাই আরও প্রশ্রয় পায় যখন জানি যে জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি কাটিয়েছেন মহানগরী কলি-কতার কর্মমুখর ঘূর্ণাবর্ত থেকে অনেক দূরে—গ্রামে—ময়মনসিংহে, দেল-দুয়ারে। এই জন্যে অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর একটি সুলিখিত তথ্যবহুল প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে :

> মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক জীবনে এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবেও তিনি জড়িত ছিলেন না। নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীদের সহায়তায় মুসল-মানদের কৃষ্টিসচেতন করে তোলার জন্য ১৮৬৩খ্রীষ্টাব্দের দিকে কলকাতায় Mohammedan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিও গঠিত হয়, তবুও এগুলোর সঙ্গে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে কোন যোগ দেখি না।

জীবনের হৈ চৈ কি মানুষের সঙ্গে দহরম-মহরম তিনি খুব পছন্দ করতেন না।

(ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৩৬১)

এই উক্তি মীর মশাররফ হোসেনের কবিমানসের জটিলতাকে যে পূর্ণরূপে চিত্রিত করে না, এরূপ মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ তাঁর নানা গ্রন্থে তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনতা, সেই সমাজের নানা গ্লানি ও আবিলতা সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ ও রোষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'জমীদার দর্পণে' তার স্বাক্ষর এত জ্বলন্ত যে বঙ্কিম পর্যন্ত এর নাটকীয় সার্থকতাকে স্বীকার করেও এর ভাবের অগ্ন্যুদ্গিরণকে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র নির্মম উল্লাসপূর্ণ কশাঘাতে সমসাময়িক মুসলিম অভিজাত জমিদার শ্রেণী যে মর্মান্তিকরূপে পীড়িত ও অপমানিত বোধ করেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি 'বিষাদ-সিন্ধু'র শোকতরঙ্গ প্রবাহের অন্তরালে লেখক সমসাময়িক মুসলিম সমাজের ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা এবং অনুদার শিল্পবোধের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানতেও কার্পণ্য করেন নি। তৎকালীন সমাজ-জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ আলোড়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে খুবই প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল, এগুলো তারই ইঙ্গিত বহন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে মুসলিম পুনর্জাগরণের শেষ কম্পিত শিখা—ওয়াহাবী আন্দোলনের মৃদুতম বিকাশকেও যখন ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে একেবারে নির্বাপিত ও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, মুসলিম চেতনার সেই নিরানন্দ অন্ধকার যুগে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব। তাঁর সাহিত্যখ্যাতির উন্মেষকালে মুসল-মানের আত্মসচেতনতার নবীন প্রচেষ্টাস্বরূপ যে সমস্ত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান ও মতনির্ভর দল গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের কোন সম্পর্ক ছিল না—একথাও হয়ত পূর্ণ সত্য নয়। সে সম্পর্ক হয়ত নিরবচ্ছিন্ন-রূপে মৈত্রী বা সহযোগিতার ছিল না, কিন্তু তাঁকে উদাসীন বা নির্লিপ্ত বলে কিছুতেই ভাবা যায় না। বরঞ্চ এ রকম সন্দেহ করার কারণ আছে যে, সে সম্পর্ক ক্রমে ঘোরতর বৈরীভাব ও পূর্ণ বিরোধিতায় পরিণতি

লাভ করে। মীর মশাররফ হোসেনের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ তাঁকে বঙ্গদর্শন-প্রদীপ-ভারতীয় পরিমণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট করেছে, বঙ্কিম-অক্ষয় মৈত্র সেই মৈত্রী স্থাপনের সেতু হিসেবে কাজ করেছেন। অন্যপক্ষে কাব্য-বিশারদ কায়কোবাদ, সমাজসেবক রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর জীবনদর্শনের প্রতি সরব ধিক্কার জানিয়েছেন, তাঁর সামাজিক মৈত্রী স্থাপনের অবাস্তব প্রচেষ্টাকে আদালতের কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে তিরস্কৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রেয়াজুদ্দীন মাশ্‌হাদীর 'অগ্নিকুক্কুট' আজও তার সাক্ষী, কায়কোবাদের 'মহররম শরীফ' কাব্যের বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা তার প্রমাণ। এমন কি, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য সভা-সমিতিতে যোগদান না করার সচেতন সংকল্পের কথা 'বিবি কুলসুম' বইতে পর্যন্ত একবার ইশারায় বলা আছে। তখনকার দিনের মুসলিম-পরিচালিত খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠনাদির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ বা সম্পর্ক ছিল না বলে আজকে আমাদের ধারণা, তা এই কারণেই ভ্রমযুক্ত বলে মনে হয়। নতুবা, Mohammedan Literary Society-র সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্ক না থাকলেও "শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের" প্রতি যে মীর মশাররফের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না তার প্রমাণ মীর মশাররফ হোসেনের "অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম" 'বসন্তকুমারী নাটকে'র উপহার-লিপি :

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাস্পদেষু— মহামহিম মিত্র! আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন।...বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনার অকপট স্নেহ...।

'বসন্তকুমারী নাটকে'র শিল্পরূপ ও ভাবকল্পনার মধ্যে তেমন কোন মৌলিকতা বা বিশিষ্টতা নেই। তবে শিল্পীর সাহিত্যসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালের রচনা হিসেবে এ নাটকটি বিশদভাবে আলোচনাযোগ্য। নাটকের চরিত্রসমূহ মুসলমান সমাজ থেকে গৃহীত হয় নি, এমন কি,তাঁরা সমাজের সাধারণ মানবগোষ্ঠির মধ্যেও পড়েন না। রাজা-বিদূষক, রাজ-পুত্র-রাজমন্ত্রী এবং রাণী-রাজকন্যার জীবন নিয়ে লেখা নাটক। তাঁদের

আচরণে-আলাপে কর্ম ও আবেগে এ জাতীয় কাহিনীর বাহ্যিক কাঠামোর কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু তবু তারই রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, হৃদয়ের প্রগাঢ় দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ চিত্রণে, বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর-গত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পাদনে ক্রিয়াময় রঙ্গরস-সৃজনে মীর মশাররফ হোসেনের নাট্য প্রতিভার সজীব স্পন্দন মাঝে মাঝে অনুভব না করে উপায় নেই।

নাটকের 'প্রস্তাবনা', সংস্কৃত নাটকের যে রীতি রঙ্গমঞ্চে তখন প্রায় সকলের উপরই ভর করেছিল, তার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু প্রাণহীন রীতিও যে প্রাণবন্ত কল্পনার স্পর্শে, আবেদনক্ষমতায় কত বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে, 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রস্তাবনা তার এক প্রকৃষ্ট নজীর:

নটী। নাথ আপনিও আমোদ-প্রমোদ নিয়েই আছেন। তা যা হোক, আমায় কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

নট। আজকাল ভদ্র সমাজে নাটকের অভিনয়ই প্রধান আমোদ বলে গণ্য হয়েছে। অতএব প্রিয়ে। তোমায় আজ একটি নূতন নাট্যাভিনয় করতে হবে।...(কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া) কিছুদিন হোলো শুনেছি বসন্তকুমারী নামে একখানি নাটক প্রকাশ হয়েছে, অদ্য তারই অভিনয় করা যাক।

নটী। বসন্তকুমারী।!! কার রচিত?

নট। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেনের রচিত।

নটী। ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন।

নট। কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্থ হলো?

নটী। হাজার হোক মুসলমান। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়?

নট। অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।

নটী। নাথ। ক্ষমা করবেন। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। নটীর এবং সেই সঙ্গে জাতি-বৈর ভাবে আচ্ছন্ন দর্শকমণ্ডলীর চিত্তশুদ্ধির এই কৌশলী প্রক্রিয়ার পর নট প্রথমে কিঞ্চিৎ নৃত্যগীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করার জন্য নটীকে অনুরোধ করে। পটীয়সী নটী তার স্বভাব-

চটুল সলজ্জতার প্রদর্শনী করে সে অনুরোধ রাখতে রাজী হতে চায় না। তখন নট বলছে :

দেখ প্রিয়ে! এটি তোমাদের স্বভাব। পারো সব, করো সব, কেবল লোকে বল্লেই লজ্জা জানাও।

অতঃপর নৃত্য-গীত এবং নাটক আরম্ভ।

ইন্দ্রপুরের রাজা বীরেন্দ্র সিংহ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন। দ্বিতীয়-বার দার পরিগ্রহের কোন গোপনাভিলাসও তাঁর হৃদয়ে নেই। তিনি তরুণ যুবরাজকে বিবাহ দিয়ে তাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। কিন্তু রাজমন্ত্রী বৈশম্পায়ন বিচক্ষণ লোক। রাজকার্য পরিচালনায় বার্ধক্য যে কেবল আশীর্বাদস্বরূপ নয়, একেবারে অপরিহার্য, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। তিনি রাজার মনোবাঞ্ছার প্রতি কোনরকম অসম্মান না করেই বলছেন :

যুবরাজ প্রজারঞ্জন কোরে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোরবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যৌবনকাল অতি ভয়ানক কাল।... ভূপতিগণের, ভূপতিগণের কেন----মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান শত্রু কাম রিপু। সুরলোকেও...। দেখুন সেই ভয়ানক শত্রু দমনে অক্ষম হয়ে সুরপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করে কেমন দুর্দশায় পতিত হয়েছিলেন।... কেবল এই অদমনীয় রিপুর ছলনায় লঙ্কাপতি সবংশে বিনাশ হয়েছেন।

কিন্তু তা হোক। রাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুবরাজের বিবাহ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে, এবং তার পূর্ণ অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজনও শুরু হয়। অন্যদিকে রাজমন্ত্রীর সঙ্গে যোগদান করেছে রাজবিদূষক প্রিয়ম্বদ। পত্নী-বিরহিত জীবন যে কী দুর্বিষহ, কী যন্ত্রণাময়, কী শূন্যতাপূর্ণ, একথা প্রিয়ম্বদ রাজাকে দিয়ে উপলব্ধি করাবেই। পুষ্পোদ্যানে প্রকৃতির শোভাময় সুরভিত অমৃত সুধা পানে রাজা মুগ্ধ ও তুষ্ট। কিন্তু প্রিয়ম্বদ তা স্বীকার করতে নারাজ :

ফুল দেখলে মন খুশী হয় এও কি একটি কথা! কোথায় ফুল আর কোথায় মন! সম্বন্ধও ভারি! কী মজার কথা, ছোঁবনা, খাবনা, দেখেই খুশী, এমন মনকে আর কি বলব মহারাজ! দেখুন এই উদর,

এই অর্থভাণ্ডার, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না সুঁকলেও মন খুশী হয়।...সে কি মহারাজ? বলেন কি? কিসের বয়েস? আপনার চুল পাকছে? কৈ আমি ত একটিও পাকা দেখতে পাই না। একটিও ত কাল হয় নাই। যেমন সাদা, তেমন ধব ধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন? কিসের বয়েস? আপনার যে বয়েস, এর চেয়ে কত অধিক বয়েসে কত শত লোকে বিয়ে করে বংশ রক্ষা কোরেছে। সামান্য কথায় বলে থাকে যে স্ত্রী মলে ঘর শূন্য হয়। আপনার কোঠা ঘর বলে কি আর শূন্য হবেনা?

এমন শক্তিশালী যুক্তি ও আবেদনের সামনে রাজা অটুট থাকতে পারলেন না। তাঁর চিত্তশক্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরতে শুরু হলো এবং ক্রমে কোন নবীনা যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে হৃদয় ও রাজপুরীতে গ্রহণ করাই স্থির করলেন।

ওদিকে ভোজপুরের বসন্তকুমারী পটাঙ্কিত যুবরাজ নরেন্দ্র সিংহের চিত্র দেখা অবধিই একরূপ বিরশ-বিহ্বল অর্ধমৃত অবস্থায় দিনপাত করছিলেন। পটের চিত্র প্রথমে তাঁর সকল স্বপ্নকে গ্রাস করেছে, তারপর তাঁর জাগ্রত চেতনায় প্রতিফলিত বিশ্বকে পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়েছে। ধ্যানমগ্না রাজকুমারীর পশ্চাৎ দেশ থেকে তার সখীও যদি ছুটে এসে দুই হাতে চোখ ঢেকে ধরেন, তখনও রাজকুমারীর মনে হয় এ কোমল পেলব হাত নিশ্চয় বীরবর নরেন্দ্রের—তাই চমকিতভাবে বলে ওঠেন:

আর কেন জ্বালাও, দু'খানি পায়ে ধরি, অবলা বালা, অন্তরে আর আঘাত দিও না। নাথ! আমি বালিকা, এ চাতুরির অর্থ আমি কি বুঝিব।

বসন্তকুমারীর পিতা কুমারী কন্যার এই অহেতুক বিকার, এই শোকাহত মূর্তি, এই রুগ্ন-বিবশা রূপ দেখে বিচলিত হয়ে তাকে ডেকে পাঠান। এবং কারণ জানতে চান, যাতে সম্ভাব্য সকল রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী বসন্তকুমারী আপন হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখার যে করুণ এবং নাটকীয় প্রয়াসে লিপ্ত হচ্ছেন তা উল্লেখ করার মত।

প্রথমে সখীকে :

আমার কিছু হয় নাই। আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমার মাথা খাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না।...

(রাজাকে মৃদুস্বরে) আমার কোন অসুখ হয় নাই।...

(কাঁদিতে কাঁদিতে) পিতঃ আমাব কোন অসুখ হয় নাই। আমাকে কেউ কোন কথা বলে নাই। কোন কথায় অবজ্ঞা করে নাই। আমার মনেও কোন কষ্ট নাই (ক্রন্দন)।...

পিতঃ আমার কোন পীড়া হয় নাই, বৈদ্য, চিকিৎসক, গণকের কোন আবশ্যক নাই। আমার কোন প্রকার ঔষধের প্রয়োজন নাই। আমি (ক্রন্দন)...

এরপর অবশ্য গণক ঠাকুর রহস্য ভেদ করেছে এবং মিলনান্তক পরিণতির আভাস দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রাজপুত্রের বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হবার আগেই রাজার নিজের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই তন্বীভার্য্যা গ্রহণ নিয়ে পুকুর পাড়ে মেয়েদেব নানা রকম গল্প জমে। একজন বলে : "রাজার ত চোক ছিল?" জবাব : "চোক থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়।" রাজপথে প্রজাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যই ঘোষণা করে : "বেটা উচ্ছিন্ন যাক। এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্য কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম সে কি মানুষ!" (প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে উপরোদ্ধৃত বাক্যের অকথ্য শব্দটি সর্বত্র সেকালে হালের হেয় অর্থে ব্যবহৃত হোতো না।) কেউ প্রতিবেশীকে কটাক্ষ করেই বলে :

বুড়ো বয়সে বিয়ে কল্লে ঐ দশা হয়; তুমিও ত কিছু কিছু বোঝ।

----এত না।

---বড় লোকে আর ছোট লোকে অনেক তফাৎ।

এর পরেই আমরা পরিচিত হই রাজার এই নবপত্নী রেবতীর সঙ্গে। নাটকের নাম 'বসন্তকুমারী' হলেও এই নাটকের প্রাণ রেবতী। মীর মশাররফ হোসেনের কবিমানস বসন্তকুমারীর জটিলতাহীন নমনীয় সরল আবেগের

গতিপ্রবাহের চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছে রেবতীর প্রখর জটিল দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হৃদয় দাহের প্রতি। কারণ সেখানে নাট্যকার খুঁজে পেয়েছেন জীবনের মোহনীয় স্মরগরল, মানুষের দেহ নেশার ভীষণ মধুর রূপটি। সেই প্রেরণা সৃষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ না করে থাকলেও মীর মশাররফ হোসেনের পরিণত রচনার শিল্প রহস্যের মর্মভেদ করতে হলে, তাঁর সত্য সাক্ষাৎকারের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে, তাঁর জীবনারম্ভের এই রেবতী চরিত্রের পরিচয় নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইন্দ্রপুরের রাজপ্রাসাদে রাণী এবং যুবরাজ-মাতা হিসেবে প্রবেশ করে এই নবীনা নারী মৃত সপত্নীর পুত্র নরেন্দ্রের রূপমোহে মুগ্ধ হোলো। সম্পর্কবিরুদ্ধ প্রণয়ের সর্ববিস্মরণকারী দুর্বার আবেগ তার সকল ঔচিত্য-বোধ ও বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত করে দিল। রূপজ মোহে অন্ধ হয়ে প্রেমপত্র রচনা করল নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সে পত্র প্রেরণের পূর্ব মুহূর্তে রাজার প্রবেশ এবং সে চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত। তখন রেবতী লালসাপ্রদীপ্ত উদভ্রান্ত প্রেমের সে নিবেদন-লিপির এমন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করল যে রাজা মনে করলেন যে, পত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে, তাঁর পুত্রের প্রতি নয়। নরেন্দ্র বিমাতার পত্র পেয়ে শিউরে উঠেছে এবং সংকল্প করেছে তার সম্মুখীন কখনো হবে না। কিন্তু রেবতী তার রূপ-লালসার প্রেম-পিপাসার নিবৃত্তির জন্য কোন কৌশলকেই আজ আর হেয় মনে করে না। তাই সে রাজাকে বলছে:

> নাথ! তোমার বিবেচনা নাই। দেখ দেখি, আমি তোমায় কতদিন বলছি যে, যুবরাজ নরেন্দ্র কুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই সাধ গেছে। আমার গর্ভ-জাতই না হোলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! আমাকেও আপনার মত দেখতে হয়। একটিবার দেখা দিতে নাই? আমারও সাধ আছে ত! আপনার পুত্র ত, আমার গর্ভে না হোলো, তাইতে কি আমি তারে স্নেহ কোরবো না, ভালবাসবো না? কেমন কথা বলছেন? ...মহারাজ আমি বিমাতা বটে, কিন্তু আমার মন তেমন নয়। ভগবান আমায়---করেছেন, কাজেই নরেন্দ্রের মুখপানে

চেয়ে থাকতে হয়। মহারাজ, যুবরাজ আমায় ভালবাসুন আর না বাসুন, আমি তাঁকে আপনার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

রাজার সঙ্গে নরেন্দ্রের নিকট লিখিত প্রণয়-পত্র নিয়ে কপটাচরণ, বিমাতার পুত্রস্নেহের অন্তরালে দয়িতের প্রতি তীব্র কামনার অব্যক্ত আবেগকে ভাষা দেয়ায় মীর মশাররফ হোসেন নাটকীয় সংলাপ রচনার উল্লেখযোগ্য কৌশল প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এত করেও রেবতী তার ভয়ঙ্কর কামনার বিষময় ফলকে এড়াতে পারল না। নরেন্দ্র প্রকাশ্যত তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তার প্রতি হৃদয়ের অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করে বিদায় নিল। ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো গর্জন করে উঠল রেবতী, স্বামীকে ডেকে এনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক কুৎসিৎ অভিযোগ শোনালো :

মহারাজ ! সে বড় ভয়ানক কথা। আমি সে মুখে আনতে পারিনা। আমার মরণই ভালো। পুত্রের এই কাজ ! আমি না হয় বিমাতাই হলাম। ··· (কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে) মহারাজ ! ছিঃ ! ছিঃ ! বড় ঘৃণার কথা ! আপনার কোন অপরাধ নাই, আমার মাথা আমিই খেয়েছি। নরেন্দ্রকে অন্তঃপুরে ডেকে এনে শেষে এই ফল হোলো ! মহারাজ ! ও দুরাচারের মাথা কেটে তুমি তোমার হাত অপবিত্র কোরোনা, কখনই কোরোনা, আমি বলছি, আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশের অনুমতি কর। ওর মৃতদেহ যেন আর চক্ষে দেখতে না হয়। ···যদি পারেন, তবে আমায় পাবেন। নচেৎ পুত্রের মায়া করেন, তবে আমার মায়া ত্যাগ করেন।

এর পরের পরিণতি শোকাবহ। ভয়াবহ। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র শেষ দৃশ্যের মত দ্রুত পতন ও মৃত্যুতে আকীর্ণ। নরেন্দ্র অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। তার সদ্য-পরিণীতা বধূ বসন্তকুমারী তার অনুগামী হয়েছে। রেবতী-লিখিত প্রেম-পত্রও রাজার হস্তগত হয়েছে। তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে তৎক্ষণাৎ তিনিও রেবতীকে ইহজগত থেকে বিলুপ্ত করে দেন ও নিজে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেন। এই পরিণতির ইশারা করেই নাট্যকার বসন্তকুমারী নাটকের অন্য নাম রেখেছেন : 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'।

আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা ও ভাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে একশ বছর আগে প্রকাশিত (১৮৫১) প্রথম বাংলা বিয়োগান্ত মৌলিক নাটক জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাসে'র। কিন্তু যা জি. সি. গুপ্তে নেই, তা হল 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী-গ্রন্থনের সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল। যা 'বসন্তকুমারী'তে নেই, তা আছে ফরাসী নাট্যকার রাসিনের Phaedraতে—যেখানে সপত্নীপুত্র Hyppolytus-এর প্রতি স্মরাহত হয়ে রানী তার ক্ষতাক্ত হৃদয়ের শোণিত দিয়ে গড়ে তুলেছে সংলাপের উত্তাপকে, তার অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের রোষস্ফুলিঙ্গ দিয়ে করে তুলেছে সে ভাষাকে প্রদীপ্ত, শাণিত। রেবতীর সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের বিষজ্বালা এই গাঢ়তা, এই অমোঘতা, এই অনিবার্যতা নিয়ে 'বসন্তকুমারী নাটকে' বাস্তবতাব বিভ্রম সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় নি।

না হোক। তবু 'বসন্তকুমারী নাটক' মীর মশাররফ হোসেনের রচনা-সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এজিদ-জায়েদার সার্থক স্রষ্টার শিক্ষানবিশী কালেব এই রচনা ভবিষ্যৎ পরিণতির বিশিষ্ট বীজ বহন করে বলেই এই গ্রন্থের এত বিস্তৃত আলোচনা।

———

জমীদার-দর্পণ

১.১. মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩)। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাস্থলের নামকরণে, পরিবেশ-রচনার প্রবণতায় এবং কাহিনীর কাঠামো-পরিকল্পনায় এক প্রকার ঐতিহাসিকতার আভাস পরিলক্ষিত হলেও বসন্তকুমারী কোনোক্রমেই ঐতিহাসিক নাটক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। এই নাটকের মূল বর্ণিতব্য বিষয় প্রণয়, প্রণয়ের পরিণাম। সপত্নীপুত্রের জন্য বিমাতার প্রেমতৃষ্ণা চরিতার্থতা লাভের স্বাভাবিক পথ খুঁজে না পেয়ে কি ভাবে এক প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-শক্তি রূপে বিস্ফোরিত হোলো নাট্যকার তার রহস্য উদঘাটন করেছেন। 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) মীরের দ্বিতীয় নাটক এবং প্রকৃতিতে প্রথম প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'জমীদার দর্পণে' প্রতিফলিত বস্তু সমাজ, মানবহৃদয় নয়। রূপ ও প্রেমের মোহে অন্ধ অন্তরের যে বিষক্রিয়া মানবীয় সত্তাকে প্রখর ও প্রদীপ্ত করে তোলে, 'জমীদার দর্পণে'র শিল্পী তার অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশে উৎকণ্ঠিত নন। তাঁর বক্তব্য সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক, শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের হৃদয়হীনতাকেই তিনি এখানে মর্মস্পর্শী করে তুলতে চেয়েছেন। মীরের সাহিত্যজীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্বের এই দুই সৃষ্টি নাটকীয় শিল্পকর্ম হিসাবে স্বভাবতই ত্রুটিপূর্ণ ও অপরিণত। তবু স্মরণীয় এই জন্য যে, এই রচনাদ্বয়ের মধ্যেই মীর-মানসের দুই মূলগত প্রবৃত্তির তাৎপর্যপূর্ণ উন্মেষ ঘটে।

১.২. 'জমীদার দপণে'র ওপর 'নীলদর্পণে'র প্রভাব এত বেশী যে স্থল বিশেষে সরাসরি অনুকরণ বলে ভ্রম হয়। নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এই নাটক পাঠক-দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। দেশের সত্যিকারের শোচনীয় দুরবস্থা এই প্রকার সাহিত্যের আবেদনকে ব্যাপক ও তীব্র করে তুলতে সহায়তা করে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সাহিত্যিকরাও এই আবেগের সংক্রামকতার দ্বারা আক্রান্ত হন। নীলদপণ প্রচারিত হওয়ার তের বছর

পর দার্পণিক নাটকের পুনরভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করলেন মীর মশাররফ হোসেন। 'জমীদার দর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩-এ। এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সাক্ষাৎ দর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল এরও দু'বছর আগে। প্রতিবিম্বনের বিষয়বস্তু ছিল বাঙালী সমাজের কদাচার। প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৭৩-এ, যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' ১৮৭৪-এ। চা-কুলীদের উপর চা-কুঠীর শ্বেতাঙ্গ মনিবের জুলুম বর্ণিত হয় 'চা-কর দর্পণ নাটকে' (১৮৭৫), 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) নাটকের বিষয় উৎপীড়িত জেলের কয়েদী। এই রচনাসমূহের মধ্যে সম্ভবত মীরের 'জমীদার দর্পণ'ই শ্রেষ্ঠ।

২.১. বঙ্কিম 'জমীদার দর্পণ'কে 'বঙ্গদর্শনে' আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করেন। ঐ পত্রিকার ১২৮০-র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমের অভিমত আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

> জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্ন মাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।
>
> জমীদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।
>
> এই দর্পণে জমীদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহিনা। এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখনো ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

> কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদিগের বলা কর্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা, জমিদারের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, সেশন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাব প্রযুক্ত পারিলাম না। কিন্তু সরোজিনী নাটকের ন্যায় ইহাতেও অনেক পরিহার্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের মতে 'জমীদার দর্পণে'র প্রশংসনীয় দিক এর ভাষার বিশুদ্ধতা এবং জীবনচিত্রণের বাস্তবতা। এর নিন্দার দিক নাট্যকারের অপ্রিয় মনোভাবের উগ্রতা এবং কোনো অংশের অপ্রিয় ভাষণের কদর্যতা।

২.২. 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা মুসলমানি নয়, শুধুমাত্র এই কারণে এর বিশুদ্ধতার তারিফ বঙ্কিম করতে পারেন, আমরা পারি না। তা ছাড়া আমরা মনে করি যে, নাটকের সংলাপ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট হয় না, চরিত্র ও ঘটনার মর্মানুযায়ী বিচিত্রমুখী হলেই তা নাটকীয় অর্থে বিশিষ্টতা লাভ করে। সংলাপের এই আদর্শের শিক্ষা মীর দিনবন্ধুর নাটক থেকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই হায়ওয়ান আলীর মুখের কথায় তার পাপাত্মার লালাক্ষরণ প্রত্যক্ষ করতে পারি : "নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক।" জীতু মোল্লা 'চারবার অজু' করবার পর এখন তসবিহ্ টিপতে টিপতে এবং হরিদাস বৈরাগী কৌপীন পরে হরিবোল জপতে জপতে অবলীলাক্রমে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। কথাবার্তায় ও হাবভাবে কৃষ্ণমণি হুবহু দীনবন্ধুর পদী ময়রাণীর আদলে গঠিত। এমন কি হায়ওয়ান আলী কর্তৃক নূরন্নাহারের বলাৎকারের দৃশ্য সর্বাংশে রোগ সাহেবের ক্ষেত্রমণির ওপর হামলার অনুরূপ। অসহায় নূরন্নাহারের যন্ত্রণাক্লিষ্ট আর্তনাদ ক্ষেত্রমণির করুণ মিনতিরই প্রতিধ্বনি।

২.৩ প্রজাহিতৈষী হয়েও বঙ্কিম যে সাময়িক কারণে মীরের উগ্র জমিদার-বিরোধী মনোভাবের অনুমোদন করতে অক্ষমতা জানিয়েছেন, আমরা তার যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। তবে প্রকাশের ক্ষেত্রে সেই প্রবল উষ্মা যে বহু স্থলে শিল্পগত শালীনতা ও সংযমের সীমানা স্পষ্টতই লংঘন

করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধান চরিত্রসমূহের নামকরণে, গর্ভবতী নারী-ধর্ষণের নগ্নচিত্র উদ্‌ঘাটনে, মোসাহেবদের কথোপকথনে, ইংরেজ জজ-ডাক্তারের রহস্যালাপে যে কদর্যতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা আত্যন্তিকভাবে এতই স্থূল ও ন্যক্কারজনক যে নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও সাহিত্যে এগুলোর ব্যবহার অনুচিত। পাপপূর্ণ জগত চিত্রিত করতে গিয়ে লেখক সত্যি সত্যি নিজের লেখনী কলুষিত করেছেন। পড়তে পড়তে সন্দেহ হয় লেখকের উত্তেজনা যতটা সাধু উদ্দেশ্যর দ্বারা প্রণোদিত, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যক্তিগত আক্রোশে কম্পমান। মনে হয়, যেন এক অমার্জিত অসংস্কৃত গ্রাম্য প্রতিহিংসাত্মক প্রবৃত্তি শিল্পীর দৃষ্টিকে পদে পদে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৩.০. 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে তুলনা করলেই 'জমিদার দর্পণে'র দুর্বলতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। সেখানে শাসক শ্রেণীর অত্যাচার প্রকটিত করার জন্য লেখক কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনের লালসানিবৃত্তির কুকীর্তিসমূহ চিত্রিত করেই ক্ষান্ত হন নি, তাদের অর্থনৈতিক শোষণ-প্রণালীর নৃশংসতাকেও নিপুণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত শুভশক্তিকেও প্রদীপ্ত ও প্রাণবন্ত মানবিক অস্তিত্ব দান করেছেন। উড, রোগ ও পদী ময়রাণীর পাশাপাশী বসু পরিবার ও তোরাপ সংস্থাপিত হওয়ায় আমরা নাট্যকারের সুস্থ জীবনাদর্শেরও সাক্ষাৎ লাভ করি, লাভ করে প্রীত ও আনন্দিত হই। 'জমীদার দর্পণ' আগাগোড়া ঋণাত্মক ও ক্লেদাক্ত মানুষ-রূপী জীবজন্তুর আচরণে পরিপূর্ণ। প্রথম অঙ্কে ধর্ষণের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় অঙ্কে ধর্ষণের অনুষ্ঠান, তৃতীয় অঙ্কে অনুষ্ঠিত কর্মের পুনরালোচনা---এই হোলো 'জমীদার দর্পণে' বিম্বিত জীবনের সরলতম সার। এর বিরুদ্ধে দুর্বল আবু মোল্লা ও দুর্বলতর নুরন্নাহারের প্রতিবাদ এবং প্রস্তাবনা ও উপসং-হারের নট-নটীর হিতোপদেশ, সমাজ-সংস্কারমূলক বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রত্যাশিত শুভশক্তির প্রচ্ছন্ন আবাহনকে আদৌ ইঙ্গিতময় করে তুলতে পারে নি। এই দর্পণে এক বিশেষ প্রকৃতির বর্বরোচিত অত্যাচারের কদর্যতা হয়ত অবিকল প্রতিবর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার শিল্পসঙ্গত রূপান্তর সাধিত হয় নি।

বিষাদ-সিন্ধুর পুনর্বিচার

১.০. পুঁথির জীবনদৃষ্টি মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা, ধর্মভীতি এবং অলৌকিকতা-মণ্ডিত। যেখানে এই পুঁথির প্রভাব পড়েছে সেখানেই এই অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। এই আচ্ছন্নতা এতই সংক্রামক যে পুঁথির অনুসরণকারী বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকরা পর্যন্ত একে এড়াতে পারেন নি। এমন কি পুঁথি-সাহিত্যের সুশিক্ষিত আধুনিক সমালোচকরা পর্যন্ত এর প্রভাবাধীন হয়ে অপ্রমাণিত এবং অপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত জাহির করতে আদৌ অস্বস্তি বোধ করেন না। কিছু-কাল আগের মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় বিষয়ের ওপর রচিত একালের একাধিক গবেষণাগ্রন্থ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১.১. বাংলায় রচিত কারবালা কাহিনীসমূহের আদি উৎস অনুসন্ধান কবতে গিয়ে প্রায় সকলেই ফারসী কেতাব পর্যন্ত উঁকি দিয়েছেন। কেউ সেগুলো পড়ে দেখেছেন, এমন প্রমাণ তাঁদের আলোচনায় নেই। 'মক্তুল হোসেন', 'শাহাদাত হোসনায়েন' এবং 'শাহদাতেন' বলে তিনটে বিদেশী ভাষার গ্রন্থের ঘন ঘন উল্লেখ করেছেন বটে, তবে এগুলোর রচয়িতা কে, এগুলো প্রচারিত হয় কখন, কাদের মধ্যে এবং ইতিহাসের কোন্ কোন্ ঘটনা কি উদ্দেশ্য এসব বইতে কতদূর উপেক্ষিত, পরিবর্তিত বা উদ্ভাবিত হয়েছে, তার কোন স্পষ্টাকৃতির সদুত্তর বিশেষজ্ঞরা দিতে চেষ্টা করেন নি। মামুলী প্রশ্নের ঢালাও জবাব দিয়ে গেছেন এবং আসল প্রশ্নগুলো ভাবনার মধ্যেই আনেন নি। আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো সেগুলোই, যেগুলোর মুখ্য সম্পর্ক সাহিত্যের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে নয়। যে ঘটনার বিন্যাস সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, কোনো একটি গল্প-কবিতা-নাটকের প্রাণবস্তুরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছে, আমাদের প্রধান প্রশ্নগুলো তাকে কেন্দ্র করেই উত্থাপিত হতে পারে। সাহিত্যে প্রাপ্ত এই মুখ্য বস্তুটি যদি ইতিহাসের নিতান্ত অসার পদার্থ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে রচনাটি অনৈতিহাসিক। গ্রন্থের নানা স্থানে

ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা যত সততার সঙ্গেই বর্ণিত হোক না কেন, রচনার শিল্পমূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ তাৎপর্য যৎসামান্য। এই একই কারণে রচনার মূল প্রবৃত্তি বিচার না করে, কেবল মাত্র বাহ্য মিলের নির্দেশ দ্বারা এক লেখককে অন্য লেখকের নকলকার বলে অভিহিত করা আমাদের মনঃ-পূত নয়। 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতার মূল্য কি এবং পুঁথির ঐতি-হাসিকতার সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কি এই উভয় প্রশ্নের মীমাংসাও অন্য কোনো উপায়ে লভ্য নয়।

১.২. জনৈক গবেষক প্রচার করেছেন যে জঙ্গনামার পুঁথির শেষাংশে এবং মীরের বিষাদ-সিন্ধুর উদ্ধারপর্বে সত্যতা বিশেষ কিছু নেই। যেন উভয় গ্রন্থের পূর্বার্ধেই ইতিহাস অটুট। গবেষক সেই রকমই মনে করেন এবং প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, হাসান হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ ঐতিহাসিক, হযরত আলীর মৃত্যু ঐতিহাসিক, হোসেনের মস্তক দামেস্কে প্রেরণের কথা ঐতিহাসিক, অর্থাৎ কারবালা-কাহিনীর গোড়ার কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এটা কি যথেষ্টরূপে সদ্বিচার হোলো ? মধ্যযুগের কবিরা যেখানে সত্য ঘটনার ওপর কারুকার্য করেছেন, সেখানেই আজগুবি কথার অবতারণা না করে থাকতে পারেন নি। কেবল ঘটনার মূল সূত্র নয়, তার ইহলৌকিক প্রকৃতি ও প্রাণধর্ম বিকৃত না করেও কল্পনাময় অতিরঞ্জন ও পুনর্সৃষ্টির আশ্রয় কেবল আধুনিককালের শিল্পীরাই নিতে পেরেছেন। ইতিহাসের সত্যের সংগে শিল্পের সত্যের পার্থক্য অনেক, কিন্তু মধ্যযুগের সত্যাসত্যবোধের সঙ্গে আধুনিক কবির বাস্তবানুভূতির পার্থক্য তার চেয়েও বেশী। মুহম্মদ খান, হায়াত মামুদ ও গরীবুল্লাহ্ অলীক কথার বাদশা। কথা যে কেবল বানিয়েছেন তাই নয়, বানিয়েছেন একেবারে মানবীয় সত্যাসত্যের সীমানা অতিক্রম করে। মীর সাহেব 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথ-মার্ধেও ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু করলেও তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, রূপকথা বা পুঁথি বানান নি। উদ্ধারপর্বে শিল্পী মীর প্রকৃতই পতিত। এই অংশের অনেক স্থল যদি গদ্যের বদলে পদ্যে রচনা করতেন তা হলে মীর অতি সহজেই মুহম্মদ খান-হেয়াত-গরীবুল্লাহ্-র প্রাণের দোসর বলে বিবেচিত হতে পারতেন। ডক্টর মযহারুল ইসলাম হেয়াত মামুদকে

তুলনায় গরীবুল্লাহ্‌র চেয়ে অনেক বেশী মানবতাবোধসম্পন্ন এবং সত্যনিষ্ঠ মনে করেন। বোধহয় সেই কারণে 'বিষাদ-সিন্ধু'র অলৌকিকতার ভূত গরীবুল্লাহ্‌র কাঁধে চাপিয়ে আশ্বস্ত বোধ করেছেন। আমাদের মতে গরীবুল্লাহ্‌র ও হেয়াত মামুদের কবিকৃতির পার্থক্য নিরূপণের জন্য উভয়ের মধ্যে আলৌকিকতার পরিমাণগত তারতম্য পরীক্ষা করা অনাবশ্যক ছিল।

২.৩. গ্রন্থের উৎপত্তি বর্ণনাপ্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন ভূমিকায় বলেন যে, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত"। এ কথা অবিশ্বাস্য। মুহম্মদ খান, হেয়াত মামুদ, গরীবুল্লাহ্‌, সা'দ আলী, আবদুল ওয়াহাব সকলেই আরবী-ফারসী কিতাবের দোহাই দিয়েছেন। 'জঙ্গনামা'য় (১৭২৩) হেয়াত মামুদের ঘোষণা:

পড়িনো শুনিনো ভাই আরবী ফারসী।
ইমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসি।।
যতেক শুনিনো মুঞি পুস্তক বয়াতে।
কথো আছে কথো নাহি কেতাবের মতে।।
নাহি জানে আদ্য কথা নাহি জানে তত্ত্ব।
পচাল পড়িয়া মিথ্যা ফিরয়ে সতত।।
তাহা শুনি মনে মোর দ্বিধা সর্বক্ষণ
বচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ।।

গরীবুল্লাহ্‌ (১৭৫০) আরো সরাসরি স্বীকারোক্তি করেন,

ফার্সী কেতাব ছিল মোক্তাল হোছেন।
তাহা দেখি কবি আমি করিনু রচন।।
রচনার ঝুটা সাচ্চা আমি নাই ঠেকি।
কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি।।

পাঠকের চিত্তে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করবার জন্য মীরের পূর্বসূরীরা গ্রন্থারম্ভে যে পর্যায়ের ভণিতা-রচনার প্রথা চালু করেন, মশাররফ হোসেন তার অনুকরণ করেছেন মাত্র! পুঁথি-রচয়িতাদের আরবী-ফারসী জ্ঞান পরিমাপ করার সুযোগ আমাদের নেই, কিন্তু মীর-মানস যে প্রধানতঃ

বাংলা পুঁথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে, তার অনেক প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। স্বভাবতঃই পুঁথির বিশ্বস্ত সূত্রতায় প্রাপ্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনেক ঘটনাই অলীক। এজিদের জন্মলাভের কুৎসিৎ বৃত্তান্তটি পর্যন্ত মুহম্মদ খান, হেয়াত মামুদ, গরীবুল্লাহ্ ও সা'দ আলি-আবদুল ওয়াহাবে লভ্য। যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় ডাহা আজগুবি অতিরঞ্জন, হোসেনের ছিন্ন শির থেকে প্রবাহিত শোণিতবিন্দুর ধারায় এজিদের পরিণাম আরবী হরফে লিখিত হওয়া এবং সেই খণ্ডিত শির উর্দ্ধাকাশ থেকে পতিত স্বর্গীয় জ্যোতির আকর্ষণে আসমানে উঠে যাওয়া, পূর্বঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কারবালার প্রান্তরের আকাশে বাতাসে বৃক্ষে মাটিতে আশু মরণ সম্ভাবনার সহস্র প্রকার ছায়াপাত ঘটা, ফোরাতে ভাসমান অবস্থায় প্রভুভক্তের পুত্রদ্বয়ের শূন্যশির যুগল দেহের কাছে পাত্রস্থ মস্তক ধরতেই সেগুলোর দেহ অনুযায়ী সঠিক যোগাযোগ হয়ে যাওয়া, সবই অবিকল পুঁথির নিয়মে ঘটেছে। এমন কি হানিফা–এজিদের লড়াই, সখিনা-কাসেমের বিবাহ, জয়নাবের রূপের খ্যাতি ও জায়েদার অসুস্থ ঈর্ষা, এগুলোও পুঁথির দান। এসব জিনিস আবিষ্কারের জন্য মীর মশাররফ হোসেনকে ইতিহাস অনুসন্ধানের কোন ক্লেশ স্বীকার করতে হয় নি। মৌলিক অলৌকিক কথা মীর মশাররফ হোসেন যে কিছুই বলেন নি, তা নয়। তবে সেগুলো কোন গভীর চিন্তার ফল নয়, গ্রামীণ ঐতিহ্যানুশীলনের পরিণাম মাত্র। বিষাদ-সিন্ধুর জনপ্রিয়তা অনেকাংশে এর উপর নির্ভরশীল হলেও শিল্পী মীরের কৃতিত্বের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার জীবনবিমুখ আচ্ছন্নতাকে অপসারিত করে ইহলোকের ইন্দ্রিয়পরবশ মানব-মানবীর হর্ষশোকের মহামূল্যকে তিনি যে কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ, কিস্‌সা-কাহিনীর ক্রোড়োদ্ভূত হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত মৃত্তিকা-সংলগ্ন, প্রিয়-পরিজন-বেষ্টিত, শত্রু–মিত্র পরিবৃত, সজীব নরনারী।

৩.১. গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদের। তার চিন্তায়-আচরণে, আবেগে-অভিব্যক্তিতে এমন একটা দৃঢ় গাঢ় ঔজ্জ্বল্য আছে যে

অন্যান্য চরিত্র তার পাশে নিতান্ত মর্যাদাহীন বলে মনে হয়। নীতিবিদের দৃষ্টিতে এজিদের ক্রিয়াকর্ম যত গর্হিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হোক না কেন, চরিত্র বিচারের সাহিত্যিক মানদণ্ডে এজিদের মতো প্রাণময় পূর্ণাবয়ব পুরুষ সমগ্র উপন্যাসে দ্বিতীয়টি নেই। এজিদ পাপী, ধর্মদ্রোহী এবং ইন্দ্রিয়পরবশ। কিন্তু এজিদের পাপের প্রকৃতি অসামান্য, তার বিকাশ প্রলয়ঙ্করী, তার পরিণাম যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোকাবহ। এজিদ সাহসী রণকুশলী বীর সেনাপতি। রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনায় সে অকুতোভয়, রূপজ মোহে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মতো সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। স্বপক্ষীয় কৃতী সৈনিককে পুরস্কার দানে সে মুক্তহস্ত, অসহায় বন্দিনীকে লাঞ্ছিত করতে কুণ্ঠিত। তার অত্যাচারের মধ্যে নৃশংসতা ও নির্মমতা থাকতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্রতা ও নীচতা নেই বললেই চলে।

লেখক বড় সযত্নে এজিদ চরিত্র নির্মাণ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তার আহত হৃদয়ের স্বীকারোক্তি আমাদের সমবেদনা আকর্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছে। "চোখের সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ জ্বলিয়া উঠে। এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত ও রাজ মুকুটের প্রত্যাশী নহেন।" এজিদ প্রতাপের দোসর। কামনার প্রবাহ প্রতিরোধে অক্ষম, প্রেমবহ্নিতে দগ্ধীভূত যুবক অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে, "হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন, এজিদ বিষপান করিয়া, যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশা নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোনো নির্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্র ধামে চলিয়া গিয়াছে।" (উদ্যোগ পর্ব,১) শত্রুহস্তে পরাজয়ের সম্ভাবনায় এজিদ কখনও ভীত হয় নি, কোনো অস্ত্রাঘাতের আশঙ্কায় বিচলিত বোধ করে নি। কিন্তু জয়নাবের প্রত্যাখ্যান তার সত্তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রথম কথাতেই জয়নাবের মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাও দেখিয়াছেন। সে অস্ত্র তাহার বক্ষে বসিবে না, যাঁহার অস্ত্র, তাঁহারই শোণিত—কিন্তু বিনা আঘাতে, বিনা রক্তপাতে, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত আজীবন শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যে

অদৃশ্যভাবে ঝরিতে থাকিবে, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন।" (উদ্ধার পর্ব, ২১) সব বোঝাবুঝির যখন অবসান ঘনিয়ে আসে, এজিদের সৌভাগ্য রবি চিরতরে অস্তমিত হতে আর বাকী নেই, তখনও এজিদের ব্যক্তিত্ব আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। অশ্রুসিক্ত আঁখি সুরাপানের প্রভাবে রক্তবর্ণ। কিন্তু "এখন এজিদের চোখে জল নাই। বিশাল বিস্ফারিত যুগল চক্ষে এখন আর জল নাই। ··· না, না, সে জল নহে। যে দুই এক ফোঁটা পড়িবে, সে দুই এক ফোঁটা জল নহে, জল হইবার কথা নহে। মর্মাঘাতের আহত স্থানের বিকৃত শোণিতধারা···সে বিশাল নেত্রযুগল হইতে আজ জল-ধারা প্রবাহিত হয় নাই।" (উদ্ধার পর্ব ২৯,) বন্দিনী জয়নাবের উদ্দেশে তার যে সরাসরি ব্যাকুল নিবেদন, তার মধ্যেও লাম্পট্যের চিহ্ন মাত্র নেই। আছে শুধু ক্ষোভ বেদনা দাহ, "বিবি জয়নাব। ...যেদিন—কে না জানিল যে দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুইটি চক্ষুই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্দ্ধান হইল। সে দিনের সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথা? সে কেশ শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে আপনার চক্ষের বিষ? কি কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা?" (উদ্ধার পর্ব, ৩)

৩.২. যেদিক থেকেই বিচার করি না কেন, আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে মীর মশাররফ হোসেনের মানবপ্রীতি ও শিল্পবোধ 'বিষাদ-সিন্ধু'র ধর্মীয় উদ্দেশ্য গুরুতররূপে ব্যাহত করেছে। এজিদ চরিত্রই তার মূল কারণ। ধর্মযুদ্ধে উৎসর্গীকৃত মহৎ প্রাণের বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত করতে বসে তিনি প্রকৃতপক্ষে রূপমুগ্ধ প্রণয়দগ্ধ হৃদয়ের আত্মক্ষয়ের মহিমাকেই ট্র্যাজেডীর গৌরব দান করেছেন। কারবালার বিয়োগান্ত পরিণামের কারণ হিসাবে পুঁথিতেও এজিদের অচরিতার্থ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি ইঙ্গিত আছে। মীরের এটা মৌলিক উদ্ভাবন নয়। তবে তাকে রক্ত-মাংসের এই প্রচণ্ড প্রাণবত্তা দান করা পুঁথির অসাধ্য ছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শহীন প্রাক-

বঙ্কিম যুগের কবির জীবন-চেতনায় ইন্দ্রিয়পারবশ্যতার এই ভয়ানক শোকাবহ পরিণতির উপলব্ধি কল্পনীয় নয়। এ কর্ম আধুনিক শিল্পীর। ইতিহাস প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়, এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয়সিন্ধু। নিজের সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহ দানের জন্য এজিদ আহ্বান জানায়, "ভাই মারওয়ান। ...যদি এজিদের...জয়নাব লাভের আশাতরী বিষাদসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না।"

ধর্মসিন্ধুর বিষাদবেদনা অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। শিল্পীর অদৃশ্য মহাশক্তিই যেন নিয়তির রূপ ধারণ করে, হানিফার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করার প্রাক্‌মুহূর্তে, নিজের বরপুত্র এজিদকে অন্তরীক্ষে টেনে নিয়ে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করল। মাইকেল-বঙ্কিমের জীবনোপলব্ধির উত্তরাধিকারী মীরের হাতে এমনি করেই পুরাতন নীতিধর্মের পরাভব ও শিল্পের বৈজয়ন্তী লাভ ঘটে।

৪.১. ধর্মের নয়, শিল্পীর মনের কথার এক সুতীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে জাএদা চরিত্রে। জাএদাই হয়ত উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত মানবী, অনুভব শক্তির তীব্রতায় এজিদের পরই তার স্থান স্বীকার করে নিতে হয়। যে সপত্নীবাদের উৎপীড়নে মীরের দাম্পত্য-জীবনের একাংশ ক্ষতবিক্ষত ছিল, সে অভিশাপের আদর্শায়িত রূপ দ্বারাই যেন ইমাম-পরিবার আচ্ছন্ন। এই আরোপনের পেছনে প্রচলিত পুঁথির অনুমোদন ছিল বলে মীরের পক্ষে হোসেন পরিবারের এই প্রকার বিপর্যয় রূপায়ণে অবাধ হওয়া সহজ। শিল্পী হিসাবে এই মানবিক জটিলতার কাল্পনিক চিত্র তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করলেও সামাজিক হিসাবে তাঁর হৃদয় পুরোপুরি নিঃশঙ্ক হতে পারে নি। ইসলামী ইতিহাসের সর্বজনপূজ্য মাননীয় ইমাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের এরকম মানবীকরণ যে অনেক ধর্মপ্রাণ বরদাস্ত করতে রাজী হবেন না, একথা মীর সাহেব টের পেয়েছিলেন। তাই জাএদা চরিত্রের বিকার বর্ণনা করতে উদ্যত হয়ে বার বার তিনি ধর্মভীরু পাঠকের মনোভাবের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন, ঔপন্যাসিকের দায়িত্বের সীমানা উল্লংঘন করে একাধিক স্থলে

সমকালীন সামাজিকদের কল্পনাশক্তিহীন অনুদার বিচারবোধকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। আপত্তিকর কিছু বলবেন না, এই রকম একটা কৃত্রিম সংকল্পের আবরণ সৃষ্টি করেছিলেন বটে, তবে তার মর্যাদা বেশীক্ষণ রক্ষা করে চলেন নি, হয়ত সেরূপ প্রবৃত্তিই তাঁর ছিল না। মনের কথা গমকে গমকে ফেটে বেরিয়ে পড়েছে।

৪. ২. হাস্‌নেবানু হাসানের প্রথমা পত্নী, জাএদা দ্বিতীয়া, জয়নাব তৃতীয়া এবং অদ্বিতীয়া। গ্রন্থকারের ভাষ্য:

সপত্নীবাদ কোথায় না আছে?—হাস্‌নেবানুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশি জ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।..এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারে সংকুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না, সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষমতা কত? অপ্রশস্ত হৃদয়ের আয়তনই বা কত যে, ঐ মহাপুরুষের কীর্তিকলাপে বুদ্ধি চালনা করি। মনের কথা মনেই থাকিল।..স্বামীর নিরপেক্ষ ভালবাসা জাএদা আর ভালবাসিলেন না, মনের কথা মনেই থাকিল।

(মহরম পর্ব, ৭ম প্রবাহ)

অথবা,

জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবে না।...এখন তিনি কথা কহেন কিন্তু পূর্বেকার সেই স্বর নাই, সেই মিষ্টতাও নাই। ভালবাসেন কিন্তু তাহাতে রস নাই। আদর করেন, কিন্তু সে আদরে মন গলে না, বরং বিরক্তিই জন্মে। আগে জাএদার নিকট সময়ের দীর্ঘতা আশা করিতেন, এখন যত কম হয় ততই মঙ্গল, তাহাই ইচ্ছা। পূর্বে কথাবার্তাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তবুও সে কথার ইতি হয় নাই, মনের কথাও ফুরায় নাই, এখন জাএদার শয্যায় শয়ন করিলে ডাকিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। প্রভাতী উপাসনার সময়

> উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ঊষাকালে একত্র শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু উপাসনায় ব্যাঘাত নাই। ঘরের কথা কে বুঝিবে বল দেখি?
> (মহরম পর্ব, ১৩শ প্রবাহ)

গ্রন্থকার সবই বোঝেন। বোঝেন বলেই, স্বামীপ্রেমলাভের লালসায় কাতর এক রমণী-হৃদয় ব্যর্থতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে কি ভাবে ক্রমশঃ ভয়ানক পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হোলো তার ট্র্যাজেডী বর্ণনা করতে পেরেছেন। হাসান-হত্যা এই প্রক্রিয়ার অপ্রতিরোধ্য পরিণাম রূপে প্রদর্শিত হওয়ায় পৈশাচিকতার চেয়ে তার শোকাবহতাই আমাদের বেশী অভিভূত করে। সে শোকানুভূতি যেমন হাসানের জন্য উদ্বেল হয়, তেমনি জাএদার জন্যও বটে। এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব। তিনি পাপের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করেও পাপীর জন্য সমবেদনায় আকুল। হাসান-হত্যার দৃশ্যবর্ণনায় যে সূক্ষ্ম নাটকীয় কারুকার্য লক্ষণীয়, তার মূলেও জাএদা চরিত্রের মর্মান্তিক অবক্ষয় সম্পর্কে লেখকের উপলব্ধি বিশেষভাবে সক্রিয়।

> গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া হাতের জোর হাতে রাখিয়া, অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাএদা দেখিলেন দীপ জ্বলিতেছে। এমাম হাসান শয্যায় শায়িত—জয়নাব বিমর্ষবদনে হাসানের পদ দুখানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন।··· জাএদা বিষের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া কি ভাবিয়া আর খুলিলেন না। হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি খুলিয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে সোরাহীর মুখবন্ধ বস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বরাবর বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।
> (মহরম পর্ব, ১৬শ প্রবাহ)

জাএদার অন্তরাত্মার অপমৃত্যু এই দৃশ্যেই সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী। পরবর্তী পর্বে পতিহন্তী তার কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ যে মৃত্যু বরণ করেছে, তার অভিঘাত তুলনায় নিষ্প্রভ। প্রসঙ্গত, লক্ষণীয়, হাসানের মৃত্যুদৃশ্য চিত্রিত করার পর শিল্পী মীরও যেন কল্পনাহীন হয়ে পড়েন। উপন্যাসের পরবর্তী সুদীর্ঘ অংশ প্রচলিত কারবালা কাহিনীর বিভিন্ন লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার আবেগপূর্ণ পুনর্বর্ণনা মাত্র। উপন্যাসোচিত চরিত্রসৃষ্টি বা জীবনের নবমূল্যায়নের প্রয়াস হিসাবে আদৌ কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

৫.৩. কায়কোবাদ মীর মশাররফ হোসেনের হাতে কারবালা-কাহিনীর ধর্মাদর্শের বিপর্যয় লক্ষ্য করে দুঃখিত হন, ঐতিহাসিক মহামানবদের চরিত্র কল্পনানুযায়ী পুনর্সৃষ্টি করার জন্য আক্ষেপ করেন। একজন সহশিল্পীর এই অপরাধ-অপনোদনের জন্য 'মহররম শরীফ' মহাকাব্য রচনা করেন এবং তার মধ্যে নিজের ধর্মীয় চেতনার পরিমাপ অনুযায়ী নানাপ্রকার উচ্চ চিন্তার স্থান দেন। এরূপ সদুদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও কায়কোবাদের কাব্যের মান উন্নত হতে পারেনি, চিন্তার উচ্চতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জীবনের গভীরতর সত্যের যে আস্বাদন 'বিষাদ-সিন্ধু'র অধর্মীয় অনৈতিহাসিকতার মধ্যে লভ্য, 'মহররম শরীফ' কাব্যের অকারণ ইতিহাসনিষ্ঠা ও অকিঞ্চিৎকর দার্শনিকতার মধ্যে তা অনুপস্থিত।

উদাসীন পথিকের মনের কথা

১.১. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দুই পৃথক দুনিয়ার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এক এলাকা ঘরের এবং পরিবারের, অন্য এলাকা বাইরের এবং পরিবেশের। এক জগতের কথা কিছুদূর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে লেখক অন্য জগতের কথার অবতারণা করেন। কাহিনীর দুই ধারা কখনও পর পর কখনও পাশাপাশি এগিয়ে চলে। উভয় ধারার মধ্যেই আবার একাধিক স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ বিদ্যমান। একশত আটানব্বই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থের রচনা-রীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে গ্রন্থকার নানা প্রকার মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনাবলীকে একটি কাহিনীর অঙ্গে পরিণত করে সুকৌশলে গেঁথে তুলেছেন। উপন্যাস এ রকম না হয়ে উপায় নেই, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক কাহিনীর মধ্যে এত বিভিন্নমুখী ঘটনাকে স্থান দেওয়া এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান করা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়। অবশ্য এই চেষ্টা রচনাকে আত্মজীবনীর নিজস্ব এলাকার একনিষ্ঠ বাস্তবতা থেকে ক্রমাগত উপন্যাসের অতিমুক্ত কাল্পনিকতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। তাতে কিছু ক্ষতিও হয়েছে। সত্যকথন অবিমিশ্র না হওয়ায় আত্মজীবনী হিসেবে এর মূল্য কমেছে, কল্পনা অবাধ হতে না পারায় এর গল্পরসে ঘাটতি পড়েছে। গ্রন্থকার নিজে যে আশঙ্কা অনুভব করেন, তার স্বরূপ আলাদা। তিনি ভেবেছিলেন যে, একাধিক প্রসঙ্গের সম্মিলিত অবতারণার ফলে হয়তো কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও বোধগম্যতা ব্যাহত হয়ে থাকবে। পঞ্চদশ তরঙ্গে গ্রন্থকারের নিবেদন হোলো :

> পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বান্ধুনী, মিলগরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই।...যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন।

এই অনুরোধের আবশ্যকতা ছিল না। কারণ, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' মূলতঃ সহজ ও সরল গল্প, কাহিনীর বুনটের মধ্যে জটিলতা কিম্বা গভীরতার বিশেষ প্রশ্রয় নেই।

১.২. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র একদিকে রয়েছে নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেব টি. আই. কেনি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী জমিদার প্যারী সুন্দরী ও ভৈরব বাবু এবং নিপীড়িত চাষী। বইয়ের এই অংশের তারিফ সবচেয়ে বেশী শোনা যায়। শোষিত জনগণের জন্য লেখক যে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, উৎপীড়িতের বিদ্রোহকে তিনি যে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন, অনেক আধুনিক পাঠক তা আবিষ্কার করে মুগ্ধ। উৎসাহের আতিশয্যে কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' নয়, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' নয়, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'ই হোলো মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আমাদের মতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদপূর্ণ। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু'। অর্ধশত বৎসর ধরে শত সহস্র সাধারণ পাঠক যে সত্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত করেছে, জবরদস্তি তা অগ্রাহ্য করার মধ্যে কোন রকম গবেষণামূলক গৌরব লুক্কায়িত থাকতে পারে, মনে করি না।

মীর-মানসের গণ-দরদী জীবনদৃষ্টির যে প্রশস্তি গতানুগতিক সমালোচনায় লক্ষ্য করি, তার মধ্যেও অনেক ফাঁকি রয়েছে। মীরের সমগ্র রচনাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়লে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করতাম যে, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে রোষ ও শোষিতের জন্য বেদনাবোধ মীর মশাররফ হোসেনের চিত্তে যত তীব্র তীক্ষ্ণ আকারই ধারণ করুক না কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং বিলাতী সাহেব ও শাসনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা। এক তরফা বন্দনায় না যেতে, সমাজ-সচেতন শিল্পীর এই দ্বিমুখী মনোভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা বেশী জরুরী কর্ম। পথিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব দিবালোকের মতো স্বচ্ছ। 'উদাসীনে'র সপ্তবিংশতি তরঙ্গে নীলকরের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতাকে অভিবাদন জানিয়েও লেখক হুঁশিয়ারীর সংগে উভয় কূল রক্ষা কোরে আনন্দ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

> হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায় এবং পেট্রিয়টের সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীল-করের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে।... ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ দান করিয়া তরজমাকারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে পূর্ণ কলেবরে পূর্ণচন্দ্ররূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এ প্রকার আর্তনাদে বংগেশ্বরের আসন পর্যন্ত টলিয়াছে। মহামতী লাটবাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সোনামুখী আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।

'উদাসীনে'র নীলকর সাহেব টি আই কেনী মহা পাপিষ্ঠরূপে চিত্রিত হয় নি। কখনও কখনও সেরূপ বিশেষণে ভূষিত হলেও নৃশংস আচরণের দ্বারা সে আমাদের ঘৃণা অর্জন করে না। যেটুকু করে, তাও প্রজাপীড়ক হিসাবে নয়, নুক্কহস্ত লম্পট হিসাবে। তার ঘোড়াদৌড়ান ও শিকারের মধ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী জমিদারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে, অর্থ পুরস্কার দ্বারা গাড়োয়ানকে প্রলুব্ধ করে তার সুন্দরী স্ত্রীকে পোষ মানাতে সমর্থ হওয়ার মধ্যে যে শক্তি, দম্ভ ও দক্ষতার প্রকাশ রয়েছে, তা তাকে, দুর্বৃত্ত নয়, এক প্রকার নায়কে পরিণত করে। কেনী উড-রোগের দোসর নয়, সে জবরানে ধরে এনে চাষিবৌ ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় না। কেনী ময়না পোষ মানাতে জানে। পথিক উড-রোগের যেমন সাক্ষাৎ লাভ করেন নি, তেমনি তোরাপকেও চোখে দেখেন নি। কেনীর বিপক্ষ শক্তির মধ্যেও যাঁরা প্রধান তাঁদের মধ্যেও কেউ বিন্দুমাধব নবীন-মাধবের মতো সর্বস্বত্যাগী আদর্শবাদী কিম্বা তোরাপের মতো শক্তিমান পুরুষ নয়। 'উদাসীন পথিকে' অত্যাচারী কেনী সাহসী এবং বুদ্ধিমান; তাঁর পত্নী সুন্দরী, স্বদেশানুরাগী এবং বুদ্ধিমতী; তাঁর দক্ষিণ হস্ত সাঁড়াশি মীর সাহেব ঘোর আমুদে। কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়েছেন, তাঁরা কেনীর

সমকক্ষ মাত্র, যেমন প্যারী সুন্দরী এবং ভৈরব বাবু। কৃষক নেতা সাগোলামও পারিবারিক জীবনে শ্বশুরের সম্পত্তি আত্মসাৎকারী; কেনীর কুঠি-আক্রমণ-কারী লেঠেলরা অর্থলোলুপ। যদিও কৃষক সন্তানের দুঃখ-দুর্দশার অনেক কথাই বইয়ে স্থান পেয়েছে, তবু সমগ্র গ্রন্থের আবেদন পরীক্ষা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই জীবনপথিক নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রায়তন লাভক্ষতির বাইরে অবস্থিত দেশ বা জাতির বড় বড় সংগ্রাম ও সমস্যা সম্পর্কে অন্তরে উদাসীন ও নির্বিকার ছিলেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' পাঠ করে জনৈক সমালোচক আত্মহারা হয়ে ঘোষণা করেন যে, এই শিল্পী ছিলেন সত্যপ্রকাশে নির্ভীক, অত্যাচারীর প্রতি নির্মম এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমতাশীল। গ্রন্থের কোনো তরঙ্গই এই উচ্ছ্বাসের প্রমাণ বহন করে না। বরঞ্চ বলা চলে যে, শিল্পীর মানসদ্বন্দ্ব অত্যাচারীর প্রতি নির্মম হতে তাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে, একাধিক ব্যক্তিগত কারণে তাঁর গ্রন্থে সত্যের প্রকাশ অনেক স্থলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। মীরের নীলচাষী-দের মধ্যে একজন তোরাপও যে জন্ম নিতে পারল না, তার কারণ হোলো নির্যাতিত সাধারণ মানুষের প্রতি পথিকের স্বভাবজ ঔদাসীন্য। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এসব চিন্তার সূত্রনির্দেশক দৃষ্টান্তসমূহ ক্রমশঃ উপস্থিত করতে থাকব। আপাততঃ শুধু 'আমার জীবনী'তে (১৩১৫) 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এবং "দীনবন্ধু দীনবন্ধু" সম্পর্কে গ্রন্থকার যে সকল ধারণাদি ব্যক্ত করেছেন, তার একটি নজীর উদ্ধৃত করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। 'আমার জীবনী'তে বলা হয়েছে:

দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়াছেন। পরিণাম ফল...(নীল বিদ্রোহ)...নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিশরাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোনো পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব

> আছে, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও যে ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দুশ' বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দীনবন্ধুর প্রেতআত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহার নাম পাতফোঁড়—যে পাতে খান সে পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।
> ('আমার জীবনী' পৃ. ১২২)

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় কুঠিয়াল সাহেব কর্তৃক প্রজা-নিপীড়নের এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জনসাধারণের ফরিয়াদের যে চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটেনি। অনেক সমালোচক এইসব স্থূল ঘটনাদির ঐতিহাসিকতা বিস্তৃত প্রমাণ-সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। কারণ এই বইয়ে বর্ণিত বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটে তাঁর জন্মের পূর্বে। মীর মশাররফ হোসেন সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। উদাসীন পথিক পুরাতন প্রসঙ্গ কতটা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। তবে সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশের পর, ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্র। সে হিসেবে অবশিষ্ট পঁয়ষটি পৃষ্ঠায় আছে পথিকের ভূমিষ্ঠ হবার পরের প্রথম বারো চৌদ্দ বছরের পথ চলার কাহিনী। পথিকের নিজের জবানীতে:

> মনের কথা তায় আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোট বেলায়। অসংলগ্ন, ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। (পৃ. ৭৪)

'আমার জীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, পূজনীয়া জননী নীল বিদ্রোহের পরেই পীড়িত হন। বৎসর কাল যন্ত্রণা ভোগ করে দেহত্যাগ করেন। তখন, মীর মশাররফ হোসেনের বয়স চৌদ্দ, মহতেসামের

চার, বজলাল হোসেনের দেড়। উদাসীন পথিকের মনের কথা প্রকাশিত হয় এই ঘটনার আরও বিশ বছর পর। স্বভাবতই তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে পথিক যখন তাঁর জন্মের আগের এবং অব্যবহিত পরের কয়েক বছরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে বসলেন, তখন মনের কথামত না চলে উপায় কি। এ সাধ্যমত মনগড়া কথা যে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেটাই মস্ত বড় কৃতিত্বের কথা। এ সব সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মীর-পরিবারের অন্দরমহলের এবং মীরের অন্তর্জীবনের সংবাদ, কেনীর জুলুম বা প্রজার প্রতিবাদের বিবরণ নয়।

২.১. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনীর দ্বিতীয় স্তর আত্মজীবনী-মূলক। আমাদের মতে গ্রন্থের এই অংশই বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক স্থলে সামান্য বিবরণও পথিকের মনের গোপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার আবরণে বিজড়িত হয়ে প্রকারান্তরে শিল্পীর গহন মানসের উন্মোচনকেই সরস করে তুলেছে। মনের কথার আসল সংবাদ এখানেই প্রাপনীয়। মীর-মানসের শংকা ও সংকোচ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, গর্ব ও লজ্জা, তাঁর জীবনের ঐশ্বর্য ও অভাব, ঔদার্য ও সংকীর্ণতা, ঔদাসীন্য ও উৎকণ্ঠা, একান্তভাবে নিজের পরিবার ও পরিবেশে কি ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে বা অবদমিত হয়ে গুমরে মরেছে, তার এক জীবন্ত দলিল 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। যে সকল কথা আপাতদৃষ্টিতে ঘরের নয় বাইরের, মনের নয় ঘটনার, সেখানেও পথি-কের অন্তরঙ্গ ভাবনা ও আত্মগত বিচার বিবরণকে নৈর্ব্যক্তিক হতে দেয়নি।

২.২. 'আমার জীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায়, নিজের যে দু'জন নিকট আত্মীয় নীল বিদ্রোহী প্রজার দলে মিশেছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। একজন হলেন মীর মহেব আলি। ইনি মীর মশাররফ হোসেনের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্যজন সাগোলামাজ্জম, পিতৃব্যকন্যা শুকরণনেসার স্বামী। ফরিদপুরের গট্টির পীর বংশের সন্তান। জোলফেকার আলীর মৃত্যুর পর শুকরণনেসা পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের গৃহে কন্যাস্নেহে লালিত-পালিত হয়। উদাসীন পথিক, পিতা সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনকে বরাবর সাঁওতার মীর সাহেব বলে উল্লেখ

করেছেন। সাগোলামাজ্জম শুকরণনেসাকে গ্রহণ করে চাচাশ্বশুরের বাড়ীতেই ঘরজামাইরূপে বসবাস করতে থাকে। পথিকের মতে, ক্রমে চাচাশ্বশুরের সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। সে ঘটনা ঘটে অনেক দিন আগে। মীর মশাররফ হোসেনের তখনও জন্ম হয় নি, এমন কি, তাঁর পিতামাতার বিবাহ তখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু পথিক সাধারণ-ভাবে উদাসীন হলেও অবস্থাপন্ন গ্রাম্য পরিবারের পুরুষ হিসাবে জমি-জমার শরিকী স্বত্বের প্রশ্নে অতি সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তা সে কাসুন্দি যত পুরাতনই হোক না কেন। এই উত্তেজনা মীর-মানসের নানাবিধ দ্বন্দ্বের আদি কারণ। এটা সমাজ-সচেতনতার নামান্তর নয়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজাপীড়নের মর্মন্তুদ চিত্র রচনা করা হয়তো গ্রন্থকারের মুখ্য অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু পিতৃশক্র সাগোলামাজ্জম উৎপীড়িতের নেতৃত্ব করেছিলেন, এইরকম লোকপ্রসিদ্ধি থাকায় লেখক উভয় সংকটে পড়েন। কেনী লেখকের আদর্শের প্রতিপক্ষ, কিন্তু সাগোলামাজ্জম ঘরের দুষমন। পথিকের মনের কথা গোপন থাকে নি। পিতৃস্বার্থের পরিপোষক শ্বেতচর্ম কেনীকে তবু সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু জন-সেবক হলেও যে সাগোলামাজ্জম সম্পত্তি দখলের প্রতিযোগিতায় পিতাকে পরাজিত করেছে, পুত্র পথিক তাকে বরদাস্ত করতে পারে না। লেখক শুধু গোলামাজ্জমকে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, মনের উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য সমগ্র জামাই জাতির প্রকৃতি বিচার করে ছেড়েছেন :

> এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাঁটি হবে না।...জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা, এবং ব্যবহারের বাকল। হাজার ঘষ মাজ, মিশিবার নহে। মিশিবে না। মূল কথা জামাই জাতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি জামাই।...জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বশে থাকিবার নয়।

২.৩. ঘটনা তো বটেই, মনও মনের কথাকে অকপট হতে পদে পদে বাধা দেয়। অনেক বাধার প্রতি পথিক উদাসীন থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা

করেছেন, পারেন নি। কিছু কথা বলতে চান নি, কিন্তু বলে ফেলেছেন ; কোনো কোনো কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু বলতে পারেন নি। যেমন, পিতা-প্রসঙ্গে। সন্তান হিসেবে পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পথিক বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিজের পিতাকে কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়? সমাজের সামনে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পিতৃনামও শ্রীমণ্ডিত করে প্রচার করা আবশ্যক। মীরের সে কাণ্ডজ্ঞান ছিল। পিতা যে সুপুরুষ ছিলেন, বিখ্যাত বংশে জন্মেছিলেন, এসব কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন পিতার স্বভাবের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল দিক বর্ণনা করা নিয়ে। গ্রাম্য আভিজাত্যের কর্মক্ষম উত্তরাধিকারীরূপে পিতা গান-বাজনা ও মদ-মেয়েলোক সম্পর্কে অত্যধিক পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন। পিতার এই পারদর্শিতায় পথিক একই সঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত। সাঁওতার মীর সাহেব ঘোর আমুদে ছিলেন, এর চেয়ে কঠিন কথা উদাসীন পথিকের মনে আসে নি।

> মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি, এবং ঘোর আমোদী।

প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর পিতা কিয়ৎ পরিমাণে সংসারবিরাগী হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন। এও এক প্রকার উদাসীন হওয়া। কিন্তু তাই বলে জগতের সব ব্যাপার সম্পর্কেই যে উদাসীন হয়ে পড়েন, তা নয়। অন্দর ত্যাগ করে সদরেই পড়ে থাকেন, 'আমোদের অঙ্গ কিছু বেশী করিয়াছিলেন'।

> মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে, দেশীয় নর্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।
>
> (পৃ. ২৯)

দেবীপ্রসাদ দ্বিতীয় বিবাহের ঘটকালী করতে এসেছিল। সাঁওতার মীর সাহেব তার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তার মধ্যে পথিক ও পথিকের পিতা, উভয়ের স্বভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। উভয়ের বলবার

এই জন্যে যে, দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে যে সারসত্য পিতার জবানীতে প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে তা উদাসীন পথিকের দ্বারাই উদ্ভাবিত। সাঁওতার মীর সাহেব বলেন:

> আবার!! জেনেশুনে, ভুগে, আবার!! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্তভোগীর নিকট অন্যপ্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব? আমি স্ত্রী-পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ-দুঃখ ভালভাবে ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয়-সম্পত্তির সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহলাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে, শরীরের অবস্থার সঙ্গে—সংসারীর অনেক কার্য্যের যোগ আছে। ·· বয়সে কিছু করুক না করুক আমি আর এ ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে।
>
> (পৃ. ৪৪)

পিতার সঙ্গে কেনীর আঁতাতকে পথিক নানা সময়ে নানা ভাবে দেখেছেন। এই সম্পর্ক অনুমোদন করতে গিয়ে বাস্তব অবস্থার অনেক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পূর্ণ নতুন পূর্বপট কল্পনা করে প্যারী সুন্দরীকে দিয়ে বলিয়েছেন:

> এই কুঠিরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীর সাহেব কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ সেই মীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এ দেশে সাধারণের মনে সে কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ...বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ার কুঠির একজন কুঠিয়াল সাহেবকে ধরিয়া দিনে দুপুরে তাহার একটি কান কাটিয়া লইয়াছিলেন।
>
> (পৃ. ১৯-২০
>
> কেনীর দৌরাত্ম্যে টিকিতে না পারিয়া এ দেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্যসত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও কোরো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পারিয়া... অপমানের ভয়, প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয় ভাবিয়া। (পৃ. ৪১)

মীর সাহেব নিজেও, পথিকের মতে, মনে মনে প্যারীসুন্দরীকে শ্রদ্ধা করেন এবং নিজের সম্পর্কেও বিশ্বাস করেন যে, 'কি করিবেন, দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।' (পৃ. ১৬)। পিতার দায় কত গুরুতর ছিল, তার স্পষ্টতর ধারণা, ইচ্ছে থাকলেও, পথিক পরিবেশন করতে পারেন নি। মনের কথাটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

২.৪. মীর-মানসের সংকট গভীরতর আবর্ত রচনা করেছে মাতা-প্রসঙ্গে। সাঁওতার মীর সাহেব বোনের বাসায় কয়েক মাস কাটিয়ে, বোনের বিষয়াদি সুশৃঙ্খল করে দিয়ে বাড়ী ফেরা মনস্থ করেছেন। নৌকায় সিরাজগঞ্জ অঞ্চল থেকে রওনা হন। লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছেড়ে সাঁওতার ঘাটের নিকট-বর্তী হয়ে দেখেন ঘাটে বহু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরা সব সাগোলা-মাজ্জমের লোক। জামাই চাচা-শ্বশুরকে ঘাটে নাবতে দিল না। পৈতৃক বাটী ও জমীদারী, সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে সাঁওতার মীর সাহেবকে সম্পূর্ণ বেদখল করা হলো। 'তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার চাঁদ জামাই, তরবারী হস্তে আজ গৌরী গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া সুস্থির হইলেন।' (পৃ. ১৩৩) এর অল্প পরেই মীর সাহেব দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। পিতার এই বিবাহ সম্পর্কে গ্রন্থকার কোন বিস্তৃত বর্ণনা দেন নি। যে কয়েকটি ছত্রে এই আকস্মিক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তার সকল বাক্য সমপরিমাণে সপ্রকাশ নয়। হয়তো ঘোর সংসারীর মতো, উদাসীন পথিকের মনের কথাগুলি সর্বত্র প্রকাশ্য নয়! পথিক বলেছেন, সাগোলামাজ্জম কর্তৃক গৃহচ্যুত হবার পর পিতা 'প্রায় ছ'মাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতননেসাকে বিবাহ করলেন। আবার সংসারী হইলেন।' এই দৌলতননেসাই উদাসীন পথিক বা আমাদের মীরের মাতা। গ্রন্থের ষড়বিংশ তরঙ্গ, ত্রয়োত্রিংশ তরঙ্গ এবং পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গে মাতার জীবনচিত্র রচনাই পথিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থের শেষ আট পৃষ্ঠা আমরা পড়তে পারি নি।

মাননীয়া দৌলতননেসা সম্পর্কে লেখক স্বীকার করেন যে, 'সে রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য।' তবু যতটুকু সাধ্য ছিল, করেছেন। ধন-দৌলত ও রূপের চেয়ে দৌলতননেসার চিত্ত ও চরিত্রের বৈভব অধিকতর স্মরণীয়। তাঁর মত সৌভাগ্যবতী রমণী অতীতের ইতিহাসে, এমন কি সাহিত্যেও জন্মগ্রহণ করে নি। প্রভু মহম্মদের কন্যা, হাসান হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা, মহা পবিত্রা এবং পুণ্যবতী। ইসলাম জগতে রমণী-কুলের সর্বশ্রেষ্ঠা। সেই হিসাবে দৌলতননেসা তাঁর কিঙ্করীর কিঙ্করী। কিন্তু বিবি ফাতেমা পর্যন্ত কখনও কখনও সপত্নীবাদের ঈর্ষায় বিবি হানুফার নামে জ্বলে উঠতেন। পথিকের মতে দৌলতননেসার শরীরে 'সে মহা-যাতনাসম্ভূত মহাবিষ' প্রবেশ করতে পারে নি। 'বদরুল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য' বিবি আয়েসা সিদ্দিকার মতো 'পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্র হইতে হইয়াছিল'। কিন্তু 'পথিকের পূজনীয়া দেবী এক মুহূর্তের জন্য শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই।' 'রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা' 'কয়েক স্বামীর পর' 'প্রভু মহম্মদকে' 'পতিত্বে বরণ করেন'। 'পথিকের পূজনীয়া দেবী এক স্বামীর পদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।' ক্রমে পথিক মিশরের জুলেখা, ভারতরমণী নূরজাহান এবং বঙ্কিমের আয়েসার সংগে দৌলতননেসার তুলনা করে পূজনীয়া জননী-কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। 'কাজেই শেষ কথা, দৌলতননেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী'। মীর সাহেবের এই মাতৃ-বন্দনায় নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাস কখনও সংবরণ করতে চেষ্টা করেন নি। জীবনে নয়, পুঁথির তুলনা-নির্বাচন প্রণালীর অতিরঞ্জনকে অনুসরণ করে নিজের অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুযায়ী ক্রমাগত উপমা অনুসন্ধানে রত হয়েছেন। মনের কথার চেয়ে তাতে মনোবাঞ্ছাই বেশী প্রকাশিত। বর্ণনাত্মক রচনায় প্রত্যাশিত সত্য সমাচার লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও আকাঙ্খায় পরিমণ্ডিত হয়ে এক প্রকার ভাবাত্মক আত্মকথায় পর্যবসিত হয়েছে।

নারীজীবনের যে তিন সৌভাগ্য মীর-মানসে সর্বপ্রধান বলে স্বীকৃত ছিল, সে হল, আজীবন চিরসতী থাকা, সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্বামী সোহাগিনী হতে পারা এবং কখনও সপত্নীবাদের দ্বেষে পীড়িত না হওয়া। বিবি কুলসুমকেও মীর সাহেব এইসব গুণে ভূষিত করেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সপত্নীদের মর্মান্তিক ক্রিয়াকাণ্ড কেবল শিল্পীর কল্পনাবলে সৃষ্ট হয় নি, মীরের শৈশবের স্মৃতি ও যৌবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেও সে হলাহলের অস্তিত্ব ছিল। এই বিশেষ সত্য 'বিষাদ-সিন্ধু'তে যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে, একটা অপ্রতিরোধনীয় ট্রাজেডী মূল মানবীয় কারণরূপে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। বহুপত্নী গ্রহণের জন্য পতি নিন্দিত হন নি এবং পতিহন্ত্রী পত্নীও পাপীয়সীরূপে চিত্রিত হন নি। মনুষ্য-হৃদয়ের সামান্য বিকার পরিবেশের প্রতিকূল তাড়নায় কি ভয়ানক ক্রূরশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, জায়েদা তার শোকাবহ প্রতিমূর্তি। 'বিবি কুলসুম' লেখকের নিজের দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সেখানে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা অক্ষুণ্ন রাখা সাধ্যাতীত ছিল। দ্বিতীয় পত্নীর প্রেমানুগত্য স্বীকার করে নিয়ে প্রথমার নির্মম সমালোচনা করেছেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় পিতামাতার দাম্পত্য জীবনের সকল সত্য প্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে লেখক বার বার দ্বিধা ও সংকোচ অনুভব করেছেন। পানাসক্তি ও রমণীপ্রীতিকে পথিক হয়তো পাপাচার বা অস্বাভাবিক আচরণ বলে বেশী নিন্দা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্ততঃ পিতা ও নিজের চরিত্রকে অনেকটা এই আলোকেই তিনি বিচার করে অভ্যস্ত। পত্নী কুলসুম কিন্তু স্বামীর এই পর্যায়ের উদাসীনতাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন নি। পরিণত বয়সেও কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে চেলা কাঠ দিয়ে প্রহার করবার জন্য গৃহের দাসীকে তাড়া করেছিলেন। উদাসীন পথিক একবার ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে হয়তো মাতা অধিকতর উদারস্বভাব ও সহ্যশীলা ছিলেন। কল্পনা করেছেন:

দৌলতননেছা নিজ গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ-আহ্লাদেই আছেন। দৌলতন-

নেসার কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠে মধুর ধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুরের ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই হাসি মুখে মধুমাখা হাসি হাসি কথা।

পাড়াপ্রতিবাসীরা সময় সময় অনেক কথা বলিত।...দৌলতননেসা হাসিয়া বলিতেন...ও গান বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কোন কারণ নাই, থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন।

পথিকের মনে অন্য কথাও ছিল। জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতা এত সরল প্রশস্তির প্রতি তাঁকে বেশীক্ষণ আস্থাবান রাখতে পারে নি। পিতৃচরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এ আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করে মীর সাহেব 'আমার জীবনী'তে মাতার মৃত্যুকালীন দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, 'উদাসীন পথিকে'র বিবরণের সঙ্গে তার অনেক অমিল। 'আমার জীবনী'তে আছে যে মাতা মৃত্যুর মুহূর্তেও পিতার মুখ দর্শন করেন নি:

মাতার মৃত্যুদিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।...পিতা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন।—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই। অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি!...তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই, আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে...আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে...মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও—জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।...পিতা নীরবে দুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন। চক্ষে জলধারা।

(পৃ. ১৩৫—১৪৫)

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে চেয়েছি। সমকালীন সমাজে শাসক-শোষিতের সম্পর্ক কি ছিল,

তার এক বিশেষ এলাকার চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উদ্‌ঘাটন করা পথিকের একটি উদ্দেশ্য হলেও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র অপেক্ষাকৃত অধিক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ মীর মশাররফ হোসেনের নিজের শৈশব ও পিতামাতার পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ বর্ণনা। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গ্রন্থের এই দ্বিতীয় দিক বিশ্লেষণ করে মীর-মানসের পূর্ণতর প্রতিকৃতি রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। পরিশিষ্টে, অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র মাতা-প্রসঙ্গ থেকে কয়েকটি বিস্তৃত অংশ মুদ্রিত হল।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

১.০. সম্প্রতি মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, ভূমিকা লেখক অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মূল গ্রন্থ, সম্পাদকের কর্মপন্থা এবং ভূমিকা-লেখকের মতামতের পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হব।

১.১. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা চারখানি। প্রকাশ কাল নয়, বর্ণিত বিষয়ের ক্রমানুসারে এগুলো হলো 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' এবং 'বিবি কুলসুম'। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় রয়েছে শৈশবের কথা, নিজের পিতামাতার জীবনের বৃত্তান্ত, নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী। ঘটনাকাল ১৮৬০-এর কিছু আগে ও পরে। 'আমার জীবনী'তে বাল্যকাল ও কৈশোরের বর্ণনা। কালগত সীমানা ১৮৬৫ অর্থাৎ মীরের প্রথম বিবাহ পর্যন্ত। 'গাজী মিয়াঁ'তে রয়েছে মীরের পরিণত বয়সের কর্মজীবনের বিবরণ। দ্বিতীয় পত্নীর তৃতীয় সন্তানসহ সপরিবারে বাংলা ১২৯১ সালে তিনি দেলদুয়ার আসেন। সম্ভবত দশম সন্তান জন্মের পর ১৩০১ সালে দেলদুয়ার ত্যাগ করেন; অর্থাৎ আনুমানিক ইংরেজী ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত এই দশ বছরের ঘটনাবলী এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বিবি কুলসুম' মীরের সম্পূর্ণ দাম্পত্যজীবনের বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ। কুলসুম বিবির বিয়ে হয় ইংরেজী ১৮৭৩-এ, ১৯১০-এ মৃত্যু। 'বিবি কুলসুম'-এর রচনাকাল ১৯১০।

১.২. 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' স্বজীবনীমূলক রচনা হলেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনা, 'পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট মীর-মানসের এক প্রতিশোধাত্মক দপ্তর।' বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে রসাল ও শিহরণমূলক করে তোলার জন্য লেখক সর্বপ্রকার অতিরঞ্জনের সাহায্য নিয়েছেন। নিজের নিরাপত্তার জন্য, কাহিনীর আবেদনকে ব্যাপকতা দান করবার উদ্দেশ্যে

এবং কোন কোন চরিত্রের চোখে ধুলো দেবার মতলবেও লেখক এই বইয়ের বর্ণিত স্থান ও পাত্রপাত্রীদের জন্য দেদার ছদ্মনাম উদ্ভাবন করেছেন।

২.O. জমঘারের তিন মহিলা জমিদার। সোনা বিবি, বেগম ঠাকরুণ ও মনি বিবি। সোনা বিবি ও বেগম ঠাকরুণ পরস্পরের জা। জায়ে জায়ে সম্পর্ক ভাল নয়। মনি বিবি হলেন উভয়ের ননদ। ননদ মনি বিবির সঙ্গে ভাবী বেগম ঠাকুরণের অসদ্ভাব নেই; কিন্তু অন্য ভাবী সোনা বিবির সঙ্গে চরম শত্রুতা। ভাবী-ননদ সম্পর্ক ছাড়াও সোনা বিবি মনি বিবিতে আরো একাধিক আত্মীয়তা। উভয়ে উভয়ের খালাতো বোন এবং বিয়ে করেছেন পরস্পরের আপন ভাইকে। তার ওপর সোনা বিবির ছেলের বিয়ে হয়েছে মনি বিবির মেয়ের সাথে। যত নিকট হয়েছেন তত বেশী একে অন্যকে হিংসা করেছেন, ঘৃণা করেছেন। পরস্পরের চরম অনিষ্ট সাধনের জন্য হীন হিংস্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। একটার পর একটা সর্বক্ষয়ী মামলা-মোকদ্দমা খাড়া করেছেন। অবশেষে উভয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। মনি বিবি কুষ্ঠরোগে মারা যান, সোনা বিবি কিছু বেচে দিয়ে মক্কা শরীফ চলে গেলেন। শরীকে শরীকে এই ভয়াবহ আত্মক্ষয়ী লড়াইয়ের ফলে যাঁরা লাভবান হলেন তাঁরা হলেন উভয় তরফের হিন্দুকর্মচারীরা।

২.১. এই তিন মহিলা জমিদারের মধ্যে বেগম ঠাকরুণ কিছু লেখাপড়া জানেন, দেশবিদেশ ঘুরেছেন, পর্দানশীন নন এবং মফঃস্বল শহর অরাজকপুরের উকিল, মুন্সেফ, ডাক্তার, ডিপুটি-হাকিমানদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সামাজিকতা রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত। বেগম ঠাকরুণের দুই ভাই হটুনটুও ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত ও উচ্চশিক্ষিত। তাঁরাই বোনকে স্বাধীনা রমণীরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। বেগম ঠাকরুণ বিধবা যুবতী। দুই সন্তানের মা। ছেলেদের নাম কার্ত্তিক ও গনেশ। উপন্যাসে বেগম ঠাকরুণের এক নাম পয়জারননেসা। প্রথম দিকে পয়জারননেসাকে শুধু বেগম সাহেবও বলা হয়েছে। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে ১৮৩ পৃষ্ঠায় লেখক নতুন নামকরণ করলেন বেগম ঠাকরুণ।

একাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ বেগম ঠাকরুণে বিশেষ বাধ্য। যেমন হাকিম ভোলানাথ, ঋতুরাজ বকেশ্বর, কোর্ট বাবু, জেলখানার ডাক্তার ইত্যাদি।

বেগম সাহেবের একজন প্রিয় মিত্র ছিলেন বড় উকিল রাজরাজেশ্বর বাবু। ইনি 'কাঙ্গালী আদমী কা দোস্ত'—এঁরই অন্য নাম 'আকালের বঁধু'। বেগম সাহেবের পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যিনি বর্তমানে বেগম ঠাকরুণকে ত্যাগ করে চলে গেছেন তিনি হলেন 'শিকলিকাটা টিয়ে'। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং শিমলা নিবাসী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দাড়ি ঘন।

বেগম ঠাকরুণ যাঁকে সবচেয়ে বেশী ভয় পান ও যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর মনের আক্রোশ সবচেয়ে বেশী সে হল ভেড়াকান্ত ওরফে গাজী মিয়াঁ। ঠাকরুণের 'বিশেষ উপরোধ, হাত ধরিয়া প্রাণের সহিত অনুরোধ—সেই ভেড়াটার পায়ে বেড়ী, কোমরে দড়ী দিয়ে খুব টানা।' (পৃ. ১১১)। 'কত টাকা খরচ করেছে। আশা ত তার ঐ। যাতে ভেড়া খোঁয়াড়ে পড়ে, যাতে ভেড়ার ডাক বন্ধ হয়, মুখ বন্ধ হয়, তার পরিবার-পরিজনের আর্তনাদ, হৃদয়ভেদী ক্রন্দনস্বর তাঁর কানে যায়—এই ত তার আশা।' (পৃ. ঐ)। বেগম ঠাকরুণ অনেকখানি কামিয়াবও হয়েছিলেন। ভেড়াকে অল্প কয়েকদিনের জন্য হলেও জেল হাজতে কয়েদীর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছিলেন। ভেড়াকান্ত ওরফে গাজী মিয়াঁ এই পরাজয় ও অপমানের গ্লানি সহজে ভুলতে পারেন নি। 'বস্তানী' লিখে তার শোধ তুলতে চেয়েছেন। যে নিষ্ফল রোষাগ্নি অন্তরে অবরুদ্ধ থেকে চরম দাহ ও জ্বালা সৃষ্টি করছিল, এই রচনার প্রবল ও উৎকট রসপ্রস্রবণের ধারায় তা যেন মুক্তি পেল, নিষ্কাশিত হল।

২.২. ভেড়াকান্ত সোনা বিবির পক্ষের লোক। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী, সাহায্যকারী ও অন্যতম পরামর্শদাতা। সোনা বিবিও বিধবা। একমাত্র পুত্র জয়ঢাক এখনও আইনের চোখে নাবালক। মনি বিবির কন্যা ছিঁড়িয়া খাতুনের সঙ্গে তিনি ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন এই আশায় যে, সে মায়ের পক্ষ নিয়ে শ্বাশুড়ীকে জব্দ করতে সাহায্য করবে, সোনা বিবির অধিকার বৃহত্তম সম্পত্তির ওপর বিস্তারলাভ করবার সুযোগ পাবে। সে আশা সফল

হয় নি। বরঞ্চ ছিঁড়িয়া খাতুনই জয়ঢাককে সম্পূর্ণ পদানত করে সোনা বিবির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। শ্বাশুড়ীর প্ররোচনায় ও বৌয়ের নির্দেশে জয়ঢাক নিজের মায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে ইতস্তত: করেনি।

২.৩. সোনা বিবির বিশ্বস্ত কর্মচারী হল মোক্তার ধিনতাধিনা, ধামাধরা সরকার, বেআক্কেল, তেনাচোরা, আরশূলা, ধড়িবাজ, চোট্টা মিয়াঁ ইত্যাদি। সোনা বিবির আসল খুঁটি দুধভাই দাগাদারী। গ্রাম্য নাগর, কবি ও লেখক দাগাদারী বিলাসী ও সৌখীন পুরুষ। যে পরিমাণে তিনি সোনা বিবির আস্থা ও সান্নিধ্য ভোগ করে থাকেন, তা নিরপেক্ষ গ্রামবাসীর কাছে কখনই কলুষতামুক্ত বলে মনে হয় নি। শত্রুপক্ষ স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে নানা ইঙ্গিত-পূর্ণরূপে জয়ঢাকের কাছে উত্থাপন করে মায়ের বিরুদ্ধে ছেলের মনকে বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। সোনা বিবি কিন্তু শত রকম বিপদে পড়েও দাগাদারীকে হারাতে রাজী হন নি; এমন কি, যখন টের পেলেন যে, সোনা বিবির দুর্দিনে দাগাদারী রাতবিরাতে গোপনে বেগম ঠাকরুণের সঙ্গে তার পুরোনো অন্তরঙ্গতা ঝালিয়ে নেবার জন্য কুঞ্জ নিকেতনে গতায়াত শুরু করেছে, তখনও নয়।

২.৪. জমবারের তৃতীয় মহিলা জমিদার মনি বিবিও বিধবা। দ্বাদশ কন্যারত্নের জননী। এক মেয়ের জামাই ধূম্রলোচন। ছোট মেয়ে ছিঁড়িয়া খাতুনের বিয়ে দিয়েছেন জয়ঢাকের সঙ্গে। স্বামী যখন জীবিত ছিল তখনও মনি বিবি তাকে সমীহ করে চলেন নি। অবজ্ঞা, অবহেলা ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে স্বামী একরকম অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন। মনি বিবি তখন মনোমোহিনী রূপসজ্জায় সুসজ্জিত ও সুরভিত হয়ে প্রিয় নাগর ও কর্মচারী লাল আলুর সাহচর্যে অতি উগ্র রঙ্গরস আস্বাদন করে বেড়িয়েছেন। শেষ বয়সে পাপের শাস্তি পেয়েছেন। কুষ্ঠরোগে সকল অঙ্গ গলে গলে খসে পড়েছে। অবশ্য লাল আলু তখনও কর্মী ও সেবিকার সেবায় বিমুখ হয়নি। মনি বিবির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করেছে মোক্তার তুড়ুক পাছাড়, ঘরভাঙ্গা সান্যাল, মাথা পাগলা লাহিড়ী, ক্ষ্যাপা কালকুট রায়, পেটভরা

গুহ, উনপাঁজুরে ঘোষ, কীলচোর বাগছি, ঘসাপয়সা, উলটপালট খাঁ, বেল্লীক মুন্সী, বদহজম ইত্যাদি।

২.৫. গ্রন্থে আরও তিন জন জমিদারের উল্লেখ আছে। একজন জমদ্বারের একমাত্র পুরুষ জমিদার সবলোট চৌধুরী। সোনা বিবি মনি বিবির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কলকাঠি ঘোরান সব্‌লোট চৌধুরী। উদ্দেশ্য দু'তরফ থেকে টাকা লুটের বন্দোবস্ত করা। সন্ধ্যে হলেই হন্যে হয়ে মেয়েলোক খোঁজেন। এঁর সকল অপকর্মের এজেন্টদল হলেন খানসামা ও গুপ্ত ইয়ার পাজী খাঁ, আখিতে মজালে আঁখির স্বামী বেহায়া শেখ, মোসাহেব মরদুত খাঁ বা ভেড়ুয়া খাঁ। অন্য এক মহিলা জমিদারের কথা বলা হয়েছে, যাঁর নাম জ্বালাতন নেসা। ইনিও ভেড়াকান্তের নাম শুনতে পারেন না। 'জ্বালাতন নেসার বিশেষ উপরোধে বেগম সাহেবা ভেড়াকান্তকে জব্দ করিতে, জেলে পুরিতে মহা পণ করিয়াছেন।'

ধনকুবের নামে যে জমিদারের উল্লেখ রয়েছে ইনি সোনা বিবিকে অকাতরে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। গাজী মিয়াঁর মতে, তাও স্বার্থ-প্রণোদিত। এই হোলো সংক্ষেপে গাজী বস্তানীর জগৎ ও সে জগতের বাশিন্দাদের পরিচয়।

৩. গাজী মিয়াঁর বস্তানী একটি গণ্ডগ্রামের পয়সাওয়ালা অসৎ নরনারীর যাবতীয় অপকর্মের ফিরিস্তি। গ্রাম্য স্থূলতা ও নোংরামী এ জীবনের পরতে পরতে ক্লেদ সঞ্চার করেছে। গাজী মিয়াঁ জগৎকে বর্ণনা করেছেন সমাজ-সচেতন মহৎ শিল্পীর নিরক্ষেপ বেদনাবোধ নিয়ে নয়। বর্ণকের মর্মবেদনা এমন কোন আদর্শগত মহত্তর জীবনের সংকেত নির্মাণ করতে পারেনি, যার ক্ষয় বা বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে আমরাও মর্মাহত বা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, গাজী মিয়াঁর বসতিও জমদ্বারে। এই লোকালয় তাঁর স্বাভাবিক আবাসভূমি। মনুষ্য হিসাবে গাজী মিয়াঁও আলাদা গোত্রের নন। বর্ণিত পাত্রপাত্রির আসক্তি-প্রবৃত্তির মূল উপাদানসমূহ গাজী মিয়াঁর মানস গঠনেও পোষ্টাই জুগিয়েছে। পার্থক্য এই যে নানা চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে গাজী মিয়াঁ ব্যক্তিগত

কারণে যার বিরুদ্ধে যখন যত বেশী উত্তেজিত হয়েছেন, 'বস্তানী'র মধ্যে তাকে তত বেশী কদর্য করে এঁকেছেন। কোন কোন চিত্র কল্পনারোপিত বর্ণের উজ্জ্বলতায়, বিদ্রূপাত্মক উদ্ভাবনী শক্তির প্রচণ্ডতায়, ভাষার গতিবেগের প্রবলতায় পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ক্ষুদ্র কয়েকটি অংশে মাত্র লক্ষণীয়, সর্বত্র ব্যাপ্ত নয়। কারণ গাজী মিয়াঁ বলবান ও আবেগপ্রবণ আহত পুরুষ। একবার রোষে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে বাণীকে শিল্পকলার নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করবার আবশ্যকতা আদৌ গ্রাহ্য করেন না। তখন তিনি অনর্গল বকে যান। আলোচ্য সংস্করণের ভূমিকায় (পৃ ৷৷০) এই ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে গুণ হিসাবে। আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি।

৪.১. গাজী মিয়াঁ সোনা বিবির মিত্রপক্ষ। সোনা বিবির বর্ণনায় গাজী মিয়াঁর লেখনী অনর্গল নয়। বেশীর ভাগ অংশেই সহানুভূতিশীল ও সংযত, প্রশ্রয়দানকারী ও অনুমোদনাত্মক। সোনা বিবি নিজের ছেলের আচরণে ব্যথিত হৃদয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন:

> অল্প বয়সে স্বামী দুনিয়া ছাড়া হলেন। কত লোকের চক্ষু পড়ল, পুড়ল। কত আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে হিংসা দ্বেষ উপস্থিত হয়ে বিশেষ কাল হয়ে দাঁড়াল। অবলা অসহায়ার জীবন-যৌবন রক্ষার দিকে কাহারও চক্ষু ঘুরল না, পড়ল না। কি করলে, কিসে কি কৌশলে সম্পত্তির অধিকারী হবেন, আমাকে হস্তগত করবেন, জীবন-যৌবনের মালিক হয়ে, সকল প্রকারের ইচ্ছা যথেচ্ছাভাবে পরিপূর্ণ করবেন, তারই সুবিধা ও সরল পথ খুঁজতে লাগলেন।...তারপর যখন বাবা জয়ঢাক বড় হয়ে উঠল, গোঁপের রেখা মুখে দেখা দিল...মনে কতই আনন্দ, কত আশা! কতই সুখ-স্বপ্ন দেখলাম। আশাকুহকে সুখের দোলায় দুললাম। চিরশত্রু মনি বিবি, তাঁহার নাফানি ঝাঁফানী ষোল আনা মাটি করব আশাতেই, তাঁহার কন্যার সহিত সোনার চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হলাম। আমার মুখে আগুন, মুখে চাই, আমার কপাল পুড়ল। যে সরিষা দিয়ে ভূত ছাড়াব, সেই সরিষাকেই ভূতে

পেল।...শাশুড়ীর অনুগত হয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। হায়! হায়!
আমি বুঝলেম কি, হল কি? (পৃ ৮০-৮১)।

সোনা বিবি তাঁর গৃহে বন্দী অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। জয়ঢাক মায়ের কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ। দাগাদারীর প্ররোচনায় মা তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন, এই আশঙ্কায় সে কিছুতেই মাকে দাগাদারীকে সঙ্গে করে জমদ্বার ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে দেবে না। জবরানা হেবানামা লিখিয়ে নেবে। ভেড়াকান্তের চেষ্টায় আদালতের হুকুম আদায় করা হোলো যে সোনা বিবিকে কেউ জমদ্বারে আটকে রাখতে পারবে না। তিনি যেখানে খুশী চলে যেতে পারেন। ওদিকে মনি বিবির তরফের লোক তদ্‌বীর করে এই হুকুমের মধ্যে একটা অন্যরকম শর্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে: 'হাকিম বাহাদুরের আদেশ, সোনা বিবির প্রতি আদেশ যে, নাবালক জয়ঢাকের কোন মাল, কোন জিনিষ, কোন অস্থাবর সম্পত্তি তিনি সঙ্গে না লয়েন, বাড়ী ছাড়া না করেন। ফলে, দাগাদারী সোনা বিবিকে পাল্কীতে উঠতে সাহায্য করছেন, এমন সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। 'পুলিশের চক্ষের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল'। জয়ঢাক নিজে এগিয়ে এসে সকল জিনিষ টানা হেঁচড়া করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তার এক কণা সম্পদও সোনা বিবি সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে না পারেন, তার জন্য জয়ঢাক ক্ষিপ্তের মত বাধা দিতে থাকে।

সোনা বিবি পাল্কীর মধ্য হইতে কাতর স্বরে বলিতেছেন:
ওরে জয়ঢাক! আমায় বেইজ্জত করিস্ না, আমার গায়ে এভাবে হাত দিস্ না। আমার গায়ে কিছু নাই। ওরে! আমার কোমরে কিছু নাই, উহু! ধাক্কা দিয়া আমার পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিস্ না, আমার বিছানার নিচে কিছু নাই, ওখানা খালি তোষক, ছেঁড়া তোষক, পাল্কীর মধ্যে কিছু নাই। ও বাবা! আমার মাথার চুলের মধ্যে কিছু নাই বাপ্। আমি তোর কোন জিনিষ লই নাই। ওরে! ওখানা আমার পরনের কাপড়। দোহাই তোর বাপের! ওরে দোহাই তোর খোদা-রসুলের! আমাকে উলঙ্গ করিস না। এত লোকের মধ্যে

পাল্কীর দরজা ভেঙ্গে ফেলেচিস, নাথি মেরে ভেঙ্গে বেশী ফাঁক করে ফেলেচিস, ভালই করেচিস্। আমি তোরই মা। ওরে আমি তোরই জন্মদাতার ভালবাসা স্ত্রী। ও জয়ঢাক। তোর পায় ধরি বাবা। আমার পরনের কাপড় টেনে আমাকে বেআব্রু করিস না...তুই লোকজন সরিয়ে তফাত কর ' আমি পাল্কী হতে নেমে ঝাড়া দিচ্ছি; তুই তন্ন তন্ন করে দেখ; আমার কাছে কিছু নাই। ও বাবা! তোর দুখানি পায় ধরি বাপ! আমার পরনের কাপড়খানা কেড়ে নিস্ না। আমি উলঙ্গ হলেম। শীতকাল—গায়ে একটা ছেঁড়া কোরতা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েচিস্। গায়ের চাদরখানা টানাটানি করে ফেড়ে ফেলেচিস্। মাত্র একখানা ছেঁড়া কাপড় আমার পরনে আছে, তাও কি তুই কেড়ে নিবি! ওরে এই জন্য কি তোরে দশ মাস দশ দিন এই পোড়া পেটে কত কষ্টে রেখেছিলাম! ওরে, এই জন্য কি পুত্র কামনায়, কত রোজা, কত দান, ঔষধ, কত তাবিজ, কত প্রকারে কত কষ্ট, খেয়ে না খেয়ে সহ্য করেছিলাম। এই জন্যই কি ওরে! এই জন্য কি বুক চিরে ফকীরের আস্তানায় রক্ত পাঠায়েছিলাম! বাবা! আমার গায়ের কাপড় কেড়ে নিস না...হায়! হায়! আমার কপালে আগুন। আমার অদৃষ্টে শত শত ঝাটা। পেটের সন্তান হয়ে মাকে উলঙ্গ করে পরনের কাপড় নিতে চায়। হা অদৃষ্ট!

উহু! মলেম! তুই আমার পা ছেড়ে দে! এ প্রাণ-ঘাতক ভক্তি তোকে কে শিখাল! ওরে ছেড়ে দে! আমাকে টেনে পাল্কীর বাহির করিস্ না! এমন ভক্তি তোকে কে শিখাল! বুঝেছি বুঝেছি এ তোর পৈতৃক বুদ্ধি নহে। তুই তোর পিতার প্রস্রাবেই জন্মেছিস, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তোর এত গুণ কিসে হল? কে শিখাল? তোর জন্মদাতা ত এত নিষ্ঠুর ছিল না? তবে তুই কোথায় শিখলি? বুঝেছি, ওরে বুঝেছি। দুরন্ত জালেম খুনে ডাকাতের পুত্র তোর শিক্ষাগুরু, তারই এই শিক্ষা। আমি তোর দুখানি পায়ে ধরে বলি, ওরে আমাকে ছেড়ে দে। আর সহ্য হয় না, ছেড়ে দে। (পৃ. ৯৮-৯৯)।

গাজী মিয়াঁ ওরফে ভেড়াকান্ত সোনা বিবিকে শ্রদ্ধা না করলেও ঘৃণা করেন না। যে দৃষ্টি দিয়ে সোনা বিবির দোষত্রুটি বিচার করেছেন, তাতে সহানুভূতি ও অনুকম্পা মেশান ছিল। দরদের মধ্যে স্বপক্ষে সমর্থনের দলীয় মনোভাবও কাজ করেছে। একাদশ নথিতে সোনা বিবির চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে গাজী মিয়াঁ বলেন:

> মুসলমান রমণীর মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞান লাভের কোন উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার বুদ্ধি নাই, বিঘোর দুনিয়ার মার-পেচ চক্র বুঝিয়া হস্ত পরিমিত স্থান অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, কপট কৃত্রিম বাছিয়া পরিত্যাগ করার ক্ষমতা আমার নাই, শত্রু-মিত্র চিনিবার চক্ষু নাই, সাত-পাঁচ কত হয়—গণিয়া বলিবার বিদ্যা নাই, সৎ-অসৎ বিচার করিয়া কার্য করিবার মাথা নাই।...সাধারণ স্ত্রীলোকের বিষয়ে ভাবিলে, তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, মুসলমান রমণীর ন্যায় অবোধ-সরল-মূর্খ আর কোন জাতির মধ্যে নাই। (পৃ. ১৪০)।

কিন্তু গাজী মিয়াঁর রাগ আছে সোনা বিবির আক্কেল বরদারদের বিরুদ্ধে। দাগাদারী বেআক্কেল ও তেনাচোরা 'এই তিনমূর্তিই সোনা বিবির মন্ত্রদাতা, সবকার্যে পরামর্শদাতা, সকল বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা'। সোনা বিবিকে পরিচালিত করার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা অসম্পূর্ণ বা তুলনায় নিম্নমানের এই হেয়কর অবস্থা গাজী মিয়াঁ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই বেশী রাগ সোনা বিবির সবচেয়ে প্রিয় প্রধান আক্কেল বরদার দাগাদারীর ওপর।

> দাগাদারী সাহেব সর্বময় কর্তা। ..দাগাদারী ভাই দিনরাত খাটিতেছেন, স্নান আহারের সময় পান না। দিবসের আহার সন্ধ্যার পর, রাত্রের আহার প্রভাতে। কি কাজে তিনি ব্যস্ত তিনিই জানেন।...অনধিকার প্রবেশ মকদ্দমা, পাঁচ শত টাকা জামিন—কম ভাবনার কথা?' কারণ সোনা বিবি তাঁহার সম্পর্কে একেবারে ছাঁকা নিছাঁকা খাঁটি মনিব

নহেন, দুধভাই...সোনা বিবি দাগাদারীর মাতার দুধ পান করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুধভাই। ছেলেবেলা হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সোনা বিবির বাটিতে আছেন, এক ভাবে একত্রে এক সাথে আহারাদি করেন। জয়ঢাক নাবালগ, সুতরাং অনধিকার প্রবেশ অনিবার্য।

অন্যত্র গাজী মিয়াঁ মনের ভাব আরো খোলাসা করে ব্যক্ত করেছেন। আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল লাল আলু মোল্লাজীকে নিয়ে। মোল্লাজী মনি বিবির ওপর স্বামীস্বত্ব দাবী করে যে মামলা দাখিল করেছে, সোনা বিবির আশঙ্কা যে মনি বিবি বিচার চাইলে লাল আলু শেষ পর্যন্ত সে মামলা নাও চালাতে পারে।

ভেড়াকান্ত বিদায় হইলেন।...দাগাদারী পর্দা উঠাইয়া শয্যার পার্শ্বে বসিলেন।.. বলিলেন: লাল আলু তেমন লোকই নয় যে তাদের কথায় ভুলে যাবে।

: ভুলাতে কতক্ষণের কাজ। স্ত্রীলোক যদি ইচ্ছা করে আমি ওকে ধোঁকা দিব, ভুলাব, তবে হাজার বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোক হোক্, ভুলে যাবে, স্ত্রীলোকের কথায় অবশ্যই ভুলে যাবে।

: সকলে নয়।

: সকলে নয় ত বাদ কে, বলতে পার?

: সে কথা যখন বলতে হয় বলবো। আর একটি কথা। বেগম সাহেবের সঙ্গে খুব ভালবাসা ভাব দেখাতে হবে। জানেন ত তাঁর সঙ্গে হাকিমানদের খুব আলাপ আছে, তাকে হাতে রাখতে হবে।

বেগম ঠাকরুণের সাবেক্ গুরু দাগাদারী 'অরাজকপুর আসিয়া বেগম সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসী মিশামিশি আরম্ভ করিয়াছেন'। সোনা বিবি এটা লক্ষ্য করেছেন এবং পছন্দ করেন নি। তাই জবাবে বললেন:

তুমি ভাব করো, আর তাকে হাতে রাখো। তোমার ত হাতের মাল, হাত দেখালেই আবার ভাব হবে, হাতে আসবে, নূতন ভাবে বশ হবে। আমি কারও সঙ্গে ভাব লাভ করতে পারবো না...তুমি ভালবাসা দেখাও, তোমার পুরাতন কুটুম্ব, কুপ নূতন করে জ্বালিয়ে

লেও।...আমি কখনই ঠাকুরাণীর সঙ্গে পীরিতি প্রণয় কর্ত্তে পারবো না, করবো না। যাও বেশী বকো না। আমায় ঘুমাতে দাও। তুমি তোমার বিছানায় যাও। (পৃ ১৫৩-১৫৪)।

দাগাদারীর মা পুত্রবধূর দুঃখ বর্ণনা করতে গিয়ে সকল দোষ আরোপ করেছেন সোনা বিবির ওপর। সোনা বিবিই দাগাদারীকে গ্রাস করে রেখেছেন। মায়ের ভাষায়:

এই সোনা বিবি স্বামীর মৃত্যুর পর কি কল্লেন? কেলেঙ্কারী—কেলেঙ্কারী। দেবরে দেখল, রাখা দায়, যা ইচ্ছে তাই করুক। তবে এর কথা—যা করেছে, শাস্ত্রমত ধর্মসঙ্গত করেছে। কোন পাপের কাজ করে না। মুখে স্বীকার কর্ত্তে সাহস পায় নাই। প্রথম ঝুপঝাপ, তার পরে টুপটাপ, তার পরে চপচাপ—তার পরেই কাপকাপ, ঘোপঘাপ, তারপর ধরাধরী, ঝাকমারী, সর্বশেষে দাগাদারী।...সোনা বিবি যাই বলুন না কেন, বউ আমার লক্ষ্মী। সে লোক দেখিয়ে কাঁদতে জানে না। তার মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। আজ তিন বছর কি তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়? দাগাদারী কি বাড়ী যায়? যদি চুপেচুপে কোন দিন গিয়ে এক নজর দেখে আসে, ফোটনার দল লাগাই আছে, অমনি টুক্ করে এসে কানে লাগিয়ে দেয় যে, আজ এই এই ঘটনা হয়েছে। আর যাবে কোথা? মারধর, খুনাখুনী, কামড়া-কামড়ি, চুল দাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ী, ধুতী চাদর চেরাচিরী, এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার লেগে যায়। (পৃ. ৩২৬)।

যেদিন প্রথমবার দাগাদারীকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যেতে এল সেদিন সোনা বিবি যে কি পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়েন গাজী মিয়াঁ তা সযত্নে বর্ণনা করেছেন। সোনা আর্তনাদ করে ওঠেন:

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব। বলেন কি। আমি দাগাদারীর মুখখানা ভাল করে দেখতে পাল্লেম না। হায়। হায়। দাগা—আমার দাগা, কখনও পায় হাঁটে নাই। দশ কদম যেতে হলেও পাল্কী না হয় ঘোড়াতে গিয়েছে। একটু উনিশ বিশ হলে সে কি আর মানুষের

মধ্যে থাকে। হাঁপিয়ে, মাথা ঘুরে দড়াম করে পড়ে যায়। কত গোলাপ জল ঢালি, কত ঠাণ্ডা করি তবে সে ঠাণ্ডা হয়। সে ননীর পুতুল, তার গায়ে ধুপ বরদাস্ত হয় না, মোমের মত গলে পড়ে। হায়! হায়! ···ইন্‌স্পেক্টর বাবা! তুমি আমার বাবা। মিনতি করে বলছি, ওকে হাঁটিয়ে নিও না। একটি বার আমার নিকট আসতে দেও, আমি মুখখানা ভাল করে দেখে নিই। (পৃ. ৫৭)

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, অশ্রুজলে নয় অর্থাগমে দ্রবীভূত হয়ে, যখন অনুমতি দিলেন তখন 'দাগাদারী পর্দ্দার মধ্যে মুখ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ বাহিরে রাখিয়া' বিদায়ের পালা সাঙ্গ করেন। যেদিন সোনা বিবিকে গ্রেফ্‌তার করতে পুলিশ এল সেদিন দাগাদারীও কম দিশাহারা হয়ে পড়েনি। 'দাগাদারীর চক্ষু উপরে উঠিল, গালের ভাত পড়িয়া গেল, হাতের মুরগীর হাড় বুকের উপর হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া কোঁচরের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।' (পৃ. ৩৯৩)। বইয়ের শেষ দিকে সোনা বিবি-দাগাদারী সম্পর্কের মধ্যে ভেড়াকান্ত নিজেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আরেক পরত গর্হিত পীরিতের শিহরণমূলক উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে। কলঙ্ক নিজেকে স্পর্শ করলেও তা রটিয়ে যদি অন্য অন্য অংশীদারদের বেইজ্জতী বেশী করে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে চুপ করে থাকা কেন? গাজী মিয়াঁ ওরফে ভেড়াকান্ত সব কথা খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। নিজে বলেন নি, বেগমের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। শুনিয়েছেন সোনা বিবিকে নয়, দাগাদারীকে।

ভেড়াকান্ত আর সোনা বিবিতে যে প্রকার সম্বন্ধ, তাতে নিশীথ রাত্রে এক ঘরে দুজনায় কথা কেন? আমোদ-আহলাদের কথা, রঙ্গরসের কথা,—এ সকল কথা কেন? পানের উপর পান, চুরুটের উপর চুরুট দেওয়া কেন? কর্ত্রী শুয়ে,—রাত্রেই ভেড়াকান্তের সঙ্গে আলাপ তার বুকের বুকের কাছে গায়ে গায়ে ঘেঁসে বসা কেন? প্রতি রাত্রেই ভেড়াকান্তের সংগে আলাপ কেন? তার বাড়ীতেই বা যাওয়া কেন? আমি ত আর খুকি নই, মূর্খ নই, চোরেই চোরের সঙ্কেত বুঝে। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর, বাতাস ভালভাবে বচ্ছেনা। আমি

শুনেছি ভেড়াকান্তের তত দোষ ছিল না। কর্ত্রীঠাকুরাণীর ভালবাসাটাই কিছু বেশী। ভেড়াকান্ত না হলে বুঝি আর আরাম বোধ হয় না। এ সকল ঘটনা ত তোমার চক্ষের উপরই হয়েছে—হয়ে থাকে। বলত সত্য না মিথ্যা। বুকে বেথা ধরল। ভেড়াকান্তের হাত টেনে বেথাস্থানে দেওয়া হল কেন ?...স্ত্রীলোক অপর পুরুষের হাত আপন হাতে টেনে এনে বেদনা দেখতে কোরতার মধ্যে হাত লয়ে গিয়ে দেখায়। কিছুই বুঝলে না। গাধা! বেদনা বুঝি অপরে হাতিয়ে অপরের বেদনা বুঝতে পারে? আচ্ছা মানলাম, কোন স্থানে ফুললে হাতে টের পাওয়া যায়। সে ফুলো দেখতে কতক্ষণ সময় লাগে। আধ ঘণ্টার মধ্যে কি আর স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না। (পৃ ৩৯২-৩৯৩)।

৪.২. মনি বিবি সোনা বিবির বিপক্ষে। মনি বিবির দুঃখ-দুর্দশা, গ্লানি-অপমান ব্যাধি-জরার সংবাদ প্রচার করায় গাজী মিয়াঁ যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহী ও উদ্যমশীল। মনি বিবির মেয়েদের কুকাণ্ড নিজের জীবনের কলুষিত অতীত ও কদর্য বর্তমান, সর্বাঙ্গের দুরারোগ্য ব্যাধি ও অনিবার্য ক্ষয় সবই গাজী মিয়াঁ প্রাণভরে বর্ণনা করেছেন। এই দায়িত্ব তাঁর কাছে এত পরিতৃপ্তিকর মনে হয়েছে যে এর কোন সামান্য অংশও তিনি অকথিত রাখতে চাননি। বর্ণনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত এক অমানুষিক হৃষ্টচিত্ততা এই অসার রমণীর জীবনের ভয়াবহ পরিণতিকে এক বীভৎস উজ্জ্বলতা দান করেছে।

লাল আলু মোল্লাজীর ঠোঁট টুকটুকে, চোখ মোটা। মনি বিবির ওপর স্বামী-সম্পর্কের অধিকার দাবী করে সে এক মামলা দায়ের করেছে। সোনা বিবি তাই লাল আলুকে ডাকিয়ে এনেছে। ভেড়াকান্ত লাল আলুকে বাজিয়ে নিচ্ছে, ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে।

আমার কথা বুঝতে পারেন নাই? আপনি যে এই নালিশ করেছেন, এতে আপনি সত্য সত্যই কি মনি বিবিকে স্ত্রী বানাতে চান? আমি

বলি, আমি সে কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। কারণ মনি বিবির যে দশা তাতে অমন রোগ-গ্রস্ত পচা শরীর, আজ বাদে কাল মাংস খসে পড়বে, এখনি আরম্ভ হয়েছে। এমন পচা সড়া, দুর্গন্ধ ওঠা পুঁজরক্তে মাখান বুড়া একটা স্ত্রীলোককে স্ত্রী বানাতে কার সাধ হয় বলুন ত ? তার পরেও ঈশ্বর ইচ্ছায় দাঁত পড়েছে, নিচের ঠোঁট-খানি খসে পড়ছে হাতে পায়ে, পায়ের তলায়, নাকের আগায় বাঘের মত থক্‌থক্ কচ্ছে। এমন লোকের কাছে কে বসতে পারে বলুন দেখি ! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।...পুঁজরক্তের দুর্গন্ধে, গলিত মাংসের দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী পর্যন্ত উঠে পড়ে। দিনে দশ-বারোবার বিছানা বদলাতে হয়, ধরে তুলতে হয়, ধরে বসাতে হয়। ছুকরি বাঁদী কেউ কাছে যেতে চায় না—দেউড়ি পর্যন্ত গন্ধে মাতিয়ে তুলেছে। বড় মানুষ—জমিদার। কম করে হলেও দেড় শত দাসী, এক ডজন মেয়ে,—তাইতে রক্ষা, তা না হলে এত দিন, যা দশ দিনই হউক আর দশ মাস পরেই হউক, হবেই হবে। পোকা না পড়ে যায় না। আপনারা দেখবেন ; না দেখতে পান, শুনবেন। পোকা পড়বে পড়বে পড়বে। হাড় পর্যন্ত খসে পড়বে। এমন সাধের স্ত্রীরত্ন সহিত সংসারধর্ম রক্ষা কর্ত্তে কি আপনি নালিশ করেছেন।

...মোল্লাজি বলিলেন, 'আমার আশা স্ত্রীলাভ। তা আপনি যাই বলুন। আমি মকদ্দমা কখনি আপস করবো না। জিতলেও ছেড়ে দিব না। ঔষধ কল্লেই রোগ আরাম হয়। ঔষধে যদি নাও সারে আল্লা আরাম দিলে কে ঠেকায় ? (পৃ ১৪৬-১৪৮)।

সোনা বিবি বিদায়ের পূর্বে লাল আলুকে শেষ বারের মত স্মরণ করিয়ে দিলেন :

তবে কথাটা ত এই ঠিক রৈল। আপরি খোদার কসম খেয়ে আজ বল্লেন, হুজুর সময় কোরান শরিফ ছুঁয়ে কি বলেছেন, সে কথাটা যেন মনে থাকে। (পৃ. ১৫০)।

মনি বিবিও চুপ করে বসে থাকেন নি। কিন্তু লাল আলু বিনি পয়সায় কিছু করতে রাজী নয়। সে প্রস্তাব করেছে যে বার হাজার টাকা পেলে

মামলা তুলে নিতে পারে। মনি বিবি এত টাকা কোথায় পাবেন? তাই শেষবারের মত নিজে সশরীরে চেষ্টা করে দেখবেন বলে লাল আলুকে ডেকে পাঠিয়েছেন, লাল আলুও এসেছে।

লাল আলু নির্ব্বাকে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে। পর্দ্দার অপর পার্শ্বে মনি বিবি। মনি বিবি আজ ক্ষতস্থান সকল পরিষ্কার সুচিকন খণ্ড খণ্ড বস্ত্রে জড়াইয়া রক্তধারা পচা পুঁজ সার বন্ধ করিয়া পুরু ফেলালেনের কোরতা পরিয়াছেন। কোরতার উপর কাল রঙ্গের সাটিনের জ্যাকেট। চারিধারে মিহিন সুবর্ণ সূত্রের পাতা লতা ফুল কাটা, সুচের কাজ—দেখিতে খুব বাহার। পরিধানে বিখ্যাত ভিটীর ধুতি। আতর গোলাব চর্চ্চিত। মস্তকে ফুলল তেলের অতিরিক্ত ব্যয়। বিছানা বালিশ পরিষ্কার।

কি বলিবেন, কাহাকে বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নিজে নিজেই বলিতেছেন, 'ঘরের দোরটা খোলা রইল, কি করি আমিও ভেবে উঠতে পারি না।'

লাল আলু তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, অপূর্ব্ব দৃশ্য, পর্দ্দা অদৃশ্য, পরস্পর দেখা। উভয়েরই চক্ষু নিম্নে, মস্তক অবনত। আবার কেন? মধ্যে পর্দ্দা ছিল, তাহা নাই। রাত্র অধিক হইয়া আসিল।

·· মনি—'তোমার অপরাধ পায় পায়। তুমি চাইলেই পেতে তোমাকে দিই নাই কি? আছে কি? রেখেছি কি? জানো, বোঝ—তবে আদালতে গেলে কেন? দেশময় কলঙ্ক রটালে কেন?'

লাল—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) 'মানুষেই ভ্রমে পড়ে মানুষেরই ভুল হয়। এখন হুজুরে হাজির হয়েছি, যা ইচ্ছা সাজা দিন পিঠ পেতে সইব। ঘাড় নওয়ায়ে হুকুম তামিল করবো। (হাত জোড় করিয়া) এ গোলাম চিরকালের হুকুম বরদার—তাঁবেদার। (পৃ. ২২৫-২৬-২৭)।

াল আলু মোকদ্দমা তুলে নিয়েছে। গাজী মিয়া এতে খুবই অসন্তুষ্ট।
া অসন্তোষ সংযমের সীমা লংঘন করে আত্মপ্রকাশ করেছে বকেশ্বর-
তুরাজের ভাব-বিনিময়ের অশ্রাব্য ভাষায়। বকেশ্বর বলেছেন :

> লাল আলু মোকদ্দমা তুলে নিয়েছে। দরখাস্তে বলেছে যে, আমার এইক্ষণে স্ত্রীর প্রয়োজন নাই। বয়স দোষে ইন্দ্রিয় আদি শিথিল হয়েছে, আর স্ত্রীর আবশ্যক নাই।
>
> ঋতু—বাবা! দরখাস্ত দাখিল সময় ইন্দ্রিয় আদি সটান ছিল, ছয় মাস যেতে যেতে শিথিল হলো? দশ-বারো হাজারের কমে আর শিথিল হয় নাই। (পৃ. ২৫১)।

ন বিবির মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা অতি যত্ন নিয়ে লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত
রেছেন। মনি বিবির তখন শেষ অবস্থা। কন্যারা মায়ের কাছে আসিতে
য় না। 'আসিলেও বসিতে চাহেন না। নাকে কাপড় দিয়া, কেহ
গন্ধি মাখা রুমালে নাকমুখ বাঁধিয়া কাছে বসেন, অসহ্য হইলে উঠিয়া
লয়া যান। বলিহারি যাই লাল আলুকে। ধন্যবাদ দেই লাল আলুকে।
নিজের স্নান-আহার পরিত্যাগ করিয়া মনি বিবির সেবা করিতেছে, প্রাণ
া ঢালিয়া সেবা করিতেছে। মনের কথা মনের ভাব ঈশ্বর জানেন।
দয়ের টানে, মনের আকর্ষণে করিতেছে—না হয় স্বার্থের জন্য খাটিতেছে।
হাই হউক, স্বার্থের জন্য হইলেও, অমন পচা দেহের নিকট সর্বদা কোন
াণী থাকিতে পারে? ধন্যবাদ লাল আলু! নিমকের সত্ত্ব তুমিই বজায়
খিলে।' (পৃ. ২৯৫)। কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কিন্তু
খাদার কালাম কানে গেলেই যখন হাত দিয়া নিবারণ করে, শুনিতে চাহে
।—বিকৃত মুখ, আরও বিকৃত করিয়া মাথায় আঘাত করিতে থাকে, তারা
টিয়া চক্ষের দুই কোণ হইতে অজস্র ধারে জলধারা থাকে·· বাধ্য হইয়া
ারান পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।' (পৃ. ২৯৪)। তখন মনি বিবি :

> গাঁ গাঁ রবে মুখে বালিশের মধ্যে লুকাইয়া গোংরাইয়া বলিলেন : তুমি সম্মুখে থাকতে আমাকে নিয়ে যায়! এতদিন কোথা ছিলে? বল, তোমার দুটি পায়ে ধরি, এতদিন কোথা ছিলে? ধর ধর আমায় ধর।

আমায় টেনে লয়ে চল। ওকি ? ওরে লাল আলু। ওকি ? এম আগুনের শরীর তোর কবে হল ? ওরে ? তুই আমার কাছে আসি না। তুই সরে যা। বাবাগো। আগুনের শলাকা। প্রাণ যায়। তোরা থাকতে আমার উপর এত যন্ত্রণা। না, না, আমি আর ওদিকে তাকাব না। মরেছি মরেছি। এইবার মরেছি। আমায় বেঁধ না। দেখ! তুমি আমায় কত ভালবাসতে, কত আদর করতে, আমি কিছুই করি নাই, আমি তোমাকে কোন দিন মনের সহিত ভালবাসি নাই, যত্ন করি নাই। তোমাকে ফাঁকি দিয়ে কত কি করেছি।

...আমি ওদিকে তাকাব না। দেখ! তোমার দুখানি পায়ে ধরি, আমায় বাঁচাও। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আর সহ্য হয় না। দম বন্ধ হয়ে এলো। আমায় বাঁচাও। দোহাই তোমার। আর সহ্য হয় না। চক্ষে নাকে মুখে শরীরের প্রতি লোমকূপে উত্তপ্ত অগ্নিময় লোহার শলা চালাইয়া দিলে কি মানুষ বাঁচে ?

...সেই, তার, আমারই দোষ। ঠিক ঠিক। ঐ ঐ অন্ধকার ফাঁকি দিয়ে। তুমি কেঁদে অস্থির। তোমাকে শাক ভাত,—লালে ঘি কোরমা কত মেঠাই। চাটাই, মাদুর, ওহো তুমি,...লালে ফুল নরম বালিশ গদী। উহু! এখন আগুন আগুন, পুড়ি পুড়ি। গেলেম রে! মলেম রে! ও হো হো। উঃ---যাব না যাব না, আমি যাব না। অগ্নিকুণ্ড মধ্যে যাব না, যাব না। ওরে! যাইতে পারি না—একটু জল, একটু পানি। গলা শুকাইল, বুক ফাটিল, ফাটিল।

...দেখ! তুমি মাপ করো। তোমাকে ঠকায়ে তোমাকে ভুলায়ে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়ে, কত পাপ করেছি, পাপসাগরে ডুবেছি। তোমার নিজস্ব শরীরের যে যে স্থান অপরে ছুঁয়েছে, দেখ সেই সকল স্থান পচে গলে, হাড় পর্যন্ত জরজর হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। দোহাই তোমার। দোহাই তোমার পিতামাতার, আমায় ক্ষমা কর। ...যাই যাই। আর মের না। ঐ অগ্নিময় সাপ। ও! উহু অগ্নিময় অজাগর—হাঁ হাঁ রবে জিহ্বা বার করে আসতেছে।* ঐ আসল— ঠেকাও ঠেকাও। (দক্ষিণ বামে ভয়ে জড়সড় হইয়া) ধরল আমায়

ধলল—উহু! আবার—প্রবেশ করল—প্রাণ বার হও—হলো—শান্তি—স্বামি—স্বামি! পঁদ দুখানি বুকে—দেও দেও।

প্রলাপ বন্ধ হল! চক্ষুতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিল, বহু যন্ত্রণা বহু ক্লেশের পর প্রায় দুই ঘন্টা কাল নিঃশব্দে অন্তর জ্বালা ভোগ করিয়া মনি বিবির প্রাণবায়ু নাকে মুখে বিকৃত আকারে বাহির হইয়া গেল। (পৃ. ২৯৬-২৯৭ ও ২৯৯)

৪.৩. কিন্তু এই বইয়ের আসল চরিত্র সোনা বিবি বা মনি বিবির ায়। এই দুই ভাবী-ননদ পরস্পরকে যে তীব্রতার সঙ্গে ঘৃণা করেন, যে হিংস্রতার সঙ্গে একে অন্যকে আঘাত করতে উদ্যত, যে সর্বাঙ্গীন অনাচারের ধ্যে উভয়ের কদর্য জীবন গভীর ভাবে নিমজ্জিত, বস্তানীর কাহিনী-অংশে য়ত তার বিস্তার ও গুরুত্ব সর্বাধিক। তবু এ কথা স্বীকার না করে পায় নাই যে, রমণী ভুয়োদর্শী গাজী মিয়াঁর চিত্তে প্রবলতম বিক্ষোভ ও ালোড়ন সৃষ্টি করেছে, সংসারী ভেড়াকান্তের সুখশান্তি মানসম্ভম ছনছ করে দিয়েছে, প্রতিহিংসাপরায়ণ লেখকের শিল্পবোধ ও সংযম হরণ রে নিয়েছে, সে হল পয়জারননেছা ওরফে বেগম সাহেব ওরফে বগম ঠাকরুণ। বেগম ঠাকরুণের প্রতি অঙ্গ, প্রতি ভাব, প্রতি উক্তি ও আচরণ গাজী মিয়াঁর চোখে বেঢপ ও বেমানান, বেলেল্লাপনা ও বহায়াপনায় পরিপূর্ণ। বেগম ঠাকরুণের ওপর আরোপিত যাবতীয় কুক্রিয়া ও ব্যভিচার গাজী মিয়াঁ বিবৃত করেছেন অতি আহ্লাদিত চিত্তে, অন্তরের উল্লাসকে বিন্দুমাত্র অবদমিত না রেখে।

অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ যেদিন প্রথম গা ঘেঁষে মুখোমুখি াঁড়িয়ে মুসলমান জমিদার বেগম পঁয়জারননেসার রূপ ও যৌবন, বিত্ত ও বৈধব্য, ঐশ্বর্য ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করলেন, সেদিন উচ্ছ্সিত আবেগে বলে উঠলেন:

আমি আজ এত সুখী হয়েছি যে এক মুখে প্রকাশের সাধ্য নাই। মুসলমান মধ্যে এরূপ ইন্‌লাইটেন, এত উন্নত মন, উন্নত চিন্তা, উন্নত আশা, উন্নত চক্ষু, উন্নত হৃদয়, উন্নত বক্ষ, আমি কখনও দেখি নাই।

ধন্য শিক্ষা, ধন্য সাহস, শত সহস্র ধন্যবাদ, হাজার থ্যাঙ্ক, হাজ
হাজার কোরনিস, হাজার হাজার নমস্কার, আপনার চরণ যুগলে।
ধন্য ধন্য! সাধ্য নাই এরূপ শিক্ষায় এরূপ ব্যবহারে কোন মুসলমা
মাথা তুলিয়া দুটি কথা আপনার বিরুদ্ধে বলতে পারে? ধন্য ধ
মেহমুডেন লেডী! এত উন্নত! ধন্য ধন্য পাড়াগাঁয়ের পৰ্দ্দানসী
জানানা। এত উন্নত! এ অভাবনীয় ঘটনা, পৰ্দ্দানসীন জানানা
কাণ্ড আমার পক্ষে নিতান্তই নূতন, আমার চক্ষে এই প্রথম দর্শন
জীবনে নূতন ব্যাপার, নূতন কাণ্ড। (পৃ. ৩৮

ভোলানাথ বাবুর অন্তর ভাবনার সূক্ষ্ম লালসালীলা যে দক্ষতার সঙ্গে এ
উন্নতিমূলক প্রশস্তির মধ্যে কটাক্ষে ব্যক্ত করা হয়েছে সমগ্র গ্রন্থে তার বেশী
সংখ্যক দৃষ্টান্ত নেই। গাজী মিয়াঁর উষ্মা যত বৃদ্ধি পেয়েছে আক্রমণ ত
স্থূলতায় পর্যবসিত হয়েছে। বেগম সাহেবের পরিপূর্ণ বিকাশের ইতিবৃ
রচনা করতে গিয়ে গাজী মিয়াঁ বলেন:

অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন। উপযুক্ত সহোদর ভ্রাতাদ্বয়, মস্ত্রে
সাধন—কিম্বা শরীর পাতন চেষ্টা করিয়া, নিশি জাগিয়া লিখা-পড়
শিখাইয়াছেন। সভ্যতা, শিল্প, বিজ্ঞান, চাতুরি, চালাকি, চাউনী
পদনিক্ষেপ, করমর্দ্দন, আঁখিঠার, অঙ্গভঙ্গী, হাসির কেতা বিস্ত
শিখিয়াছেন। ভ্রাতাদ্বয়ের মন উচ্চ কাঞ্চন শৃঙ্গ হইতেও উচ্চ, বেহ
উদার। বিধবা ভগিনীকে মহানগরী কলিকাতা দেখাইয়া, গলিকুচ
বড় রাস্তা, যাদুঘর, ভাগিরথী, বোটবজরা, জাহাজ, ইডেন গার্ডে
সোনাগাছি, হাড়কাটার গলি, মেছুয়াবাজার, এমাম বাগ লেন,
থানা দেখাইয়া চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ফুটাইয়া ফুটিফাটার
চৌচির করিয়া দিয়াছেন। (পৃ. ৩৪

এই রমণী কি বস্তুতে পরিণতি লাভ করেছে, গাজী মিয়াঁ ঋতুর
জবানীতে তার পরিচয় দিয়েছেন:

'হাঁ হাঁ। সেই সাত মরদের গ্রীবা-ভঙ্গকারিণী, এটর্নী উকি
বারিষ্টারের মনোমোহিনী, চটালো কালোপেড়ে সুচিক্কণ শুভ্র দশ গজ

ধূতির নিম্নে সামিজধারিণী, পরিধান বসনের পারিপাট্য দেখাইতে কোমল দেহের মলাএম ও স্থূল ক্ষীণ, মাংসাল মানানসইর প্রমাণ করিতে, স্থানে স্থানে স্বুবর্ণ রজত মক্ষিকা প্রজাপতি, ভ্রমর আকৃতির ব্রোচধারিণী, বিশাল নিতম্ব দোলানী, পাতিহাঁসগামিনী, হস্তিদন্ত-বিনিন্দিত শুভ্র বদনী। সরল—সুচিক্কণ—তাম্রতার সদৃশ, সাবান ঘসা, —হস্ত পরিমিত অতি রুক্ষ মৃদুকেশিনী, অর্দ্ধচন্দ্র পরাজিত ললাটে, চমৎকার শোভিনী, ঘোর কৃষ্ণকায় জোড়া ধনুকান্তি শোভিত আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রূভঙ্গিনী। চিপিটাকার ক্ষুদ্র মণিপুরী নাসোপারি স্বুবর্ণ বাঁটিযুক্ত চশমাধারিণী, কৃষ্ণরেখা বিশিষ্ট চেটাল চৌড়া দন্তপাতি ধারিণী, দীর্ঘ প্রস্থ প্রায় সমশরীর আয়তনী, পদযুগল ষ্টকিং সহ লেডী বুটে আবরিণী, শ্বেত মাকাল পরাজিত দিব্য আঙ্গিনী. কোকিল বিনিন্দিত বাক্য-সুধা কাকস্বরে বর্ষিণী, নানা ফাঁদে নানা ছাঁদে প্রেম ফাঁদ পাতিনী, বক্ষস্থল হেলাইয়া কর্ণ দুল দোলাইয়া গোলাকার আঁখি গোলমালে ঠারিয়া, "আমি তোমারই" ইঙ্গিতে জানাইয়া কার্য উদ্ধার-কারিণী. হাকিমানের সৌভাগ্য স্পর্শমণি। বিদ্যায় বীণাপাণি, ক্ষমতায় সিংহবাহিনী, প্রকাশ্যে পতি-বিয়োগিনী গোপনে নিত্য নব সিমন্তিনী, ধনে অলক্ষ্মীর সহচরী, বুদ্ধি বিবেচনায় পাগলিনী, হটু-নটুর ভগিনী, কার্ত্তিক গণেশের জননী, জীবনের চিরসঙ্গিনী—রুক্মিণী. দেবাদিদেব মহাদেব—বোম্ ভোলানাথ, নীলকণ্ঠ, অনাথ, নাথ, দীনবন্ধু, দীননাথ, অনাথবন্ধু. পরেশনাথ, সাগর সিন্ধু, ইন্দু বিন্দু, রাধেশ্বর সর্বেশ্বর, রমণী চরণ, কামিনী পদ বল্লভ দুর্লভ রাজরাজেশ্বর মহাপ্রভুব প্রণয়িনী অন্তঃপুরবাসিনী, ঘোর আমোদিনী, —সে চরণ কমলে শত শত দণ্ডবৎ। সে যুগ পদে হাজার হাজার নমস্কার। (পৃ. ১১০)

স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেগম ঠাকরুণকে অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নিগড় াঁধতে হয়েছে। সময় বুঝে একজনকে রাখতে হয়েছে, অন্য জনকে ছাড়তে হয়েছে। কেউ কেউ আবার আগে মজা লুটে পরে দাগা দিয়েছে।

তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন 'শিক্‌লিকাটা টিয়ে' ও উকিল বাবু। দাগাদারী সোনা বিবির সঙ্গে অসরল আচরণ করে থাকলেও বেগমকে দাগা দেয় নি হাকিম ভোলানাথ ও ঋতুরাজ ভোগের বিনিময়ে বরাবর উপকার করতে চেয়েছে। বেগম কত চালাক তা বোঝাতে গাজী মিয়াঁর মন্তব্য: তিনি 'চাতুরীর বীচি পোড়াইয়া খাইয়াছেন' (পৃ. ২৮০)। শিক্‌লিকাটা টিয়ে নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে পত্রে আর্তনাদ তুলেছে:

> অরে পাষাণী। ধান ছুঁয়ে, দুর্ব্বা ঘাস ছুঁয়ে, আমার মাথা আর মুণ্ড, মাথা ছুঁয়ে কি বলেছিলি রে! একটি কলার অর্দ্ধেক তোর মুখে, আর অর্দ্ধেক আমার মুখে পুরে দিয়ে কি কলা খাওয়াইয়াছিলি রে! খড়ম জোড়া কৈ, মাথায় বাড়ি দেও। হৃদয়ের রক্ত, ফেঁপসার বাতাস, নাড়ীর রস, পাকস্থলীর জল, কিছু নাই। ওরে কিছু নাই। আন্ ছুরি দেখ চিরি, দেখ চিরি! কিছু নাই! কিছু নাই। এই জন্যই বুঝি দাদা বলে ডেকেছিলি! রক্তে রক্তে পশমে পশমে মিশেছিলি! কে বলে অবোলা? তুই হরবোলা। (পৃ. ১৬৭

হাকিমানের দল 'হুড়পাড়' করে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। বেগম তখন পর্দার অন্তরালে অন্যদের অজান্তে উকিল বাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনায় মগ্ন। ব্যস্ত হয়ে পর্দার আড়াল থেকে মিনতি জানান:

> একটু অপেক্ষা করুন। বোতামকটা লাগিয়ে নিই।
>
> না, না, আর বোতাম লাগান সহ্য হয় না। অদর্শনে কথা ভাল লাগে না। এই কথা বলিয়া ঋতুরাজ বাবু পর্দা উঠাইতে অগ্রসর হইলেন। (পৃ. ১৮৬)

ঋতুরাজ যে অপ্রত্যাশিতরূপে অসঙ্গত আচরণ করেছেন তা নয়। কারণ গাজী মিয়াঁর এ কথা অজানা নেই যে, ঋতুরাজ বাবুর বাসায় বেগম সাহেবের যাওয়া আসা আছে—'নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ক'দিন ক'রাত্রে বেগম সাহেব ঋতুরাজ বাবুর বাসায় পায়ের ধূলি ফেলিয়াছেন। একদিন গায়ের বডী, পায়ের বিনামা পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।' (পৃ. ৬৭) হাকিম ভোলানাথকে দিয়ে কাজ আদায় করিয়ে নেবার মতলবে বেগম:

খুব মিহি সুরে আস্তে আস্তে গোটা গোটা অক্ষরে বলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসির গোলাপী আভার রসময় সুরে গায়ের রেশমি মিহি চাদরখানা পরিপাটীরূপে বুকের উপর সটান করিয়া দিয়া, মাজাটা দক্ষিণে বামে দুই তিনবার নাড়াচাড়া করিয়া চক্ষে চক্ষে, মুখে মুখে, নাকে নাকে, ভ্রূতে ভ্রূ মিল করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব হাসির সহিত সংযোগে হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার অনুগ্রহেই আমার সকল জীবন, ধন, জাতি, খ্যাতি, শত্রু, মিত্র, জমিদারী সকলি আপনার দয়া অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর'। (পৃ. ৩৯)

ঋতুরাজ বাবুর হৃদয়ে প্রবেশ করবার জন্যও এই একই কৌশলের প্রয়োগ ঘটে। কাজের কথাটি মুখ খুলে বলবার আগে ভূমিকা হিসেবে যে ভাবভঙ্গী করেন তার বর্ণনা এই রকম :

বেগম মুখখানি ভারীর উপরে আরও ভারী করিয়া, ওড়নাখানা গায়ের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া, বুক মাজা দুই তিনবার নাড়া দিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, নিস্তব্ধভাবে গালে হাত দিয়া বসিলেন। (পৃ. ৩৫২-৩৫৩)

এ রকম অবস্থায় কখনও কখনও কঠিন-হৃদয় ঋতুরাজ বাবু রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত করে মুখে বলেন বটে 'বুঝেছি, বুঝেছি—(সুরের সহিত) তোমার যত ছলনা' (পৃ. ১৯০)। কিন্তু যেই মাত্র বেগম সাহেব বলিলেন,

'আসুন আসুন! কোথায় বসাই? কোন্ আসনে স্থান দেই? সকল প্রকার আসন এখানে উপস্থিত, যে আসনে ইচ্ছা, তাহাতেই উপবেশন করুন।' 'তা ত দেখতে পাচ্ছি—পদ্মাসন, কাষ্ঠাসন, কোচাসন, চেয়ারাসন, আরও আসন, হৃদয়াসন, বহু আসন, বর্তমান—কোন্ আসনে উপবেশন করি?' যাতে ইচ্ছা, যাতে অভিরুচি, যাতে মন বসে, যাতে দেলখোস হয়, যাতে আরাম বোধ হয়—সকলি হাজির।" (পৃ. ৬৮)।

উকিল বাবুকে কাবু করবার প্রক্রিয়াটি আরো সরাসরি আক্রমণাত্মক। যেমন :

বেগম সস্নেহে নরমূর্ত্তির গলা ধরিয়া দুই গণ্ডে তিন চুমা দিয়া বলিলেন, 'তা হবে না, কথায় হবে না। আমার মাথা ছুঁয়ে শপথ কর যে

সোনা বিবির পক্ষে যাব না, দশ হাজার টাকা দিলেও যাব না, কখনই
ভেড়াকান্তের মকর্দ্দমায় উকিল হব না।' (পৃ. ১৫৯)।

গাজী মিয়াঁর অসংবৃত রঙ্গরোষ প্রধানতঃ বেগমের শরীরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মেদবহুলা বেগম সাহেবা যে ওজনে ও আয়তনে অসামান্য এই কথাটা বোঝাবার জন্য গাজী মিয়াঁ বেগম সাহেবার পাল্কী বাহকদের দুর্দশার মর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। বেগম ঠাকরুণঃ

ত্রস্তপদে...পালকিতে উঠিয়াই পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। চারজন মজবুত বেহারা অতিকষ্টে পাল্কী ঘাড়ে করিয়া, ঘাড় নোয়াইয়া দ্বার বিশেষে বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে চলিল। (পৃ.১০৫)।

'শিকলি কাটা টিয়ে' বেগমকে পরিত্যাগ করে শিমলা চম্পট দিয়েছে। তখন গাজী মিয়াঁ বেগমের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের এক প্রাণবন্ত নাট্যচরিত্র রচনা করলেন:

যাহা হউক, শ্রীমতির মুখের উক্তি শুনুন—কান পাতিয়া শ্রবণ করুন... 'হা বদ্‌বখ্‌ত। বদ্‌বখ্‌ত কম নছিব। জালেম! বে ওফা কমিন, কমজাত, নিমকহারাম! রে বিশ্বাসঘাতক, কপট ধাম্মিক, নরাধম, পিচাশ! গরু, মুরগী, শূকরখোর নাস্তিক! ওরে ডেভিল ড্যাম ফুল! ওরে নির্দ্দয, নিষ্ঠুর, পাথর কলজে—নিরেট পাথর। তোর মনে এই ছিল? ওরে পাষণ্ড, দুরাচার বদমাস, জুয়াচোর—তোর মনে এই ছিল? হাঁ রে? পাজী হারামখোর, শেষে এই করলি? · আগে হাতে হাতে চাঁদ তুলে দিয়ে শেষে চম্পট। ওরে লম্পট। লম্পট শিরোমণি? রমণী প্রাণে আঘাত করে একেবারে গঙ্গাপার। অবলা প্রাণে সাত বাণ্ডিল সূচ, ১৭ বাণ্ডিল আল্পিন বিঁধাইয়া হুগলি নদী পার। দুপায়া ব্রিজ পার!...হায়রে! কিছু বাকী নাই। কিছু বাকী রাখি নাই। ভুলেও গোপন করি নাই। যা জান্‌তেম, যা ছিল---যত্ন করে যা রেখেছিলাম, সকলি দিয়ে ফেলেচি! কিছু রাখি নাই। (গদ্ গদ্ স্বরে) ওরে কিছু রাখি নাই—সোনার স্বামীকে যা দেই নাই—সে যা পায় ধরে পায় নাই, তাও সেদে, সাধ করে পায় ধরে হাতে তুলে দিয়েছি। ওরে! বেহায়া পেটুক! দুই হাতে মুখ ভরে—গালপুরে

খেয়েছো। আর কি আছে? এখন খালি ভাঁড়, মধুশূন্য—শূন্য হাঁড়িকে কে জিজ্ঞাসা করে, তাই উড়ে গিয়েছো?...তনু নিলে, দেহ নিলে, প্রাণ নিলে, ধন নিলে, আর যা কেউ পায় নাই তাও নিলে, শেষে লঙ্কা দেখিয়ে, মর্ত্তমান রম্ভা দেখিয়ে, শিক্‌লি কেটে উড়ে গেলি? রে টিয়ে কাটা শিকল! তুই নিরেট জিঞ্জির। তোর হৃদয় নাই, তোর প্রাণ নাই! তোর কিছুই নাই, তুই কামারের হাতুড়ীর ঘা-খেক লোহা! কত সাধলেম, কত সাধ্য সাধনা কল্লেম, কত মিনতি কল্লেম, পায়ে ধল্লেম, মাথার চুল পায়ে ঘসে ঘসে কটা করলেম, বুকে মুখে বুক মুখ মিশালেম, কতবার লম্বা চৌড়া দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ প্রকারের নিশ্বাস ফেল্লেম, আর বশে আসল না। আর হৃদয় পিঞ্জরে বসল না। আগুন পোড়া বুকের কত প্রকারে তা দিলাম পাখি আর পোষ মানল না। দুবাটি দুধ দেখালাম, পোড়ার মুখ ফিরেও চাইল না।...(পৃ.৬০-৬১)।

বেগমের এই প্রবল বিলাপকে গাজী মিয়াঁ আরও তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত টেনে লম্বা করে তারপর ক্ষান্ত হয়েছেন। দ্বাদশ নথিতে বেগম হিন্দু ব্রাহ্মণ ভ্রাতাদের সঙ্গে একজোটে হরিনাম কীর্তনের আয়োজন করেন। এবার গাজী মিয়াঁ কারো আড়াল থেকে নয়, সরাসরি নিজেই টিকাভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করলেন:

কি মজা! মরে যাই রে বেগম! ধর্ম্ম-গানে আঁখি ঠারো কেন রে বেগম? ইহারা তোমার কে? গায়ে গায়ে মিশামিশি, পাছা-পিঠ ঘেঁসা-ঘেঁসী কেন রে বেগম? ঐ সুন্দর বাবুটি, আর তোমার বাম পাশের কাল বাবুটি কে হয় বেগম? ছি ছি! আবার পীরিতি প্রণয়মাখা আঁখিঠার। ওঃ! ছি ছি! এ না ধর্ম্মের গান? তওবা, তওবা; হাজার তওবা! এই ধর্ম্মের গান!—ঐ মাথা নাড়িয়া মাজা দোলাইয়া, নূপুর বাজাইয়া, খোলে ঢোলে আঘাত করিয়া,—ও দুটি তোমার কে।...এ ক্রিয়ার নাম কি? মাঝে মাঝে হরিবোল হরির বোল ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে,—সে কোন্ হরি? হিন্দুর হরি? না তোমাদের হরি! হিন্দুর হরি তো সাকার। সে হরি ত নবযৌবনী মনোমহিনী

কামিনী ছিল, সে হরি ত কদম্ব-ডালে বসিয়া বাঁশরী বাজাত। হে হরি ত পশ্চিম অঞ্চলে নন্দঘোষের খড়ম অথবা নাগরা জুতা মাথায় করিয়া বহন করিত। সে হরি ত পেটের জ্বালায় মাখন চুরি করিয়া খাইত। চোর অপরাধে নন্দঘোষ দড়াদড়ি দিয়া থামের সঙ্গে বাঁধিয়া আচ্ছা করিয়া চাবুক সই করিত। সে হরি যে স্ত্রীলোকের কাপড় চুরি করিয়া গাছে উঠিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকের ঘরের তোলা কাপড় নয়, পরনের কাপড় চুরি করিয়া গাছের এক আগডালে উঠিয়া থাকিত। তাদের কাপড় ছিল না, তাইতে নেংটা হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িত----তাহার পরেই কাপড় চুরি যায়। দেখত বেগম, স্ত্রীলোকের তখন কি দুর্দ্দশা হয়! একি সেই হিন্দুর হরি? যে হরি আপন মাতুল আয়ান ঘোষের স্ত্রীকে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইত, একি সেই হিন্দুর হরি যে হরি সখা বিসখা বৃন্দেদিগের ঘরে ঢুকিয়া কত আব- দার কর্ত্তো, যার জ্বালায় গোয়াল পাড়ার স্ত্রীলোক রাত্রে ঘুমাইতে পার্ত্তো না, একি সেই হিন্দুর হরি? না, তোমার ধর্ম্মের অন্য কোন হরি? বল, বল, তোমার কালামুখে শুনি, এ কোন্ হরি? অমন করিয়া হাত ঘুরাইয়া মাথার উপর আঙ্গুল তুলিয়া হরি বোল হরি বোল কর না। চক্ষু নাই! চক্ষে চশমা দিয়া কি একেবারে অন্ধ হইয়াছ! যে হাতই তোল, বডী আঁটা শরীরে, মাথার উপর উর্দ্ধ ভাবে হাত তুলিয়া অঙ্গুলী ঘুরাইও না। ঐ দেখ। তোমার হাত তোলায়, হরিবোল বলায়----ঐ দেখ তোমার ধর্ম্মমতে ধার্মিক নরেরা, ভ্রাতারা কোন্ দিকে তাকায়? ছি ছি! এ ভাবে কেন? সংকীর্ত্তনে হরিগুণ গানে ত কাহারও মন আঁটা-সাঁটা দেখি না। ওঃ! ছি ছি! সকলেই তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সে চাউনীর ভাব কি? তা ভ্রাতারাই জ্ঞাত আছেন। তোমার হাত তোলা, হরিবোলের ভাব, গায়ের বডী পরনের সাড়ী, চক্ষের চাউনি, জোড় ভ্রূর কাল ভঙ্গিমা, বেহদ্দ বাহার, যেন তন্ন তন্ন করে দেখছেন, আর তালে তালে পা ফেলছেন কিন্তু সংকীর্ত্তনের বোল গোলমালেই গোলে হরিবোল হচ্ছে। (পৃ. ১৮১-১৮২)

৫.১. গ্রন্থকার গাজী মিয়াঁ কে ? ভেড়াকান্ত। ভেড়াকান্ত যে মীর মশাররফ হোসেন 'বিবি কুলসুম'-এ তা খোলাখুলি বলা হয়েছে। না বললেও বোঝা যেত। ভেড়াকান্ত পত্নীপ্রেমিক, সন্তান বৎসল ও রাজানুগত। গ্রন্থরচনাকালে ভেড়াকান্ত ও কুলসুম বিবির দাম্পত্য জীবনের একুশ বছর চলছে বা পরিপূর্ণ হয়েছে। ভেড়াকান্ত সব সময় স্ত্রীপুত্র সহ একসঙ্গে খেতে বসেন। একুশ বছর ধরে তাই করেছেন। (পৃ. ৩২৫)। 'ঈশ্বর পাঁচটি পুত্র দিয়েছেন। পাঁচটি কন্যার মধ্যে মধ্যম কন্যাটির কাল হয়েছে। চারটি আছে।' (পৃ. ৩৩১)। তৃতীয় সন্তান বা প্রথম পুত্রের বয়স দশ বৎসর। (পৃ. ৩৪৩)। সন্তান সংখ্যার আধিক্য যে দাম্পত্য প্রণয়ে কোনো রকম শীর্ণতা বা শিথিলতা সৃষ্টি করতে পারেনি সে কথা বৌ বা কুলসুম বিবিকে দিয়ে একাধিকবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করান হয়েছে। যেমন: দিদি, আমার জীবনে···বিপরীত দেখিলাম। ক্রমে সন্তান সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভালবাসারও সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই বৃদ্ধি···। ক্রমে দিন দিন বেশী আদর যত্ন।' (পৃ. ৩৩১)। বেগম ঠাকরুণও এই মত সমর্থন করেছেন। (পৃ ২৮৩)। ভেড়াকান্ত কৈশোরে যৌবনে ফূর্তি কম করেন নি। অনেক রকম চরিত্র-দোষে কলঙ্কিত হন। বাঁদী বাইজী বারবণিতা কিছুই বাদ রাখেন নি। 'কোন সময়ে মানুষের মধ্য হইতে একবার উঠিয়া গিয়া পশু দলে মিশিতে ছিলেন।··· ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর ঐ স্ত্রীর প্রাসাদে সে-পথ হইতে ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া উচ্চ ও পবিত্র ভাবে সৎপথে চালিত হইয়াছিল। এই স্ত্রীই তাঁহার উন্নতির দৈব কারণ।' (পৃ. ৩৭৪)। ভেড়াকান্তের সাহিত্যিক জীবনেও এই বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন অনেক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস।

> 'ঐ বিষয়টা লিখতে চেয়েছিলে, কৈ লিখলে না।' 'ঐ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন?'... 'নাম রাখিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই।' 'পদ্যটার আধাআধি লিখে আর লিখলে না?' স্ত্রী এই সকল কথা কহিয়াই কি ক্ষান্ত থাকিতেন? তাহা নহে।··· কাগজ দোয়াত কলম প্রদীপের তৈল বাতি সমুদয় স্বহস্তে জোগাড় করিয়া দিয়া চুপটি করিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। (পৃ. ৩৭৪)।

যাঁরা কেবল বিজ্ঞাপন দেখে মীর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রসারিত করার পক্ষপাতী, তাঁরা এই উদ্ধৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ভেড়াকান্ত কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে রাত জেগে সাহিত্য-চর্চা করতেন। গভীর রাতে আলাপ-রতা স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন:

> ঐ দেখ! ছোট ছেলে নড়াচড়া করে উঠলো। তুমি ওকে কোলে করে ঘুমাও, অনেক রাত হয়েছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে জেগে কাজ নেই, তোমার চক্ষের বেরাম বেশী হয়েছে, রাত জাগলে আরও বাড়বে। গীতাভিনয়ের পালার শেষ অংশটা লিখতে বাকী আছে—রাত্রেই লিখে শেষ করবো। তুমি কাল শুনো। (পৃ. ৩৩৬)

ভেড়াকান্ত খুব জনপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। সোনা বিবি স্বীকার করেছেন যে 'ভেড়াকান্ত আমার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। খোদা তার ভাল করুন! সে সুখে থাক। এত লোকের নিকট দুঃখের কান্না কাঁদলাম—কেউ শুনল না। কেবল ভেড়াকান্ত আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করছে।' (পৃ. ৮২) তুড়ুক পাছাড় মনি বিবির মোক্তার। তা সত্ত্বেও 'বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি ভেড়াকান্তের অহিত অনিষ্ট তুড়ুক পাছাড় কিছুতেই মনের সহিত করবে না।' (পৃ. ১৪৪)। অরাজকপুরের নাজিরের নাম কট্‌কটে বাবু। স্বভাবতঃই তিনি হাকিম পক্ষের লোক। কিন্তু 'কট্‌কটে বাবু ভেড়াকান্তের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন।' (পৃ. ৩৪৬)। ভেড়াকান্তের মামলার শুনানীর দিনে 'ভেড়াকান্তের জন্মস্থানে পাড়া-প্রতিবেশী যাবতীয় মুসলমান বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীলোক রোজা নামাজ ঈশ্বরের উপাসনা যথাসাধ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। নচ্ছারপুর জিলার মুসলমানগণ ভেড়াকান্তের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করিলেন। আরজকপুরে ভেড়াকান্তের স্ত্রী কন্যা পুত্র ভ্রাতা সকলেই রোজা, নামাজ, উপাসনা, যথাসাধ্য দান ধ্যান আরম্ভ করিলেন।' (পৃ. ৩৮৮)। ভেড়াকান্তের জনপ্রিয়তা এতদূর পর্যন্ত জাহির ছিল যে, যেদিন আদালতে 'ম্যাদের' সংবাদ ঘোষিত হয়, সেদিন 'বারবিলাসিনীরা পর্যন্ত দলে দলে আসিয়া কাচারির আঙ্গিনার পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিল। পুরুষ স্ত্রী সকলেরই চক্ষে জল। ভেড়াকান্তকে সকলেই ভালবাসিত।' (পৃ. ৩৪২)।

নিজের ছদ্ম নাম নিরূপণে একটি হীন চতুষ্পদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেও গাজী মিয়াঁ গ্রন্থের মধ্যে স্বেচ্ছায় কোথাও নিজের চরিত্র খাটো করে আঁকেন নি। আলোচ্য সংস্করণের ভূমিকায় লেখক যখন বলেন যে, 'গাজী মিয়াঁ নির্ভীক আত্মসমালোচক। নিজেকে কিংবা নিজের স্ত্রীকেও ক্ষমা করেন নি। সুতরাং অপর লোকের ত কথাই নেই। তখন আমরা রীতিমত বিস্মিত হই। গাজী মিয়াঁ আদৌ আত্মসমালোচক নন। তিনি অন্যের সমালোচক। তাঁর সমালোচনা শত্রুতামূলক, ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত, দলগত স্বার্থপ্রণোদিত। পতিগর্বে তাঁর পত্নী বিমোহিত, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতাপে হাকিমান দল ও বেগম ঠাকরুণ বিচলিত, জনপ্রিয়তায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সাহিত্য সাধনায় অক্লান্ত, এককালে বিপথে গমন করে থাকলেও হালে অতি শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী, হিন্দু আমলের চক্রান্ত থেকে মুসলিম জমিদারের রক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই তিনি করতে চান না, নিজের সম্পর্কে এই সব এবং আরো অনেক ভালো ভালো কথা তিনি নিজেই প্রচার করেছেন। কিন্তু তাই বলে গাজী-মানসের ক্ষুদ্রতা ও গ্রাম্যতা গ্রন্থের মধ্যে কোথাও উন্মোচিত হয়নি, এমন নয়। তবে তা ঘটেছে বর্ণনাকারী মীর-মানসের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্য, গাজী মিয়াঁ আত্মসমালোচক ছিলেন এই জন্য নয়। গাজী মিয়াঁ সমাজসমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, স্বনির্বাচিত উচ্চবেদী থেকে সংস্কার সাধনের নানা রকম পরামর্শ দিয়েছেন। একটা মহৎ নীতি প্রচারের গাম্ভীর্য নিয়ে গাজী মিয়াঁ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন: 'হিন্দু খৃষ্টানের দেখাদেখি পবিত্র এছলাম সমাজক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা মহা বিষবৃক্ষের কন্টকময় অঙ্কুর উৎপাদনের সূত্রপাত হইয়াছে।' (পৃ. ১৭৯) আধুনিক পাঠক অবশ্যই এই সমালোচক প্রচারকের চিন্তাধারাকে নিম্ন মার্গীয় বলে বিবেচনা করবেন। গাজী মিয়াঁর নীতিবোধ কোন্ মানদণ্ডে পরিমাপ করবার যোগ্য তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় লাল আলু সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তিতে। ভেড়াকান্ত ও সোনা বিবি লাল আলুর কাছ থেকে এই

'খোদার কসম' আদায় করে নেয় যে, কুরআন শরীফ ছুঁয়ে লাল আলু মনি বিবির উপর স্বামী স্বত্ব দাবী করে যে মামলা দায়ের করেছে তা যেন সে কিছুতেই তুলে না নেয়। প্রলোভনে পড়ে লাল আলু মামলা তুলে নিয়েছে। গাজী মিয়াঁ সক্রোধে স্নুনীতির দোহাই দিয়ে বলেছেন, 'তাই দেখুন। মানুষের কর্তব্যজ্ঞান দেখুন। সত্যবাদিতা দেখুন। ধর্মেও বিশ্বাস দেখুন। (পৃ. ২৭৬)

৫.২. বেগম ঠাকরুণ ভেড়াকান্তকে হাজতে পাঠাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন কেন? উভয়ের মধ্যে যে হিংস্র বিদ্বেষ ভাব সর্বক্ষণ ধিকিধিকি জ্বলছে তার উৎসমূল কোথায়? ভেড়াকান্ত কি করেছিল যার জন্য বেগম ঠাকরুণ নিজের রূপযৌবন ও ধনদৌলতের পসরা সাজিয়ে নানা ছলে হাকিমানদের তোয়াজ করেছেন যেন তাঁরা ভেড়াকান্তকে জন্মের মতো শায়েস্তা করে দেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভোলানাথ, ঋতুরাজ ও উকিল বাবুকে বেগম ঠাকরুণ কি উপায়ে বিমোহিত করেন, তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি, কিন্তু বেগম ঠাকরুণ কেন গাজী মিয়াঁকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন তার কারণ কাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য রূপে জাজ্জ্বল্যমান না, হওয়ায় বেগম ঠাকরুণের হিংস্রতা কখনই শিল্পগত স্বাভাবিকতার প্রতীতি জন্মাতে সমর্থ হয় নি। গ্রন্থে যে সকল কারণ বর্ণিত হয়েছে আমরা একে একে তা উল্লেখ করছি।

বেগম ঠাকরুণের মতে অবাজকপুর 'জঙ্গলময় অসভ্য দেশ' (পৃ. ৪০)। সম্ভবত অনুদার গ্রাম্য পরিবেশে এই স্বাধীন রমণীর জীবন নানা সমালোচনার পীড়নে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তার ওপর ছিল গ্রাম্য দলাদলি, জমিদারীর শরীকে শরীকে লড়াই। বেগম ঠাকরুণকে অপদস্থ করতে হয়ত ভেড়াকান্তও চেষ্টা করেছে। 'ভেড়াকান্ত আমাকে বড়ই লাঞ্ছনা দিয়েছে। আমার মনের আগুন জ্বালিয়ে সরে পড়েছে।' (পৃ. ৬৯)। কখন কি উপায়ে তা কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয় নি। ক্ষোভের একটি কারণ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতা লাভ করেছে দাগাদারীর নিকট বেগমের একটি মিনতির মধ্যে—'ভেড়াকান্ত ত এখন বাড়ীতে নাই। তার স্ত্রীর কাছ থেকে কতকগুলি কাগজ কৌশল করে

হাত করে এনে আমাকে দিতে পার কি না? অতি কম হলেও আমার হাতের লিখা তিনশত চিঠি কোন গতিকে ভেড়াকান্তের হাতে পড়েছে। আরও কার কার চিঠি। সেই সকল চিঠি, আর একখানা পুস্তকের কপি হাত করতে পার, তাহলে প্রথম সময় এক কাজ করেছিলে মধ্য সময় এই কাজ করো। শেষ সময় আর কোন কাজ করো বা না করো, তোমার দাবী অনেক।' (পৃ. ৩৮৩-৮৪)। এই নালিশগুলো সবই কেমন যেন মামুলী ধরনের এবং অপূর্ণাঙ্গ। এ-রকম মনে হওয়ার কারণও রয়েছে। 'বিবি কুলসুম'-এর উল্লেখ অনুযায়ী ১২৯১তে মীর মশাররফ হোসেন দেলদুয়ার আসেন শ্রীমতি করিমন্ নেসা সাহেবার ষ্টেটের ম্যানেজার হয়ে। করিমন্-নেসা সে দিন মীর সাহেব ও মীর পরিবারের প্রতি যে বিশেষ স্নেহশীল ছিলেন তার স্বীকৃতি 'বস্তানী'তেও আছে। (পৃ. ৩২৪)। মনিব ও কর্ম-চারীর মধ্যে এক গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্পষ্টতই পরে কোন এক সময়ে সে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। মীর সাহেব মনিব পাল্টেছেন। হয়ত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। ঠিক কখন এবং কেন আমরা জানি না। গাজী মিয়াঁ কি কর্ম করে বেগম ঠাকরুণের 'মনের আগুন জ্বালিয়ে' সরে পড়লেন, কোন্ সুযোগ ও কি উদ্দেশ্যে বেগমের চিঠিপত্র সরালেন 'পুস্তকের কপি'তে কি কি লিখেছিলেন, আরো গুরুতর কিছু করেছিলেন কি না, সে সব কথা খোলাসা করে না বলাতে বেগম ঠাকরুণের আক্রোশটা আমাদের কাছে এক তরফা মনে হয়েছে। যেন সকল অনিষ্ট সাধনের মূল বেগম ঠাকরুণ, সকল হিতকারী কর্মের উৎস গাজী মিয়াঁ।

হাকিমের দল গাজী মিয়াঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন এই কারণে যে গাজী মিয়াঁ 'ভারী ধূর্ত', উপরে লেখালেখি করে স্থানীয় বিচারকদের কাছ থেকে সরিয়ে অন্যত্র তুলে নিয়ে যায়। (পৃ. ৬৯)। হাকিমদের যাবতীয় কেলে-ঙ্কারীর কথা 'মধুবনী আর ধন্বন্তরী' কাগজে ছেপে দেয়। (পৃ. ২৫৩, ১৩১)। গাজী মিয়াঁ আরো একটি দূরাগত কারণের বর্ণনা দিয়েছেন—'স্থানীয় জমিদার জ্বালাতন নেছা ভেড়াকান্তের পরম শত্রু। জ্বালাতন নেছার চির ভালবাসা বেগম সাহেব। বেগম সাহেবের ক্ষমতা অসীম। হাকিমান

মহলে খুব আদর। জালাতন নেছার বিশেষ উপরোধে বেগম সাহেব ভেড়াকান্তকে জব্দ করিতে, জেলে পুরিতে মহা পণ করিয়াছেন।' (পৃ. ৭৭) বেগমের বিরুদ্ধে ভেড়াকান্তের স্ত্রীর অভিযোগ এই রকম:

> বেগম! তোর কি মন্দ আমরা করেছিলাম। তোর কি ক্ষতি করেছিলাম যে, তুই এমন করে জিয়ন্ত মানুষ কৌশলে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিস্।---তোর জাতি ধর্ম মান, সে রক্ষা করেছে। তোর যথাসর্বস্ব যেত, জ্ঞাতিরা লুটে নিত; আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে তা রক্ষা করেছে।—তুই কার নয়। মার নয়, বাপের নয়, স্বামীর নয় খোদাতালার নয়। যার পরকালের ভয় নাই, ধর্মে যার ভক্তি নাই, সৎ ইচ্ছায় যার মন নাই, ঠকান কথা ছাড়া যে ভাল জানে না, মন্দ পথ মন্দ রাস্তা ছাড়া ভুলেও ভাল পথে পা ফেলে না, ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে যে পর্দার ধার ধারে না, হাট-বাজার, ঘাট–বাগান যে মানে না, তার আবার নারী ধর্ম কি? তার আর অন্তরে মায়া মমতা কি?
>
> তুই টাকা পয়সা ঠকিয়েছিস্, খোদার কাছে নালিশ করেছি। আমরা সরল মনে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই ঠকেছি। খোদার দরবারে নালিশ করেছি, তোর কি অনিষ্ট করেছি, তা কি তুই বলতে পারিস না দেখাতে পারিস? (পৃ. ৩৫০, ৩৬০)।

সমগ্র গ্রন্থে গাজী মিয়াঁ নিজেকে এর চেয়ে বেশী ছোট বা দোষী বলে আঁকতে চাননি। ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় রসসৃষ্টির প্রয়োজনেও নয়। এতে ক্ষতি হয়েছে দুটো। এক, উপন্যাসের প্রধান দুশ্চরিত্রা বেগম ঠাকরুণের শিল্পগত গঠনপ্রকৃতি যথেষ্ট রূপে সুসংবদ্ধ হতে পারে নি, তাঁর কোনো কোনো ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড অহেতুক এবং অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়েছে। দুই, গাজী মিয়াঁর সততা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে; কারণ বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় গাজীর মানসিকতার যে ছাপ পড়েছে তা নিঃস্বার্থরূপে সরল বা আদর্শপ্রণোদিত এমন কখনই মনে হয় না। বরঞ্চ আমাদের মনে যে সিদ্ধান্ত দানা বাঁধতে চায় সে হলো এই যে, অবশ্যই বেগম ঠাকরুণ ভেড়াকান্তকে ফাটকে আটক করবার ব্যবস্থা করেন এবং কারারুদ্ধ হওয়ার

এই মর্মান্তিক যন্ত্রণাই গাজী মিয়াঁকে 'বস্তানী'র মধ্যে বেগম ঠাকরুণকে লালসাপ্রদীপ্ত পাপীয়সী রূপে অঙ্কিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৬.১. জমিদার অত্যাচারী জীব, বর্তমানে এই ধারণা আমাদের চেতনার এক স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। জীবনে বা সাহিত্যে জমিদার পীড়িত বা লাঞ্ছিত হলেই আমরা আনন্দিত হই এবং পীড়নকারীর সদ্বি-বেচনা, সাধু উদ্দেশ্য ও সত্যদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করি। আমাদের চেত-নার এই নতুন পিয়াস 'বস্তানী' এক বিকৃত উপায়ে চরিতার্থ করতে প্রয়াস পেয়েছে। এই গ্রন্থ যদি দর্পণ হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে এই বৃহৎ দর্পণখানা নিতান্তই সস্তা, সেকেলে ও গ্রাম্য। এখানে যে নমুনা প্রতিফলিত হয়েছে তা অদ্ভুত ও বিকৃত। যেহেতু বস্তানীর মধ্যে কয়েকজন মহিলা জমিদারের গাত্রচর্ম উৎক্ষালিত করা হয়েছে, অমনি গ্রন্থের সম্পাদক, বিচারক, ভূমিকালেখক সকলেই গাজী মিয়াঁর সমাজ সচেতন গণদরদী মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের বশীভূত হয়ে পড়েছেন। আমরা হই নি; কারণ বস্তানীর জমিদাররা দরিদ্র দেশবাসীর ওপর কোনোরকম অত্যাচার উৎপীড়ন করেন না। করলেও 'বস্তানী'তে গাজী মিয়াঁ সে কথা বলতে চাননি। এঁদের অন্দর-মহলের আপন লোক গাজী মিয়াঁ মফঃস্বলের এই জমিদারদের অন্তরঙ্গ প্রাকৃত জীবনের যে উলঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন সেটা মূলতঃ তাঁদের পারিবারিক কলহের, প্রজাপীড়নের নয়; ব্যক্তিগত জীবনের নাগরালী ও বেহায়াপনার, দরিদ্র চাষীমজুর শোষণের নয়। গাজী মিয়াঁর সকল বক্তব্যের সার হলো, পুরুষ জমিদারগণ নিজে-দের লালসা মেটাবার জন্য টাকার বিনিময়ে মেয়েলোক সংগ্রহ করেন, বিধবা বেগমরা মাসোহারা দিয়ে নিজেদের অধীনে পুরুষ কর্মচারী নিযুক্ত রাখেন। এই ভাষণ অমূল্য নয়।

'বস্তানী'র অনেক বিষকণ্ডুয়নের মূলে যে গাজী মিয়াঁর ব্যক্তিগত গাত্রদাহ ক্রিয়াশীল ছিল সে সন্দেহ বই পড়বার সময়েও মনে জেগেছে। গ্রন্থ অতিক্রম করে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে সে সন্দেহ আরো পাকা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক।

৬.২. বেগম ঠাকরুণ, গ্রন্থে নয়, জীবনে কে ছিলেন? সম্ভবতঃ বেগম করিমন্নেসা। আবদুল করীম আবু আহম্মদ খান গজনবী এবং আবদুল হালীম আবুল হুসাইন খান গজনবীর মাতা। আবুল আসাদ ইবরাহীম সাবির ও খলীল সাবিরের ভগিনী। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হুসাইন, বেগম করিমননেসারই আপন ছোট বোন। বেগম শামসুন নাহার 'রোকেয়া জীবনী'তে লিখেছেন:

> শৈশব হইতে যে জ্ঞানাকাঙক্ষা করীমুন্নিসার মনে আকুলি বিকুলি করিত তাহাকেই রূপ দিয়াছিলেন তিনি দুই পুত্র ও কনিষ্ঠা ভগ্নী রোকেয়ার জীবনে।----
>
> ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দেলদুয়ারে করীমুন্নিসার শ্বশুরালয়। বিবাহের নয় বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হওয়ার পর শিশুপুত্র দুইটির শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে। তাঁহার মুক্ত উদার মন ছেলেদের সুশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেলদুয়ারে ছেলেদের শিক্ষার অনেক প্রতিবন্ধক—এজন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল করীম গজনবীকে তিনি অল্প বয়সে বিলাত পাঠান ও কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল হালীম গজনবীকে কলি-কাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি করাইয়া দেন। সে যুগে এতবড় পাপ কার্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কি কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা কুৎসা করিযাছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। (পৃ. ১৬)

৬.৩. ভূমিকায় 'বস্তানী'কে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের একাধিক সেরা গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। করা উচিত হয়নি।

'বস্তানী'র দ্বাদশ নথিতে এই 'বড় মজার পুস্তক' সম্পর্কে উকিল বাবু প্রশ্ন করেছিলেন, এটা কি 'কমলাকান্তের উত্তর নাকি?' আলোচ্য সংলাপের ভূমিকা-লেখক জবাব দিতে গিয়ে নিজের আলোচনায় ডিকুইন্সিকেও আকর্ষণ করে এনেছেন। তিনি বলেছেন:

> কমলাকান্তের দফতর বঙ্কিমের শেষ বয়সের রচনা। সমগ্র জীবন ব্যাপী সাধনার ফলে সমাজের যে দোষত্রুটি তিনি মানসপটে অবলোকন করেছেন তারই দূরীকরণমানসে সত্যকথা অত্যন্ত শক্ত করে বলবার জন্য ডিকুইন্সি কৃত The Confessions of an English Opium-eater-এর মত তাঁকে আফিংখোর পাগলের ভূমিকাভিনয় করতে হয়েছে। চক্ষু লজ্জায় যে কথা সজ্ঞানে মুখের সামনে বলা যায় না, তদানীন্তন সমাজকে সেই তীব্র কটু ও কড়া কথা শুনিয়ে তাকে শোধরানোর জন্য বঙ্কিমকে অসাধারণ রহস্যরসিকের মত তাজা প্রাণের পরিচয় দিয়ে প্রলাপ বক্‌তে দেখি। এতে তাঁর অপরিসীম সমাজ তথা মনুষ্যপ্রীতিই শতধারায় উৎসারিত হয়ে উঠছে। গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে মীর সাহেবকেও দেখছি সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। (পৃ. ।।/)

কমলাকান্ত আফিম খেত বলেই 'দপ্তর'-এর সঙ্গে 'কনফেশনস্'-এর হরেক রকম মিল বেরিয়ে পড়বে, সাহিত্য এতটা সুনিয়মের বশ নয়। দুটো বইয়ের জগৎ আলাদা, ভাব আলাদা। উদ্দেশ্য আবেদন সবই স্বতন্ত্র। 'কনফেশন্‌স্'এ কোনো 'পাগলের ভূমিকাভিনয়' নেই। ডিকুইন্সি সত্যি সত্যি আফিম খেতেন। অল্প বয়সে কোনো শারীরিক কষ্ট ভুলে থাকার জন্য, এক অর্বাচীন ডাক্তারের পরামর্শে আফিমের গুলি খেতে শুরু করেন। ক্রমশ: এই গুলির মাত্রা চড়াতে থাকেন। শেষে পরিমাণ এত বাড়িয়ে দিলেন যে প্রতিবারেই সেবনের পর একরকম হতচেতন হয়ে পড়তেন। একটা ভয়াবহ অসাড়তা বিশৃংখলা সমগ্র দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। নানা দু:স্বপ্নের উৎপীড়নে স্নায়ুতন্ত্রী সব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তবু খেতেন; কারণ না খেলে যন্ত্রণা নাকি আরো দু:সহ হত। সর্বগ্লানিহর আফিমের কবলে পড়ে কি করে এক অনুভূতিসম্পন্ন সুশিক্ষিত তরুণ তার সত্তার করুণতম বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছে এবং কী ভয়ানক আত্মসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সম্মোহিত চেতনা ক্রমশ: নিজের মুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে, আফিম বর্জন করেছে, 'কনফেশন্‌স্' তারই কারুকলামণ্ডিত এক মর্মস্পর্শী জবানবন্দী। এর সঙ্গে 'দপ্তর' বা 'বস্তানী'র মিল কোথায়?

'দপ্তর'-এর সঙ্গে 'বস্তানী'র যোগসূত্র স্থাপনে গাজী মিয়াঁ প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলেন। সেই উৎসাহে মেতে আমরাও বস্তানী সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত স্তুতিবন্দনার মনোভাব প্রচার করেছি। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অনুকরণে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র নাম উদ্ভাবিত হয়েছে। গ্রন্থপ্রাপ্তির বর্ণনাও এক ধাচের। পার্থক্য শুধু এই যে 'বস্তানী' রক্ষিত ছিল 'মখমল-বিজড়িত' অবস্থায় আর 'দপ্তর'-এর 'কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত'। পাণ্ডুলিপির আচ্ছাদনের মূল্যগত তারতম্য অনুসারে যে গ্রন্থের মানমর্যাদা নিরূপিত হয় না তা বলাই বাহুল্য। 'কমলাকান্তের দপ্তর' সরস বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সঙ্কলন। এখানে কমলা-কান্তের ব্যক্তিত্বের সৌরভই সকল বক্তব্যের প্রাণ। অহিফেন সেবন ছলনা মাত্র। মৌতাতের পর যখন কমলাকান্ত বসে বসে ঝিমোয় তখনও দেশ ও সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিচারদৃষ্টি ও অনুভূতি-শক্তি সুতীক্ষ্ণরূপে জাগ্রত, তাঁর প্রতিটি বক্রোক্তি এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। এসব কথা গাজী মিয়াঁ সম্পর্কে বলা চলে না। গাজী মিয়াঁ যা পছন্দ করেন না, সরাসরি তার দফা নিকেশ করার পক্ষপাতী। যা পছন্দ করেন তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

মিল খোজার চেষ্টা চালালে দ্বিচারিণী মনি বিবির মৃত্যুকালীন প্রলাপের মধ্যে উন্মাদিনী শৈবলিনীর ছায়া লক্ষ্য করা সম্ভব হবে। তবে যে ভাবে মনি বিবি বিকারের ঘোরে লাল আলুর অঙ্গতাপকে অগ্নিকুণ্ড বলে বিবেচনা করেন, লাল আলুর সান্নিধ্য কল্পনা করে নিজ অঙ্গে অগ্নিময় লৌহশলাকা প্রবিষ্ট হচ্ছে বলে অনুভব করেন, সে ভাবে শৈবলিনী প্রতাপকে স্মরণ করে না। শৈবলিনী ও প্রতাপ যে কেবল ভিন্ন ধর্মের তাই নয়, তারা ভিন্ন জগতেরও বটে।

ভূমিকায় সমালোচক বলেছেন: 'এ ছাড়া মনি ও তার কন্যাদের মনের কথা সবজান্তার মতো প্রকাশ করা ও তাদের মনোবাসনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এক মুসলমান ভিখারিণীর আমদানী বঙ্কিমের সীতারাম উপন্যাসের আদর্শানু-সৃত।' (পৃ. ll/০)। 'সীতারাম'-এর শ্রীশান্তি 'বস্তানী'র ছিঁড়িয়া খাতুন

ও তার সাহায্যকারিণী ভিখারিণীর থেকে কত দূরে অবস্থিত তা বোঝবার জন্য ছিঁড়িয়া খাতুনের মনের কথা ও ভিখারিণীর সমস্যা সমাধানের পরামর্শ কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। ছিঁড়িয়া খাতুন তার শৈশবের কৌতূহলকে স্মরণ করছে এই ভাষায়: 'দুই তিন জন সমবয়সী ছুঁড়িদের কাছে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসাও কল্লেম, ওলো। তোর দুধ হয় নাই কেন? বড়দের কাছে, তোর এত বড় কেমন করে হলো?' (পৃ. ২০০)। বয়:সন্ধির দু:খ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে, 'মনের মধ্যে দিন-রাত আগুন বর্ষাচ্ছে, আগুন বয়ে যাচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে, দগ্ধাচ্ছে।' (পৃ. ২০৪)। আরো পরে নিজের মাতা ও লাল আলুর মিলমিশ দেখে 'তখন মনে কল্লেম, ঐ সকল জ্বালা যন্ত্রণা পুরুষের সহিত একত্র বসা-উঠা দেখা-শুনা কথা-বার্তা কইতে পাল্লে বুঝি ভাল হয়।' (পৃ. ২০৫)। তারপর:

> বিয়ে হলো। বিয়ে হোলো—সকলেই বলে বিয়ে হোলো। আমিও দেখি বিয়ে হোলো। কানেও শুনি, বিয়ে হোলো। কিন্তু কি যে হোলো কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। শরীর যেমন আগে ছিল, তেমনি রয়ে গেল। কিছুই পরিবর্তন হোলো না। জ্বালা-যন্ত্রণা যা যেমন যেখানে ছিল, তার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু দেখলাম না,…শুনেছিলাম, স্ত্রীকে স্বামী খুব ভালবাসে, তার একটি কথার প্রমাণও পেলাম না। কত প্রকারে সুখী করে, আমার ভাগ্যে তাও ঘট্‌লো না। কেবল নূতন ভাবের মধ্যে দেখি, কোন কোন রাত্রে আমার বিছানায় এসে চুপটি করে শুয়ে থাকে, কেন শুয়ে থাকে জানি না। তবে যা হুকুম করি, শুনে, তৎক্ষণাৎ তা তামিল করে। যা বলবো তা যে গতিকে প্যারে সে হুকুম মত কাজ করবেই করবে। তোমরা...যদি বিয়ে করে আমার মত সুখী হতে চাও, ভাল একজন ফরমাবরদার চাকর লাভ করতে চাও, তবে মন্দ নয়—কিন্তু সকল কার্য্যে হুকুমের তাঁবেদার নহে। দুই তিনটা কাজের কথা বললে, মুখ ভারী করে বসে থাকে, কিছুতেই হাত পা নেড়ে সরে বসতে চায় না। (পৃ. ২০৬-২০৭)।

ভিখারিণী এই কষ্ট দূর করবার জন্য ওষুধ তৈরী করবার উদ্যোগ করে বলল:

দেখ্। তোর স্বামীর মন যদি এতে ভাল না হয়, তোর দিকে ফিরে না শোয়, তবে জানিস্ তার মনে অন্য কিছু নেই। কোন পীড়ায় ভুগছে। লজ্জায় তোর সঙ্গে কথা কয় না। ‥ যা দিব, যা কর্ত্তে বলবো, যে ওষুধ দি—ঠিক আমার কথা মত কাজ করবি। যদি এতে কিছু কাজ না হয়, তবে নিশ্চয় জানিস্ আসল কল বেগ্‌ড়া। তার অষুধও আমার কাছে আছে। আমি সে বেগ্‌ড়া কলও ভাল করে দেব। তুই ভাবিস্‌নে।' (পৃ. ২০৮-২০৯)।

এসব কথা পড়বার সময় বঙ্কিমকে স্মরণ করা আমরা অস্বাভাবিক বিবেচনা করি।

৭.১. এই গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। যদিও সম্পাদক বলেছেন যে, ‘বর্তমান সংস্করণে মূলগ্রন্থের কোন অংশই পরিবর্তিত বা সংক্ষিপ্ত করা হয় নাই। কেবল দু একস্থানে বানান ও সাধু এবং চলতির মিশ্রণের ওপর ‘সামান্য কলম চালান হয়েছে।' সম্পাদনার এই রীতি অভিনব। ষাট বছর আগে একজন সাহিত্যিকের রচনায় যদি সাধু চলতির মিশ্রণ প্রশ্রয় পেয়ে থাকে তবে তা আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখার অভিভাবকীয় মনোবৃত্তি গবেষকের হৃদয়ে লালিত হওয়া অন্যায়। কলম চালান সম্পাদনা নয়। তার ওপর কলম কোথায় কোথায় চালান হয়েছে তার কোন চিহ্ন সম্পাদিত গ্রন্থে না রাখা একেবারে অসাধুতার পর্যায়ে পড়ে। তবে আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সম্পাদক সাহেব বেশী স্থানে কলম চালাবার অবসর পান নি। গ্রন্থের বহু স্থানে বানানের ভুল ও সাধু চলতির মিশ্রণ অবিকৃত রয়ে গেছে। আমাদের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যেও তার প্রমাণ মিলবে।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী ছাপান বই। পূর্বে একবারই মুদ্রিত হয়েছিল। একাধিক পাঠের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের কৃতিত্ব দাবী করার কোন কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। ভূমিকা লেখকের একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত: ‘আশরাফ সিদ্দিকী এ বইয়ের প্রেস কপি তৈরী করে দেন। এই শ্রম স্বীকারের জন্য আমরা সিদ্দিকী সাহেবের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

৭.২. প্রথম সংস্করণের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা ১৩০৬ সাল। ভূমিকা লেখক, সম্ভবতঃ ব্রজেনবাবুর সংকেত অনুসরণ করে এই তারিখকে ইংরেজী ১৮৯৯ বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ভুল। গ্রন্থ প্রকাশের প্রকৃত তারিখ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০০ সাল। দ্রষ্টব্য : 'কলিকাতা গেজেট,' ৩১শে অক্টোবর, ১৯০০ সাল। বর্তমান সংস্করণে আরও বলা হয়েছে যে এই বই 'বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত' করা হয়। কবে এবং কেন, সম্পাদক সাহেব তা বলেন নি। এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন তারও কোন স্বীকৃতি নেই। সরকার-বিরোধী কোন বক্তব্যের জন্য যে বাজেয়াফত করা হয়নি সে বিষয়ে আমরা একরকম নিঃসন্দেহ। গাজী মিয়াঁ নিরতিশয় রাজভক্ত লোক ছিলেন। মফঃস্বলের দেশীয় হাকিমানদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে থাকলেও গ্রন্থের একাধিক স্থানে ইংরেজ সরকারের অকুণ্ঠ তারীফ করেছেন। যেমন 'দেশীয় হাকিম শুনিলেন না। এত কাকুতী মিনতিতেও তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। ধন্য ইংরেজ। সেই ইংরেজ বিচারপতির কর্ণগোচর হইয়াছে। যেই ভেড়াকান্তের কৌশলে এই অত্যাচারকাহিনী তারযোগে জিলার বিচারক সাহেবের গোচর হইয়াছে, তখনি আদেশ, তখনি হুকুম, তখনি কয়েদ খালাসের আজ্ঞা---ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার। সকলের মুখে ঐ কথা—ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার—একটি ভদ্র মহিলার প্রাণ বাঁচিল।' (পৃ. ৮৬-৮৭)। ওপর ওয়ালারা একথাও বলেছেন যে, 'ভেড়াকান্তকে আমরা বহুদিন হতেই জানি। সে রাজভক্ত বিশেষ আমাদের ভারি ভক্ত। সে থাকতে কখনই বে-আইনি হবার সম্ভাবনা নাই।' (পৃ. ১১৩)। বাজেয়াফত করা হয়নি এমন কথা জোর করে বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। রাজদ্রোহিতার কারণে না হলেও, অশ্লীলতার দোষে এ বই বে-আইনি ঘোষিত হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষ করে পরবর্তীকালে প্রতিপত্তিশালী গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় সে পরামর্শ হয়ত সরকারকে দিয়েও থাকবেন। কিন্তু সে বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য আমাদের হাতে মজুদ নেই।

অপর পক্ষে এই বই দীর্ঘকাল ধরে বাজারে চালু ছিল তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ মীর সাহেবের অন্যান্য বই থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ১৩১৫তে

'আমার জীবনী'তে এবং ১৩১৬তে 'বিবি কুলসুম'-এ মীর সাহেব 'বস্তানীর' কথা বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেছেন। 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন, 'চক্ষু থাকে চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় বৃটিশরাজ সরকারী গেজেটে আমার সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন? দুশ বাহবা দিয়া বস্তানী লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন,—রঙ্গপুর অঞ্চলের কোন ছায়া অবলম্বন করিয়া গাজী মিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের পত্রিকা প্রদীপে---।' (পৃ. ২১, ২২)। গাজী মিয়াঁ একটু বাড়িয়ে বলেছেন। গেজেটের ইংরেজী আলোচনাটি নির্জলা প্রশংসা নয়। তাতে নিন্দা-স্তুতি দুইই আছে। আমরা পরে সম্পূর্ণ রচনাটি উদ্ধৃত করেছি।

৭.৩. অতিরিক্ত ফিল্ডওয়ার্কেও ফসল নষ্ট হয়। আলোচ্য সংস্করণের সম্পাদক সরজমিনে দীর্ঘকাল ধরে পরিশ্রমসাধ্য তদন্ত চালিয়ে করিমন্নেসা ও মীর মশাররফ হোসেনের মামলা-বিরোধ সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থে উল্লেখিত প্রমাণাদির সঙ্গে সেগুলোর কোনরকম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করে, সফরকালে সঞ্চিত সংবাদাদি স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করায়, 'বস্তানী'-বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। দুটো দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক।

মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলে কতদিন ছিলেন, এই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়ে সম্পাদক সাহেব 'বিবি কুলসুম' ও লোকোক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। 'বিবি কুলসুম' থেকে যে উদ্ধৃতিটি তুলে দেওয়া হয়েছে তাতে মীর সাহেব একটা আনুমানিক হিসাবে '১০।১১ বৎসর' এবং 'কম হলেও বারটি বছর' দুরকম কথাই বলেছেন। মীর মাহবুব হোসেন মীর সাহেবের প্রথম নয়, পঞ্চম পুত্র, নবম সন্তান। তিনি নাকি গবেষককে বলেছেন, তাঁহার বয়স যখন মাত্র ৩।৪ মাস তখন তাঁর পিতা টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করেন।' এই প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে মীর সাহেব টাঙ্গাইলে মাত্র আট বৎসর ছিলেন এবং বাংলা ১২৯৯ বা ইংরেজী ১৮৯২তে টাঙ্গাইল ত্যাগ করেন। 'বস্তানী'র মধ্যে টাঙ্গাইল-প্রবাসের কাল সম্পর্কে

যেসব কথা বলা হয়েছে, সম্পাদক সাহেব সেগুলো আদৌ গ্রাহ্য করা প্রয়োজনীয় মনে করেননি। 'বস্তানী'তে বর্ণিত ঘটনাবলীর সমাপ্তিকালে কুলসুম বিবির সন্তানাদির সংখ্যা নির্দেশ করতে গিয়ে ভেড়াকান্ত বলেছে, 'ঈশ্বর পাঁচটি পুত্র দিয়েছেন পাঁচটি কন্যার মধ্যে মধ্যম কন্যাটির কাল হয়েছে।' (পৃ. ৩৩১)। মীর সাহেবের দশম সন্তান কন্যা, নবম সন্তান পুত্র। নবম সন্তানের জন্ম যদি বাংলা ১২৯৯তে হয়ে থাকে, তবে দশম সন্তানের জন্ম ১৩০১-এ কল্পনা করা সংগত হবে না। কুলসুম বিবি আরো বলেছেন যে তাঁরা '২১ বৎসর একত্র আহার করেন।' (পৃ. ৩২৫)। বিবি কুলসুমের বিয়ে হয় বাংলা ১২৮০তে। সে হিসাবেও এই উক্তির কাল ১৩০১ বলে ধরা যেতে পারে। টাঙ্গাইল জীবন সম্পর্কে কুলসুম বিবি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'কি কুক্ষণে এদেশে এসেছিলাম। আজ দশটি বৎসরের মধ্যে একদিন ভালভাবে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকতে পারি নাই। (পৃ. ৩৫৫)। এ সব কথা সত্য হলে ধরতে হয় মীর সাহেব ১২৯১ থেকে ১৩০১ এই দশ বৎসর টাঙ্গাইল অবস্থান করেন। মীর সাহেব যদি ভুল করে থাকেন, তবে সেটা পাকাপোক্ত ভাবে কারণাদি সহ প্রমাণ না করে কেবল গবেষণামূলক জমিজরীপের পারিভাষিক দোহাই দিয়ে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সংগত নয়।

মীর সাহেবের কারামুক্তি ও মামলা-মোকদ্দমার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সম্পাদক সাহেব বলেছেন যে, 'টাঙ্গাইলের প্রবীণ লোকদের মুখে শোনা যায়—এই মামলা পরিচালনার জন্য মীর সাহেবের দ্বিতীয় ভ্রাতা মীর মহতেশাম হোসেন বার-এট-ল নিজে কলিকাতা হতে টাঙ্গাইল এসে-ছিলেন এবং তুমুল বাদ-বিতণ্ডা এবং জেরা করে মুনসেফকে কোণঠাসা করে দেন। মীর সাহেব বেকসুর খালাস পান।' (পৃ. ১।/০—১।৵০)। সরল বিশ্বাসী গবেষক 'প্রবীণ লোকের মুখে' যা শুনেছেন তাকে, ছাপান বইতে যা লেখা রয়েছে তার ওপরে স্থান দিয়ে আমাদের মনে কতরকম সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন, ক্রমান্বয়ে তা বর্ণনা করছি। টাঙ্গাইলে কোন ব্যারিস্টার এসেছিলেন এমন কথা বস্তানীতে কোথাও স্বীকার করা হয় নি। অরাজক-

পুর বা টাঙ্গাইলের হাকিমের নির্দেশে ভেড়াকান্ত হাজতে আটক হন। জামিনের দরখাস্ত দাখিল করা হয় নচ্ছারপুরে বা ময়মনসিংহ শহরে। সে আপীল মঞ্জুর করেন জজ সাহেব, আপিল শুনবার তারিখও ঠিক করেন জজ সাহেব। (পৃ.৩৭২)। টাঙ্গাইল-নিবাসী মুনসেফের কোন ভূমিকা এর মধ্যে নেই। যে ব্যারিস্টার জামিন ও আপীলের দরখাস্ত পেশ করেন তাঁর সম্পর্কে গ্রন্থে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। যাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট উক্তি আছে তিনি কোনোক্রমেই মীর সাহেবের দ্বিতীয় ভ্রাতা নন। ঘটনাটি এই রকম :

> বিবি কুলসুম এ সাংঘাতিক বিপদের সংবাদ দুই স্থানে লিখিয়াছেন একখানা স্বামীর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, অপর একখানা একটু দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতাকে।---দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা সহোদরের সমান; তিনি স্বয়ং জমিদার অথচ তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অতি নিকট সম্বন্ধীয় সকলেই বড়লোক। বিশেষ তাঁহার একটি জামাতা, আপন জামাতা না হইলেও অতি নিকট সম্পর্কীয় জামাতা, একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। এ বিপদে তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যে অনেক লাভ আছে ভাবিয়াই স্বামীর বিনানুমতিতে এই দুই স্থানে পত্র পাঠাইয়াছেন।---
>
> ভেড়াকান্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অন্য ভ্রাতাসহ আপীলের মকদ্দমার তদ্‌বির করিতে জিলায় চলিয়া গেলেন।---ভেড়াকান্ত ও তাঁহার সঙ্গীয় ভ্রাতা রাজধানীতে যাইয়া সেই আত্মীয় ব্যারিস্টার সাহেবকে মকদ্দমার যাবতীয় অবস্থা বলিলেন এবং সময়ে কাগজপত্র দেখাইলেন। ব্যারিস্টার সাহেব মকদ্দমার সওয়াল জবাব করিবেন স্বীকার হইলেন।---নির্দ্ধারিত দিনে ব্যারিস্টার সাহেব উপস্থিত হইয়া ঘটনার আদিঅন্ত জজ বাহাদুরের নিকট ধীর গম্ভীর-ভাবে সুযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলে নিরপেক্ষ বিচারপতি ভেড়াকান্তকে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিলেন।----
>
> ভেড়াকান্ত নচ্ছার জিলা হইতে খালাস পাইয়াও ভোলানাথ ডিপুটির ওয়ারেণ্টের ভয়ে প্রকাশ্যে অরাজকপুর আসেন নাই। অতি সংগোপনে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর ঘরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন।
>
> (পৃ. ৩৭৮-৩৮৮ ও ৩৯১)।

মীর সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিস্টার নন। 'বস্তানী'তে যিনি ব্যারিস্টার, তিনি অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র। মামলার সওয়াল-জবাব হয়েছে নচ্ছার জিলা বা ময়মনসিংহে, জজের এজলাসে; অরাজকপুর বা টাঙ্গাইল মহকুমার মুন্সেফ কোর্টে নয়। আমাদের মনে হয়, আশরাফ সিদ্দিকী শোনা কথায় বিপাকে পড়ে বেজায়গার মুন্সেফকে ভুল লোক দিয়ে কোণঠাসা করেছেন।

৭.৪. এই গ্রন্থ সুসম্পাদিত হওয়ার জন্য যে কাজটি অপরিহার্যরূপে করণীয় ছিল সে হলো 'বস্তানীতে' বর্ণিত প্রতিটি স্থান ও চরিত্রের নাম, কাল ও ঘটনার কথা একটি বিস্তৃত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ দান করা। এই ইনডেক্স বা নির্দেশিকা সাধারণ পাঠকের বড় উপকারে আসত। কারণ 'বস্তানী'র গল্প পরিপাটি করে সাজিয়ে বলবার মতো মনের অবস্থা গাজী মিয়াঁর ছিল না। চরিত্র ও স্থানের জন্য যাবতীয় উদ্ভট নাম যতটা উদ্দামতার সঙ্গে উদ্ভাবিত হয়েছে ততটা শৃংখলার সঙ্গে তারা কাহিনীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কেবল সংখ্যায় বেড়েছে, জীবন্ত সত্তা রূপে গড়ে ওঠেনি। অনেক সময় এমনও মনে হয়েছে, লেখক নিজেই কাকে কখন কি নাম দিয়েছেন তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। কখনো একটা নামই বিভিন্ন স্থানে এত রকমে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করেছেন যে, ব্যক্তি পরিচয় তার মধ্যে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য। ২০ পৃষ্ঠায় যাকে কটা লাহিড়ী বলা হয়েছে, ২২ পৃষ্ঠায় সম্ভবত: তিনিই মাথা পাগলা লাহিড়ী। ৪৬ পৃষ্ঠায় ইনি হয়ে গেছেন মাথা পাগলা বসু, ১১৯ পৃষ্ঠায় মাথা পাগলা রায়। ২০ পৃষ্ঠায় আলকাতরা স্যান্যাল ২১ পৃষ্ঠায় বেড়ে আলকাতরা মাথা ঘরভাঙ্গা স্যান্যাল হয়েছেন, ৫১ পৃষ্ঠায় গিয়ে তিনিই ঘর-ভাঙ্গা ঘোষ। যিনি অরাজকপুরের হাকিমের নাজির, গোপনে ভেড়াকান্তের মিত্র এবং জেল ডাক্তারের বন্ধু, তিনি ৩৬৭ পৃষ্ঠায় কট্‌কটে বাবু, ৩৭৩ পৃষ্ঠায় ফুট্‌ফুটে বাবু, ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ফিটফাট বাবু। অনেকগুলো স্থান ও চরিত্রের উল্লেখ আছে যারা কেবল তাদের নামের বাহার দেখাবার জন্যই একবার করে হাজিরা দিয়ে পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেছে। সাধারণ পাঠক কেন,

অনেক পণ্ডিত সমালোচকও এই অসাধারণ নামের বৈশিষ্ট্যহীন সামান্য লোকের ভীড়ে বিভ্রান্ত বোধ করবেন। কার কি নাম এবং কে কোন্ পক্ষের লোক তা সহজে ঠাহর করতে পারা যায় না। ভূমিকা-লেখকও পারেন নি। মনি বিবির লোকজনকে সব্‌লোট চৌধুরীর মোসাহেব বলে উল্লেখ করেছেন। হাতপাতা থানার পুলিশ ইংসপেক্টরের নাম বলেছেন তেছ্‌মার খাঁ। প্রকৃতপক্ষে তেছ্‌মার খাঁ অরাজকপুরের। হাতপাতা থানার লোক হলেন চাঁদ দারোগা। (দ্রষ্টব্য: পৃ. ৷৵০, ৷৶০, ৫১, ৫৪, ১০২)। 'বস্তানী'র পটভূমি স্পষ্টত: দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। কিন্তু 'কলিকাতা গেজেটে' এই বইয়ের যে পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে যে, এ কাহিনী উত্তরবঙ্গের। গাজী মিয়াঁ নিজে বলেছেন, রঙ্গপুরের। সম্পাদক কিছুই বলেন নি।

'বস্তানী'র ওপর যে সব প্রাচীন আলোচনা পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচারিত রচনা হলো অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত একটি পুস্তক-সমালোচনা। ১৩০৮ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত 'প্রদীপে' লেখক 'বস্তানী'র অনেক তারীফ করেছেন। যদিও বলেছেন যে, 'মফস্বলের কথা মফস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিয়াঁ প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,' তবু এই 'শ্রুতিকটুদোষ'কেই লেখক স্পষ্টবাদিতার লক্ষণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ষষ্ঠ নথিতে গাজী মিয়াঁ নিজেই 'বস্তানী'র গুণকীর্তন করতে গিয়ে জাহির করেছেন যে 'বস্তানী' সর্বপ্রকার রসের আকর। মৈত্রেয় মহাশয় সোৎসাহে আরেক পদ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, 'ইহাতে নাই, এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্লমধুর—মধুর, অতি মধুর,—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণ রস উছলিয়া পড়িতেছে।' আমাদের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বন্ধুপ্রীতি ও তোষণনীতির নিদর্শন মাত্র। অন্য সমালোচনাটি ইংরেজী ১৯০০ সনের ৩১শে অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। ইংরেজীতে লেখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিচয়ের বঙ্গানুবাদ এই রকম:

উত্তর বঙ্গের দুই মহিলা জমিদারের বিবাদ-বিরোধ এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। স্থানীয় বড়লোক মুসলমানের জীবনযাত্রা, জমিদারী আমলার কুকীর্তি, পুলিশের দুর্নীতিপরায়ণতা, মফস্বলের মুন্সেফ হাকিমানদের খামখেয়ালিপনা, ইত্যাদির বিচিত্র নমুনা গাজী মিয়াঁ অতি বাস্তব ও স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত করেছেন। এই বইয়ের সর্বাপেক্ষা কৌশলময় সৃষ্টি বেগম সাহেবার চরিত্র। লেখক নারী-সমাজের মুক্তি-কামনা সুনজরে দেখেন না। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান রমণীগণের মধ্যে যে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল বেগম সাহেবা তা মেনে চলতেন না। এই জন্য লেখক কঠিন ভাষায় বেগমের নিন্দা করেছেন। যদিও গ্রন্থকার জাতিতে একজন মুসলমান তথাপি তিনি বাংলা লেখেন অনায়াসে এবং বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু এসব সত্বেও তাঁর গদ্যরীতি অনেক স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট, পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতার দ্বারা আক্রান্ত এবং কলাগত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত।

[মূল পাঠ:

Is a story relating mainly to the quarrel between two female and Muhammedan zamindars in North Bengal. It is full of graphic realistic sketches illustrating the life led by the local Muhammedan gentry, the vogury of the zamindari amla, the corruption of the police and the high-handed proceedings of the native judiciary and magistracy in the mufassal, Among the characters, that of Begum Saheba is very cleverly drawn. The writer is no friend of female emancipation, and he comments in strong language on Begum Sahib's not conforming to the system of Purda prevalent among high class Muhammedan ladies. The writer though a Muhammedan writes Bengali with ease and possess a wonderful command over the vocabulary of the language. But his stile is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism and an absence of literary grace.]

বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন

এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, অধুনা দুষ্প্রাপ্য মীর মশাররফ হোসেনের স্বরচিত জীবনচরিত 'আমার জীবনীর'[১] একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রকাশ করা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়ে সতর্ক পাঠকের বিচারাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় পরিচয় যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা নিরন্ধ্র হতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। মীর সাহেবের বইটি বিপুল। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৫। তার ওপর আত্মকাহিনীর মধ্যে জগতের যাবতীয় বস্তু ও তত্ত্বের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে বলে সকল অংশ সমান প্রাসংগিকতার সূত্রে পরস্পরের সংগে সুগ্রথিত নয়। বইটি তাড়াতাড়ি পড়বার সময় এবং টুকে নেবার জন্যে অংশ বাছাই করার কালে আমার ব্যক্তিমানসের নানা প্রবণতা যে আমার মনোযোগকে পরিচালিত করে নি এমন কথাও বলতে পারি না। তবু মূলের পরিচয়কে যথাসম্ভব অস্পর্শিত বিশুদ্ধতায় উপস্থিত করতে প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার দ্বারা যে অন্তরাল সৃষ্টি করেছি তার অপনোদনের জন্য প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে মূল বইয়ের এক সুবৃহৎ অংশ পৃষ্ঠানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অবিকল তুলে দিয়েছি।

বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মীর সাহেবের 'আমার জীবনী'র একটি বিস্তৃত পশ্চাদপট ও ভূমিকা রচনার অজুহাতে বাংলা ভাষায় রচিত আত্ম-চরিত-সমূহের একটি বর্ণনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করা।

দুই

'আত্মকথা'র ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'আমি বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তাঁর কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ৎ প্রকাশ করি। তাতে যতদূর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই।'[২] রবীন্দ্রনাথ, নবীন সেন এবং ঢাকা জেলার জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা লিখিত আত্মজীবনীত্রয় ছাড়া বাংলা ভাষায় এই সাহিত্যরূপের অন্য নজীর তিনি অনায়াসে মনে করতে পারেন নি।

এবং আত্মচরিতে প্রত্যাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও রস যে এগুলোর মধ্যে স্পষ্টতই উপেক্ষিত হয়েছে একথাও তিনি না বলে ছাড়েন নি।

প্রমথ চৌধুরীর এ অভিমত রহস্যাচ্ছলে উচ্চারিত হলেও এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসটি অমনোযোগ ও অসতর্কতা পুষ্ট। 'আমাদের নব্য বঙ্গ সাহিত্যের নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক' বঙ্কিম তাঁর আত্মজীবনী লেখেন নি, এটা সত্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী বঙ্গদেশীয় প্রায় প্রত্যেক মনীষীই তাঁদের জীবন কাহিনী লিখে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোনটা আয়তনে বিরাট, কোনটা সংক্ষিপ্ত। কেউ হয়তো আত্মমানসের বিচিত্র বিবর্তনের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কেউ কর্মযোগী সামাজিকের দৃষ্টি নিয়ে পরিচিত পরিবার ও পরিবেশের বিশদ চিত্র তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। নিজে লেখেন নি, কিন্তু নিজের জবানীতে অন্যের লেখার মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন এমন চরিত্রও একাধিক। আমাদের নির্দিষ্ট কালগণ্ডি মধ্যে সেরকম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'পুরাতন প্রসঙ্গ'।[৩] এই বইয়ের লেখক বিপিন বিহারী গুপ্ত, আত্মকাহিনীর কথক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। আরেকটি বইয়ের নাম 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী'।[৪] কথা দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের কিন্তু সেগুলো গুছিয়ে লিখতে সাহায্য করেছেন বা লিখে দিয়েছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উভয় গ্রন্থকেই আমাদের আলোচ্য তালিকার এখতিয়ার-ভুক্ত করে নিয়েছি। আত্মবর্ণিত একক চরিত্রের আখ্যান হলেও একাধিক আত্মজীবনীর সংকলন হিসেবে 'বঙ্গভাষার লেখক'[৫] মূল্যবান বই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্র' এই সংকলনের দীর্ঘতম সার্থকতম রচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের জীবনের নানা কথা এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তবে রচনাগুলো আয়তনে ও আবেদনে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীর সঙ্গে একাসন পেতে পারে না বলে বইটির উল্লেখ মাত্র করে ক্ষান্ত হলাম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী প্রকাশের স্বর্ণযুগ

বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দাসী[৬], ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৭], দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়[৮], মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৯], রাজনারায়ণ বসু[১০], নবীন সেন[১১], মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১২], সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৩], শিবনাথ শাস্ত্রী[১৪],—এঁদের আত্মজীবনীসমূহ এই সংকীর্ণ কালের মধ্যে ছাপা হয়। ১৯১৮র পরে প্রকাশিত গ্রন্থাদি এ প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি।

তিন

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি আপাতদৃষ্টিতে দুমুখো মনে হলেও, সিদ্ধান্তটি দ্বিধাহীন এবং আত্মজীবনীর প্রত্যাশিত শিল্পরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পরিপুষ্ট। 'এ বই অতি চমৎকার বই। ----কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত নয়, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়।'[১৫] কবির "জীবনদেবতা" প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গভাষার লেখক'এ। সেখানেও নিজের লৌকিক জীবনাংশক বা শৈল্পিক সত্তার ইতিবৃত্ত কোনটা রচনা করাই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিল না। যা অভিপ্রেত ছিল, তার সত্যতা সম্পর্কেও সমসাময়িক রবীন্দ্রবিদ্বেষী পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালের ঘোর সংশয় ছিল।[১৬] আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসেবে, জীবনী হিসেবে এবং রচনা হিসেবে 'জীবনস্মৃতি'র ত্রিমাত্রিক বিচার প্রাসঙ্গিক হলেও তা বর্তমান প্রবন্ধের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও আয়তন-অনুমোদিত নয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত ক্বচিৎপঠিত বাংলা আত্মজীবনী সমূহের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা বিশেষ করে সে সকল আত্মজীবনীর আলোচনাতেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করেছি, যে গুলো উনিশ শতকের বাঙালীর বিশিষ্ট চিন্তা ও চরিত্র, চাল ও মেজাজকে চিত্রিত করেছে।

চার

কালানুক্রমিক বিচারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (কলিকাতা, ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮])।

প্রমথ চৌধুরী যে জনৈক পূর্ববঙ্গীয় মহিলার আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করেছেন, এটাই যে সেই গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বইয়ের যে গভীর কৌতুকজনক দৃশ্যটি তিনি দীর্ঘকাল পরেও ভুলে যেতে পারেন নি সেটা সুকুমার সেন বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন[১৭] :

> ঐ বাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটির মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, এ দেখ, দেখ। ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ। আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, এটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম।---বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। (রাসসুন্দরী, আমার জীবন, তৃতীয় সং ১৩১৩, পৃ. ৫৬--৫৮)।

সম্প্রতি বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনেছি, এখনও দেখবার সুযোগ পাই নি। সুকুমার সেনের মতে, 'মনের কথার এমন সহজ ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।' 'ভক্ত বৈষ্ণব গৃহের কন্যা লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটিতে দীপ্যমান' এবং 'যে কালে পুথি পড়িলে বিধবা হয় এই সংস্কার প্রবল ছিল সে কালের গৃহস্থবধূ হইয়া রাসসুন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরো পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ।'[১৮]

গ্রন্থটি যে সত্যি স্বরচিত তার আন্তর প্রমাণ হিসেবে সুকুমার সেন লেখিকার কোন কোন বৈশিষ্টপূর্ণ উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পাঁচ

সন-তারিখ বিচারে বিদ্যাসাগরের রচনাটি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম নয়, দ্বিতীয় আত্মচরিত। কিন্তু আত্মজীবনীর শিল্পমূল্যের কথা স্মরণ রেখে বিচার করতে বসলে স্বীকার করতেই হবে যে বাংলায় সার্থক আত্ম-জীবনীমূলক রচনার সূচনা বিদ্যাসাগর থেকে। এমনকি এরকম মনে করাও অসংগত হবে না যে, যদি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন, তাহলে হয়তো এই বইটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী বলে ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করত।

বইটির প্রথম গুণ তার ভাষা। যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ধারণায় বাংলা গদ্যের বিবর্তনে 'পণ্ডিতী রীতি'র শ্রেষ্ঠ লেখক বলে সম্মানিত, সে বিদ্যাসাগরই যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য শিল্পানুভূতি নিয়ে ভাষাকে কি সরল এবং সবল অন্তরঙ্গ কলারূপ দান করতে সক্ষম ছিলেন তার পরিচয় মিলবে এখানে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিরাট পুরুষের মানস কোন্ উপাদানে গঠিত, কোন্ পরিবেশে বর্ধিত, কোন্ ঘটনারাশির দ্বারা সংক্রামিত তার আদি-কথা এখানে বলা হয়েছে দুর্লভ সরসতার সংগে। যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি সে কাহিনীর নানা অংশ চয়ন করেছেন, যে নিপুণতার সঙ্গে সেগুলো বর্ণনা করেছেন, আত্মসত্তার যে পূর্ণতাবোধ নিয়ে তাকে সূত্রাকারে গেঁথেছেন তা স্বল্পায়তন হলেও আত্মজীবনীর পরিণত শিল্পরূপের দ্যোতক।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে 'তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ আছে।'[১৯] সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সে আলেখ্য ঈশ্বর-চরিতের তাৎপর্য নির্দেশে এবং মর্মোদ্ঘাটনে যেমন সরস তেমনি গভীর। কুশলী কাহিনীকারের মতো সত্যকে উপা-খ্যানরূপ দান করেছেন এবং তার দ্যুতিতে আলোকিত করে তুলেছেন

নিজের সত্তার এক একটা দিককে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে: 'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন: জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত (এক গুইয়া) লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।' বিদ্যাসাগরের তেজোময় স্বভাবের পরিচিত পিঠের অপরপার্শ্বে যে একটি হাস্যময় উদার পুরুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজমান ছিল এ উক্তি তার সংকেতবাহী। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই মনোমুগ্ধকর দ্বৈত ধর্ম যেন পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণের আদলে গঠিত।[২০] উভয় চরিত্রের এই সাযুজ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলি নির্দেশ, পূর্ব-পুরুষের গতানুগতিক বিবরণকেও আত্মজীবনী-সংগত শিল্প-মর্যাদা দান করেছে। এই রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সামান্য অভিজ্ঞতার খোশ গল্প ব্যক্তিসত্তার অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তুচ্ছ কাহিনীর অভিঘাতকে মোহনীয় করে তুলেছে:

> আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। (পৃ. ৪৭০)

'বিদ্যাসাগর-চরিতের' অচরিতার্থতার প্রধান কারণ তার অসংগত অসম্পূর্ণতা। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার অন্তরঙ্গ পরিচয় জ্ঞাপনে তিনি যে কলারীতির প্রবর্তন করেন, জীবন-চরিতে স্মৃতিসিঞ্চিত বিচিত্র খণ্ড কাহিনী ও বিবিধ পার্শ্ব চরিত্র সৃজনের যে সম্ভাবনাকে তিনি উন্মোচিত করে দেন, পরবর্তীকালে কীর্তিমান আত্মচরিতকার মাত্রেই তার উত্তরাধিকারে উপকৃত হয়েছেন। এই ধারার উত্তরসূরীদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রেষ্ঠ।[২১]

ছয়

দেওয়ানজীর' রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য' পত্রিকায়। প্রকাশকালের 'সাহিত্য' সম্পাদক এই বইয়ের দুটো গুণের কথা বিশেষ করে

উল্লেখ করেন। এক, 'দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, তাঁর স্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' দুই, 'ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' আদর্শ আত্মজীবনীতে আমরা প্রকারান্তরে এই দুই গুণেরই মিলিত কারুকার্য কামনা করি। ব্যক্তি চরিত্রের প্রকাশ দেখতে চাই অন্তরঙ্গ হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে; সে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সকল রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই নিঃশেষে। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি করতে চাই যে, একটি মূল্যবান চরিত্র আগাগোড়া আকস্মিক নয়, সে ইতিহাসের ধারায় বিধৃত, সমাজে প্রতিপালিত, পরিবারে পরিবেষ্টিত। তাঁর অন্দরের আনন্দ এবং সদরের কোলাহল দুইই আমরা জানতে চাই, চিনে নিতে চাই। বিদ্যা-সাগরই সর্বপ্রথম আত্মজীবনীর এই পরিপুষ্ট রসরূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেন। তবে তাঁর রচনাটি অসম্পূর্ণ এই অর্থে দেওয়ানজীর 'আত্মজীবন চরিত' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সার্থক আত্মজীবনী। সার্থক কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে। কারণ এই বইতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় যে রূপে উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনামূলক, প্রচার-উন্মুখ, আদর্শায়িত এবং খণ্ডিত। নিরঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন:

> প্রাক্ রবীন্দ্র বাংলা আত্মজীবনী ইতিহাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা উদ্দেশ্য বড় স্পষ্ট। সেগুলিতে আত্মপ্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার স্বপক্ষে কোন আত্মচরিতখানি না আসিয়া দাঁড়ায়।[২২]

দেওয়ানজীও ব্যতিক্রম নন। তিনিও তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে ব্যক্ত করার নামে কার্যত 'কামজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।' একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাক।

> আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি স্বরের জন্যই হউক অথবা এই সকল কারণের সমষ্টিতে হউক, আমাকে

স্ত্রীলোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শুনিয়াছি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ যে, আমার স্বরের গুণেই কামিনীকুল আমাকে এত ভালবাসিতেন।

বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। এক কথা শেষ করিলে আর এক কথা স্মৃতিপথে আইসে। হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দূষণীয় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইত না। মিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরতা ছিল না। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের সকল ভাবই যেমন নির্মল রসে পূর্ণ থাকিত, বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনীর মূর্তি দিনযামিনী হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, সে মূর্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা হইত না। দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিত্রভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎসর। এ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধ্যবর্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। (পৃ. ৪১—৪২)

এই প্রণয় কাহিনীর পূর্ববর্তী অস্বস্তিকর পরিণতি ব্যাখ্যা করে চরিতকার বলেছেন, 'বোধ হয়, তাঁহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল' (পৃ. ৪৫)। এই স্মৃতিমন্থনের মধ্যে আত্মগৌরব ঘোষণার যে প্রবণতা মিশ্রিত ছিল তা কাহিনী-শেষের সরল আত্মপ্রসাদজনিত বাণীর মধ্যে অসংকোচ প্রকাশ লাভ করেছে:

আমার সেই বয়সে সেই সময়ে আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপ পঙ্কে পতিত হই নাই, ইহা অদ্যাপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়। (পৃ. ৪৬)

যখন দেওয়ানজীর ৩০ কি ৩২ বৎসর বয়স তখনও একবার চতুর্দশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী গায়িকা তাঁর প্রতি আসক্ত হন। সে প্রলোভন থেকে মুক্তি লাভের প্রতিক্রিয়াও ১২০ থেকে ১২১ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে।

দেওয়ানজীর বইয়ের আসল মূল্য অন্দর নয়, সদর এলাকার প্রাণবন্ত আলোচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের মহানগরীর জীবন-যাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর এমন সরল রচনা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। বিবরণদানের বিষয় চয়নে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সম্পর্কবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পরিণত সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেও গৌরবের বস্তু হত।

দেওয়ানজীর আমলে নবীন শিক্ষার্থিগণ ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ রূপে মগ্ন থাকতেন; বলা উচিত, সে শ্রমে প্রাণপাত করতেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তৎকালীন সে শিক্ষাপ্রণালী খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকসমূহের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, গুরুমহাশয়ের অমানুষিক জুলুমের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন, ফারসীর পুঁথির অর্থ বালকের নিকট দুর্বোধ্য উর্দু ভাষায় ব্যাখ্যা করা হত বলে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। দেওয়ানজীর বক্তব্য :

> অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। (পৃ. ৮)

> প্রথম আমরা শেখ মসলার্দ্দন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ-পুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতি ক্ষুদ্র ও অতি সরল ভাষায় লিখিত।---এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরল ভাষায় রচিত বাংলা ভাষায় পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধ-গম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনামা পারস্য বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঠেই বা কি লাভ হইবে; কারণ তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দু ভাষায় অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না, কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুস্তিকা বাংলা অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত।

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদীর বিরচিত গোলেস্তাঁ অর্থাৎ গোলাপ ফুল কানন নামে গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। এইখানি গদ্যে পদ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য, নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। (পৃ. ১২) প্রথমে আমরা এই গ্রন্থেরও আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ করিলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থ-কর্ত্তার বিরচিত বুস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্যপুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। (পৃ. ১৪)

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণী পাঠোপযোগী, তথাপি এই দুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতি শিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উর্দ্দু ভাষাও বালকের বোধগম্য হইত না। যাহা হউক তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন। (পৃ. ১৫)

এবং কৈশোর হবার আগেই

মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগীর, সেকন্দর নামা এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত হইলে ক্রমশঃ বাহার দানেশ, আল্লাসি জহুরি, আসফি উবুফি জাহির, হাফেজ এবং মোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত করেন। (পৃ. ২২)

এই ছিল পড়বার বিষয় এবং পড়াবার রীতি। যাঁরা পড়াতেন তাঁদের সম্পর্কে দেওয়ানজীর দ্ব্যর্থহীন অভিমত:

> গুরুমহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল, মকতবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তক সকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে অতি নির্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে লেখাপড়ার জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২।১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত। (পৃ. ২০)

এত কষ্ট স্বীকার করে ফারসী আয়ত্ত করার পর শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই যেদিন অকস্মাৎ ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হল, সেদিন কেবল মুসলমান নয়, অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুও মুসিবতের মধ্যে পড়লেন। ইংরেজীর খড়্গাঘাত সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা যে অংশত হলেও সংশোধনযোগ্য দেওয়ানজীর জবানবন্দী তার স্মারক। আদালতে ইংরেজীর প্রচলন হওয়াতে

> (বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য) একরূপ অকর্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল

না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সঙ্গে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্ররূপে পড়িতে লাগিলাম। (পৃ. ৩৪)

যখন পারস্যভাষা রাজকার্যে অব্যবহৃত হয় তখন আমি টেলিমেকাস ও ক্যাম্বেলের 'প্লেজারস্ অব্ হোপ' পড়িতেছিলাম। রীতিমত না পড়িলে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত দুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম। এবং নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম, এবং এক বৎসরের মধ্যে তিনখানি রিডার ও একখানি গ্রামার পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জাত্যাগ পূর্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এবং কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। (পৃ. ৩৫)

---আর ইংরাজী বিদ্যার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদের বাহ্যে বিশেষ পরিবর্তন হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল। (পৃ. ৩৭)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সঙ্গে শেষার্ধের তুলনা করে বলেছেন:

কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্রে প্রেতের ন্যায় দূষণীয় দৃষ্ট হইত। দেব-ভক্তি, পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী-স্নেহ, প্রতিবাসী-ভালবাসা, অতিথি সৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ, ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষয় সকল তাঁহাদের বিবেচনায় যৎ-সামান্য পাপ বলিয়া বোধ হইত। (পৃ. ১৫)

প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশীয় গণিকালয়ের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন আজকের দিনের পাঠকের জন্য সেগুলো রীতিমতো শিহরণমূলক এবং দৃষ্টি উন্মোচনকারী:

এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধর্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এমনকি গণি-কালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত পুণ্যসমূহ বহির্দ্বারে রাখিয়া যাইতে হয় এবং তজ্জন্য সেই বহির্দ্বারের ভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা দুর্গাপূজার মহাস্নানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীনদিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইত না।

কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনা বাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্ব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশে-ষতঃ পর্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমাদর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন। (পৃ. ৩৭)

সবার শেষে আর একটি উদ্ধৃতি। তাঁর বাল্যকালে দেখা কলিকাতার চিত্র, চিত্র হিসাবে অংশটি অবিস্মরণীয়।

একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল

না। বিশেষতঃ দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বর্ত্মের পার্শ্বস্থ প্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্বদা উত্থিত হইত। অভ্যাসবশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত। এমন কি, নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত, এবং পুলিশের সুনিয়ম অভাবে দস্যুভয়ে অনেক গলিতে যাইতেও সাহস হইত না। শুনা যাইত যে, তস্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া পথিকের গাত্রে পড়িত, এবং তাহার শাল ও ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিত।

জাহ্নবী তীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহু লোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও তাহাতে প্রফুল্লচিত্তে অবগাহন করা যাইত না। (পৃ. ৫৫)

সাত

আমাদের আলোচ্য তালিকার এটি চতুর্থ আত্মচরিত। বাংলা ভাষায় রচিত এইটেই প্রথম দীর্ঘ আত্মজীবনী যার বিষয়বস্তুর গৌরব রচনার শিল্পকলার কৃতিত্বের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নয়। 'মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের জীবন বর্তমান ভারতের পরম গৌরবের বস্তু।' (তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদনের প্রথম বাক্য) আত্মজীবনী পাঠ করে আমরা যে জ্ঞানমূলক কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চাই, যে আনন্দের স্বাদ লাভ করতে উদ্যোগী হই, তার কারণও হল বর্ণিত ব্যক্তি চরিত্রের ইতিহাসস্বীকৃত মহিমা সম্পর্কে পাঠকের এই পূর্বস্মৃতি।

মহর্ষি-রচিত 'আত্মজীবনী'র তৃতীয় সংস্করণ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। বিষয়সূচী, নামসূচী, বংশতালিকা, কয়েক শত পাদটীকার

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যবহুল মন্তব্য এবং সর্বোপরি গ্রন্থশেষের সুদীর্ঘ (৩৯৯ থেকে ৪৬৫ পৃষ্ঠা) পরিশিষ্টটি গ্রন্থের মূল বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টির উজ্জ্বল সাক্ষী। মুদ্রণ-পারিপাট্যেও এই সংস্করণ অসাধারণ মৌলিকতার অধিকারী। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে পরিচ্ছেদ-সংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহর্ষির বয়স এবং সেই পৃষ্ঠার বক্তব্যের সংকেত দেয়া রয়েছে। পাঠকের চেতনাকে তা প্রতি পংক্তিতে বহুমুখে প্রসারিত করে দিয়ে মৃত অতীতকে সারাক্ষণ মুখর করে রাখে। যাঁদের কথা 'আত্ম-জীবনী'তে চকিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল গ্রন্থের প্রভাবের প্রতি মহর্ষি ইংগিত মাত্র করেছেন, যেসব তত্ত্বচিন্তা, আন্দোলন ও সংগঠনের কথা মহর্ষি ব্যক্তি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন, পরিশিষ্টে সে সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্যপুঞ্জ বিস্তৃত আকারে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টটি যে এত মূল্যবান হতে পেরেছে, তার একটি কারণ, মহর্ষির প্রকৃত জগৎ ও জীবন ইতিহাসের বিচারেও বিশেষ মূল্যবান ছিল। মীর সাহেবের 'আমার জীবনী' বা এ শ্রেণীর অন্যান্য রচনার একটি করে তথ্যকণ্টকিত, টীকা-পরিশিষ্ট-সম্বলিত নয়া সংস্করণ (উদ্যমশীল গবেষক সম্পাদক দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও সে শ্রম কতখানি আত্যন্তিক মূল্যে গরীয়ান হয়ে উঠবে বলা কঠিন।) তবু ওরকম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মহর্ষির আত্মজীবনী সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বলতে বাধ্য হয়েছেন "আমি যখন এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমার ধারণা ছিল যে মহর্ষির লেখাতে কোথাও ভুল নাই।...কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, মহর্ষিদেব আত্মজীবনী লিখিবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁর উক্তিতে ভুল রহিয়াছে।" (৩য় সং, সম্পাদকের নিবেদন, ।।/০)। কারণ যাই হোক, মহর্ষিও কিছু ভুল কথা লিখেছেন। সে বিচ্যুতি যে মীর সাহেবের রচনাতেও অদৃশ্য কীটের মতো প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। তাই শুধুমাত্র মীর সাহেবের জবানবন্দীকে সম্বল করে আমরা যদি তাঁর একটি জীবনচিত্র

আঁকি তবে তা প্রামাণ্য বা পূর্ণাঙ্গ বলে গৃহীত হবে না। সে কাজ করার আগে আমাদেরকেও মুক্তদৃষ্টি নিয়ে, সকল রকম বিরোধী অবিরোধী প্রমাণাদি একত্র করে মীর সাহেবের নিজ মুখে বলা কথাওর সত্যাসত্য বিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনীতে' অকিঞ্চিৎকর রচনাশৈলীকে আশ্রয় করে নিজের জীবনের মহৎ ভাব ও মহৎ কীর্তিসমূহের ফিরিস্তি প্রদান করেছেন মাত্র, একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে এমন এক বিশেষ সরলতা ও সরসতা ছিল, যার তুলনা বাংলা গদ্য নির্মাণের কৈশোর কালে তো বটেই, আজও দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য আটপৌরে হলেও স্বমানসের আদলকে অন্তরঙ্গরূপে ফুটিয়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম। বিদ্যাসাগরের কালবৃত্তে রচিত হয়েও দেবেন্দ্রনাথের নিরলংকৃত গদ্য স্বগুণে প্রাণস্পর্শী। তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসবের বর্ণনা, মহর্ষির ভাষায়:

> আমরা এদিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া, সভা সাজাইয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এই নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে, সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে, বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। ...রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন। বেদ পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তারপর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম।--- আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য বক্তৃতা করিলেন; তাহার পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ

তদনন্তর অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ রায়। ইহাতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান্ হয়রান। সকলেই অফিসের কেরতা। হয়ত কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভাভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কেহই বা কি বুঝিল, কেহই বা কি শুনিল, কিছুই না। কিন্তু সভাটা ভারী জাঁকের সহিত শেষ হইল। (পৃ. ৬৯—৭০)

'তিনিই বাংলায় ভাবুকতা ধারায় গদ্য (Reflective Prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই।'[২৩] দেবেন্দ্রনাথের বাণীর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর উক্তি স্মরণীয়: 'দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তোলে এবং মনশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।' মহর্ষির অন্তর্লোকের উৎকণ্ঠা এই ভাষায় কী মর্ম-স্পর্শী রূপ লাভ করে, তার একটি বিখ্যাত নজীর হল এই অবিস্মরণীয় পংক্তি কটি:

তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না। উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ্, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।

মহর্ষির চরিত্রেরও এইটেই পরম রমণীয় দিক। তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তের, সংস্কার রক্ষণশীলের, চিত্ত যুক্তিবাদীর। হৃদয়ে অনুমিত সত্য যুক্তির দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ করতে পারতেন না। না পারার ক্ষোভে অশান্তি ও অস্থিরতা অনুভব করতেন। তারপর বিবুদ্ধ সত্য যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হওয়া মাত্র নিজের প্রাচীনতম সংস্কার ও অতি-প্রতীত বিশ্বাসরাশিকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর যে নবজাগ্রত চেতনা ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনকে আশ্রয় করে বুদ্ধির মুক্তি কামনা করেছিল, মহর্ষিই তার গোড়াপত্তন করেন। এই বিচারে অপেক্ষাকৃত আপোষহীন যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার মহর্ষির শিষ্য ও সহকর্মী, গুরু বা অরি নয়।[২৫]

কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে বসে অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন:

> পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর, আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলতঃ ইহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ,—আকাশ-পাতাল প্রভেদ!
>
> (পৃ. ৭৫—৭৬)

দশ বছর শ্রমের পর পিতৃঋণের মহাভার যখন কিছুটা লাঘব হয়েছে তখনই 'কিন্তু আরেক প্রকার, নূতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল।' (পৃ. ২১৮) পিতৃঋণের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের ঋণ। সে সময়ে নিজের মর্মচেতনায়, সত্যদৃষ্টির দিব্য জ্যোতি লাভ করতে না পেরে তিনি এক গভীর অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব করছিলেন, তার ওপর অন্যকৃত পরিশোধ্য ঋণের এই বিরামহীন খড়্গাঘাত।

> মন নিতান্ত মগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণজালে বদ্ধ হইতে হইবে। অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয়-সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপ অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত। এখন যাহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মাভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল। (পৃ. ২১৯—২২০)

একটু পর শান্তির স্পর্শ লাভ করছেন তাঁর প্রিয় কবি হাফিজের কাব্য স্মরণ করে। মহর্ষির অধ্যাত্ম জীবনের কাহিনী এমনি করে বাস্তব জীবনের সংকটকে, ব্যক্ত চেতনার বিক্ষোভকে মূর্ত করে তুলেছে। পাঠশেষে যাঁর সাক্ষাৎ নিজ হৃদয়ে লাভ করি, তিনি সৌম্যদর্শন প্রেমময় পুরুষ, যাঁর ভাবুকতা দরদভরা, যিনি একাধারে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী এবং কাব্যরস পিপাসু। মহর্ষির মধ্যে স্মিতরসের বা কৌতুকবোধের লেশমাত্র ছিল না এমন আশঙ্কা করাও ভুল। কোন কোন বর্ণনায় নিজের গভীরতম সংস্কার এবং প্রখরতম স্বচ্ছ দৃষ্টি উভয়কেই তিনি সরসভাবে ব্যক্ত

করেছেন। যেমন (পৃ. ২০০—২০৪) পুরীতে নিরাকার জগন্নাথ দর্শনের চিত্রটি :

> স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জগন্নাথ দেখিতে উৎসুক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাম। তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দ্বার খুলিল, আবার একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধান ছিলাম, তখন তাহাদের সেই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল; কিন্তু আমার চশমাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগন্নাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়, আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল।

আরেক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রয়াগ তীর্থে প্রসিদ্ধ বেণীঘাটে :

> এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। একজন পাণ্ডা, 'এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর' বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না।' আর একজন বলিল, 'তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও।' আমি বলিলাম, 'আমি কিছুই দিব না।

তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও।' সে বলিল, 'হম্ পয়সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে, পয়সা দেনেহী হোগা।' আমি বলিলাম, 'হম্ পয়সা নেঁহী দেঙ্গে, কিন্তুরে লেওগে, লেও তো?' এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুণ ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল—বলিল, 'হম্ তো কাম কিয়া অব্ পয়সা দেও।' আমি বলিলাম, 'এ ঠিক হইয়াছে,' আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। (পৃ. ২২৭—২২৮)

এসব সত্ত্বেও আত্মজীবনী হিসেবে মহর্ষি-রচিত গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। "দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলতে গেলে তাঁহার ধর্মচিন্তার ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইতিহাস মাত্র।" (পরিশিষ্ট ২, পৃ. ৩০২) লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী ব্যক্তিসত্তার পারিবারিক ও সামাজিক আচরণের অন্তরঙ্গতম অভিব্যক্তি এখানে বিরল। একেবারে যে নেই, তা নয়। সম্পূর্ণ চতুর্দশ পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। ১০৯—১১০ পৃষ্ঠায় আছে:

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতে হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।' আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহাব জন্য একটি পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর।

অন্যত্র কোন কোন জায়গায় নিজের গ্লানিমিশ্রিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উন্মোচিত করেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একেবারে প্রথম বাক্যটি, 'এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম।' পরে গোটা পরিচ্ছেদের মধ্যে এর কোন বাস্তব পটভূমি

উদঘাটিত হল না। অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর যুবকের অন্তর্দ্বন্দ্বের বোধগম্য কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অচরিতার্থ থেকে গেল। মহর্ষিকে মানুষরূপে পেতে পেতেও পেলাম না। এমন অতৃপ্তির উৎস ৯৯ পৃষ্ঠার আরেকটি উক্তির অতিসংক্ষিপ্ততা।

> গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম। তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম।... যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনি তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম, তখনি তাঁহার 'মহদ্ভয় বজ্রমুদ্যতম' রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। (পৃ. ৯৯)

নির্জনে অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বিপরীত কর্মের ইতিবৃত্ত মহর্ষি প্রকাশ করেন নি। এই অনুচ্চারণ ও আত্মগোপন আদর্শ আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত নয়। তুলনায় মীর সাহেবের জবানবন্দী স্পষ্টভাষিতায়, 'মনের কথা' প্রকাশে, ব্যক্তিজীবনের গরলামৃত উদগীরণে অধিক সাহসী, অধিক সমর্থ।

আট

রাজনারায়ণ বসুর লৌকিক জীবনও কীর্তিশোভিত। সেই কীর্তির অসাধারণ শোভার একটি কারণ এই যে উনিশ শতকী বাংলার প্রধান পুরুষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কালব্যাপ্তি জনবহুলতায় দেবেন্দ্রনাথ-শিবনাথের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। যে ব্যক্তি যুগপৎ প্রায় তিন পুরুষের অন্তরঙ্গতা লাভ করিতে পারেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উদার বৈচিত্র্য ও গভীরতা অনুভবগম্য। রাজনারায়ণের সঙ্গ পাইয়া মহর্ষির অধ্যাত্মস্ফূর্তি হইয়াছিল, রাজনারায়ণের অট্টহাসিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ-পাথেয় লাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের সান্নিধ্যে মুখচোরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন খুশী হইয়া উঠিত। এ মানুষের সমানধর্মা কই।[১২৬]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে তাঁর এই ভূতপূর্ব সহপাঠীর মুখ চেয়ে অনেকগুলো কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে অধুনা অতি পরিচিত মাইকেল-রাজনারায়ণ পত্রাবলীর মধ্যে। প্রচুর আহার করে এবং তার চেয়েও বেশী পান করে মধুসূদন বিদায় কালে যাঁকে স্নেহে 'জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন' তিনি শ্মশ্রুল রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের কাছেই মাইকেল নিজের প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়কে ব্যক্ত করে বলেন, 'ভবিষ্যত বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।' (পৃ. ১০৪) রাজনারায়ণ বসুর গোঁফ পর্যন্ত সমকালে কাব্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। রচনাকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যের নাম 'গুম্ফাক্রমণকাব্য'। নমুনা :

পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারী ভারী, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে।[২৭]

এসব কৌতুকময় দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরো অনেক ওজনদার তথ্য মজুদ রয়েছে যার ভিত্তিতে এ কথা অনুমান করা সহজ যে সমসাময়িক শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁর বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন যে, 'সাহিত্যিক বলিয়া আজ আমাদের কাছে রাজনারায়ণ তেমন পরিচিত নন। অথচ সাহিত্যগুরু বলিতে আসলে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।'[৩০]...রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের মতো ব্রাহ্মধর্মের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন নতুন তত্ত্ব বা সত্য সংযোজিত করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর সমাজগ্রাহ্য স্বরূপকে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গ্রহণীয় রূপে প্রচার করেছেন। স্বয়ং কেশব সেন বসুর বক্তৃতা শুনেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বেঁধেছিলেন বসু 'বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত'। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সস্নেহে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, 'রাজনারায়ণ ধর্মের ডিসপেপসিয়ায় মরমর'। দেবেন্দ্রনাথ

রাজনারায়ণকে ডাকতেন 'ইংরেজী খাঁ' বলে, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের বিচার ও প্রচার বিষয়ে তাঁর পরামর্শকে বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন। উপাধিটি যে কত সংগত হয়েছিল তা ভালো করে আন্দাজ করতে পারি যখন রাজনারায়ণ নিজের জবানীতে বলেন:

> আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমন নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিল। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। (পৃ. ৬২)

সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-সমূহের স্বাপ্নিক ও প্রচারক। 'ইংরেজী খাঁ' বলে তিনি যে কেবল মাই-কেলকে বাঙালী কবি হতে অনুপ্রাণিত করেন তাই নয়, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যেন নিত্যকার সমাজ জীবনে তার স্বকীয় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্যেও কম উদ্যোগী ছিলেন না। বসু-প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র "সভ্যেরা গুডনাইট না বলিয়া সুরজনী বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ করিতেন, ইংরাজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাংলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।" (পৃ. ৮১) রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব এই বিচিত্র ঐশ্বর্যের স্মৃতিবাহী বলে তাঁর 'আত্মচরিত' ঐতিহাসিক দলিল এবং সুখপাঠ্য সাহিত্য উভয়রূপেই স্মরণীয়।

দ্রুত উন্মোচনশীল উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্রুত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে রাজ-নারায়ণ বসুর আত্মিক লেনদেন কয়েক পুরুষে ব্যাপ্ত বলে সেই স্মৃতিমন্থন-জাত আত্মপ্রচারও কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত। তার মধ্যে প্রধান হল তাঁর কালচেতনা, সেই চেতনার তৌলন প্রবণতা। 'সেকাল আর একাল'

বিষয়ক কথা যে কেবল মাত্র ঐ শিরোনামের বক্তৃতার মধ্যেই বসু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তা নয়। তাঁর 'আত্মচরিতে'ও প্রায় সকল বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণনার পশ্চাতে এই কালভিত্তিক তুলনামূলক বচন রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। রাজনারায়ণ বসু সেকাল-একাল বলতে সময়ের যে এলাকা বিভাগ বুঝতেন, তার একটা হিসেব হল : "ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কলেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা 'সেকাল' এবং তাহার পরের কাল 'একাল' শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।" বিশেষ করে ঐ বক্তৃতার পর তাঁর যুগচেতনার এই প্রসার সেকালে কতদূর জাহির ছিল সে সম্পর্কে 'আত্ম-চরিতে' একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। "আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর দোতালায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে, নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, 'উপরে কে এসেছে জানিস? সেকাল-একাল এসেছে।' আমার নাম সেকাল-একাল হইয় গিয়াছিল।" (পৃ. ৯৯)

'আত্মচরিত' তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত ১ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশে শৈশব ও তৎকালীন শিক্ষা, ২০—৫১ পৃষ্ঠা। কর্মজীবন, ৫২—২৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রথম অংশে একেবারেই আগের কালের কথা। একালে মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে যে বিপর্যয় একবার ঘটেছিল রাজনারায়ণের পিতার জীবনে হুবহু তাই ঘটে। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনারায়ণের পিতার জীবনে সে অঘটনের কালে চিত্ত স্থির রাখতে যিনি সৎ পরামর্শ দেন, তিনি ছিলেন এক মহান পুরুষ এবং দৈবক্রমে সে অঘটনই পরে মঙ্গলময় বলে প্রমাণিত হল। কাহিনীটা এই রকম :

> আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় আর একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা

বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে। (পৃ. ১০—১১)

মাতাপিতামহের আমলে মুসলমানী চালচলনের প্রভাব সম্পর্কে একটি মন্তব্য :

> সেকালে মুসলমান রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।'

দ্বিতীয় অংশের বিষয়বস্তু আরো সরাসরি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন বাঙালীর জড় সমাজে যদিও প্রথম দিকে বিক্ষোভ বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্রমশঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ী বা সংরক্ষণী মনোভাবই বুদ্ধি ও হৃদয়ের উদ্দাম গতিবেগকে অনেকখানি শান্ত ও স্তব্ধ করে দেয়। নানা ঘটনা ও চরিত্রের আলোচনার মধ্য দিয়ে সে কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণরূপে এ বইতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য রাজনারায়ণ বসু নিজে শেষ বয়সে স্মৃতিরোমন্থনকারী অন্যান্য সামাজিক ''বৃদ্ধ হিন্দু'র মত, বিশেষ করে 'সেকাল আর একালে', সেকালের অপস্মৃত মহিমা স্মরণ করে তুলনায় বেশী শোক প্রকাশ করেছেন। তবে আমরা সকল সময়ে তার অতিউচ্চারিত সিদ্ধান্তকে সরল সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য নই। লেখার অন্তরালে সঞ্চরণশীল অনুচ্চারিত ধারণাসমূহকে উহ্যবাহ্য যাবতীয় তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে, বাছাই করে, গ্রথিত করে, তবে আমরা আত্মজীবনী থেকে অতীতের কোন বিশেষ পর্বের সমাজ ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করতে সমর্থ হব। সে বিশ্লেষণরীতির নানা স্তরে প্রবেশ না করে বর্তমান বর্ণনামূলক প্রবন্ধে আমরা শুধু প্রাসঙ্গিক ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তসমূহ একত্রিত করে উপস্থিত করছি।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মেকলে ছিলেন 'এঙ্গুদের' পরম পূজনীয় শিল্পী ও মনীষী। কিন্তু রাজনারায়ণের সাক্ষ্য থেকে এ কথা জানতে পারি যে, সেই প্রতাপশালী মেকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় লয় পেতে সুরু করেছেন। "তখন আমরা মেকলে খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলণ্ডের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহৎ গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে।" (পৃ. ৩৭) কলেজ-পড়ুয়া ছেলেরা মেকলে ছাড়াও আরো দু'একটি বস্তুর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। তবে আরও আগেকার যুগের তুলনায় এই আসক্তি অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। কারণ "তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না —কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল, গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" (পৃ. ৪৫)। সমকালীন তারুণ্যের অস্থিরতাকে আর্দ্র চিত্তে লোচন করে দরদী রাজনারায়ণ এই অতিরিক্ত পানাসক্তির যে আদর্শগত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, তাও বিশেষরূপে বিশ্লেষিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দাবি রাখে: "তাহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।" (পৃ. ৪৫) ব্রাহ্মধর্মের ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে পর্যন্ত সে সময়ে পানাহারের যে যোগ অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে রাজনারায়ণের সাক্ষ্য সত্যানুসরণে কুণ্ঠাহীন। "যেদিন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমরা স্বগ্রামের দুই একজন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়।...... খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল,

কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল।" (পৃ. ৪৯)

ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বগত ও প্রতিষ্ঠানগত বিবর্তনের অনেক মঞ্চান্তরাল দৃশ্য রাজনারায়ণ বসু তাঁর উদার কৌতুকবোধ নিয়ে বর্ণনা করেছেন। মহর্ষির জীবিতকালেই তাঁর অনেক প্রিয় বিশ্বাস ও সংস্কার নবীন ব্রাহ্মদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তাড়নায় বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর বর্ণিত কোন সংক্ষিপ্ত দৃশ্য সেই স্মৃতিতে দীপ্যমান। মহর্ষি ও কেশব সেন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বসু মহাশয়ের চিত্তপটে যে চিত্রটি ঝলক দিয়ে উঠেছে, সে হল: "কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এদিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন।" (পৃ. ১০৩) কিন্তু দৃশ্য বা চিত্র চিত্রণের চেয়ে চিন্তা বা তত্ত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করায় রাজনারায়ণের উৎসাহ বেশী। তাই তিনি মহর্ষি ও অক্ষয় দত্তের মধ্যে যে ভাবদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, স্বকীয় দৃষ্টিতে বিচার করে তার সার ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। এবং সে বিচার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট, সুচিন্তিত এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই মূল্যবান।

> দেবেন্দ্রবাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক, অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর।...ব্রাহ্ম সমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থিরকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে, কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন আদপেই সাধিত হইতে পারিত না, তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ইহা তাঁহারা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়।

নিজের ধর্মমতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কেও অনেক মনোজ্ঞ গল্প করেছেন। একটি কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ এক জায়গায় এমন কথাও বলেছেন যে, "শেভালিয়র র‍্যামজের "সাইরাসেজ ট্রাভেলজ্" পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের "অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস অফ্ জীসাস" এবং চ্যানিংগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। (পৃ. ৪৩) তন্ময় বা তন্ময়মগ্ন চরিত্রাংশে এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ-মূলক সরস আলোচনাই রাজনারায়ণের 'আত্মচরিতে'র প্রধান আকর্ষণ। আত্মচরিত হিসেবে গ্রন্থের দুর্বলতাও এইখানে। সম্পাদক হরিহর শেঠ অবশ্য ভূমিকায় বলেছেন যে, "তিনি গ্রন্থখানিতে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলী শুধু উল্লেখ বা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মূল্যবান অনুভূতি বা উপলব্ধিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম 'আত্মজীবনী" "জীবনস্মৃতি" এসব কিছু না দিয়া 'আত্মচরিত' দেওয়া হইয়াছে, ইহা খুব সমীচীন হইয়াছে, কারণ ইহাতে তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা বা গুহ্যকথাও কিছুমাত্র গোপন করা হয় নাই।" কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। "আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহে রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসব, কন্যাটির বয়স এগার বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আদ্যরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে।...একুশ বৎসরে আমার আদ্যরস হয়।" (পৃ. ৩৫)—এই ঘোষণার মধ্যে আত্মজীবনীসুলভ অকপটতার আভাস থাকলেও তা এত অপরিপুষ্ট এবং অনুরূপ স্বীকারোক্তি সমগ্র গ্রন্থে এত কৃচিৎ দৃষ্ট যে তার মধ্যে লেখকের ইন্দ্রিয়াধীন দুর্বল মানবীয় সত্তা প্রতিফলিত হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কি করে নিজের পিতার কাছে পরিমিত মদ্যপানের শুভপাঠ গ্রহণ করলেন (পৃ. ৪৭), খানা খাওয়া ও মদ্যপানের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মাছের ঝোল ও সর্ষের তেলের প্রতি যে তাঁর ভক্তি বরাবর অচল ছিল (পৃ. ৬৯)—সে সব স্মৃতিকথার মধ্যে

অন্তরঙ্গ মানুষের যে পরিচয় মাঝে মাঝে উন্মোচিত হয়েছে তা আরো বহুল ও বিস্তৃত, বিনীত ও বিশ্রুদ্ধ হলেই আমরা অধিক আনন্দিত হতাম, 'আত্মচরিত'ও যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধন করতে পারত।

নয়

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। লেখক প্রতি খণ্ডকে ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে (ইং ১৯০৮), দ্বিতীয় ভাগ ১৩১৬, তৃতীয় ভাগ ১৩১৭, চতুর্থ ভাগ ১৩১৮, পঞ্চম ভাগ ১৩২০ সালে। বাংলা ভাষায় এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী। লেখক শৈশব থেকে পৌঢ় কাল অবধি জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। শৈশবে যা ঘটেছে, কৈশোরে যা অতিক্রম করতে হয়েছে, পুরুষ চিত্তে যা উন্মাদনা এনেছে, কবিচিত্তে যা রেখাপাত করেছে, হাকিমী জীবনে যা আত্মপ্রসাদজনিত পরিতৃপ্তি দান করেছে তার বিচিত্র, বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী একটা দিলখোলা আসর-জমানো মনমাতানো মজলিসী ঢঙে বলা হয়েছে। স্বভাবতই নবীন সেনের কণ্ঠে উচ্চ, ঘোষণারীতি নাটকীয়। বিনয়ের নিবেদনও এখানে আত্মগৌরব প্রচারের স্থূল চেতনাকে, হিতোপদেশ বিতরণের মহৎ আকাঙ্খাকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি।

> আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে, অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশতলে অসংখ্য জোনাকিরাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত প্রান্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে ফুটিয়া নিবিতেছে, অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জীবনকে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্ময়পূর্ণ বিশ্বের অংশ। অহো!

কি রহস্য। তাহাদের দ্বারাও এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রের কোন্ কার্য সাধিত হইতেছে, তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিষ্ফল নহে। সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি না। যখন মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যখন ভাবি যে এই মহা রঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্তকাল হইতে অভিনয় করিয়া আসিতেছি, তখন হৃদয় কি আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়। তখন আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমি এই অনন্ত অভিনয়ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের একজন অনন্ত অভিনেতা। কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার ক্ষুদ্রত্বে আপনি ম্রিয়মাণ হই। কই, এই জীবনের কার্যকারিতা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমার জীবন জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। একজন বারংবার অনুরোধ করাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি মহা ঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকী আছে, তাহা—মৃত্যু। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাংলার বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে।

তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বসিলাম কেন? ইচ্ছা ভূত জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায় দেখিব। দেখিয়া তাহার একটি মন্দ রেখাও পরিবর্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। এই মধ্য-জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকাবিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব, এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম। (প্রথম খণ্ড পৃ. ১-৩)।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের এরূপ অভিলাষ ছিল, মীর মশাররফ হোসেনও এরকম ভাবনার দ্বারা পীড়িত হয়েছেন। এই আত্মজীবনীত্রয়ের উপক্রমণিকা অংশের ভাবের ঐক্য চোখে পড়ার মতো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রাজনারায়ণ বসু কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রী নিজ নিজ চরিত্রের গরিমা প্রচারে উদাসীন ছিলেন, এমন বলি না। তবে তাঁদের ব্যক্তি জীবনের মহিমা সুবিদিত। তাঁদের যুগ নির্মাণকারী সামাজিক কীর্তিকলাপ সর্বজন-স্বীকৃত। আত্মকাহিনীর মধ্যে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করে আমরা একটা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কৌতূহলকে নিবৃত্ত করি মাত্র ; বর্ণিত অভিজ্ঞতার অসাধারণত্ব বা অতি সাধারণত্ব লক্ষ্য করে মনে অবিশ্বাস বা ঔদাসীন্যের সৃষ্টি হয় না।

আত্মজীবনীতে উপন্যাসের কলারীতি অনুসৃত হলেই সেটা অপরাধ বলে বিবেচ্য নয়। লেখকের আত্মসাক্ষাৎকার শিল্পরূপে প্রাণময় করে তুলবার জন্যে নাটক-উপন্যাসের রস-রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা লেখকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তবে উপন্যাস ও আত্মচরিতের মধ্যে যে উপাদানগত মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান, কল্পনার স্বাধীনতা ও অধীনতা দুয়ের মধ্যে যে মাত্রায় বিধৃত, কাহিনীর পরিচর্যায় যত্ন ও অযত্ন উভয়ের মধ্যে যে পর্যায়ে প্রকাশিত তার অস্বীকার মাত্রেই পীড়াদায়ক। আত্মজীবনী বাস্তব বলেই যে আবেদনগত তীব্রতা সে কাহিনীর স্বাভাবিক প্রাপ্য, এরকম ক্ষেত্রে আত্ম-কাহিনী সে মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মচরিত-রচনায় নিজস্ব কৌশল যদি তা রক্ষা করতে না পারে, উপন্যাস থেকে ধার করা ভাষা ও কলার ছল সে বঞ্চনাকে বাড়াবে বই কমাবে না। দেওয়ান সাহেব, মীর সাহেব ও নবীন সেন নিজেদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে কখনো কখানো এই অকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। সম্ভবতঃ নবীন সেনের স্বভাবের মধ্যেই একটা কলাশ্রয়ী অতিপ্রত্যয়ের প্রবণতা অত্যধিক পরিমাণে ছিল। তাই তাঁর জীবনী পাঠ করে প্রমথ চৌধুরীর যে ধারণা জন্মে, তা হল: "এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবন চরিত হলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।"

নবীন সেন সমকালের একাধিক প্রধান পুরুষদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে নৈপুণ্য ও স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন তা সামগ্রিকভাবে 'আমার জীবন'কে অধিকতর পঠনীয় ও রসপুষ্ট করে তুলেছে। একটি হ্রস্ব দৃষ্টান্ত :

ভগবানের কি রহস্য বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারী বাবু ও কৃষ্ণদাস পাল তখন বাংলার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, কিন্তু তিনেরি কদাকার। (১ম খণ্ড ১৪২ পৃ.)

এই চরিত্রচিত্রসমূহের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রথম ভাগে, বঙ্কিম দ্বিতীয় ভাগে, রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ ভাগে—এই ত্রিমূর্তিই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র তৃতীয় খণ্ডে, 'নবীনচন্দ্র সেন' পুস্তিকায়, ৫০ থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলো রয়েছে তা এই চরিত্রালেখ্যর শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমূহের সংকলন। চরিতমালার লেখকের মতে "নবীনচন্দ্র সেন স্বভাব-কবি ছিলেন, তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাহার কাব্যের কুচিৎ যোগ ছিল। এই কারণে 'আমার জীবন' লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দ্র, হিন্দুধর্মপ্রচারক নবীনচন্দ্র, স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্রের, আত্মম্ভরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্র কুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই।" এই সিদ্ধান্ত তর্কসাপেক্ষ। নিজের জীবনের অনেক সাফল্য ও সংকট-বর্ণনায়—যেমন প্রথম ভাগে পিতৃহীন যুবকের দুর্দশার চিত্র অংকনে তিনি তার প্রকৃত সংবেদনশীল কবি হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সূক্ষ্মতর অর্থে, তার কবিতার শক্তি ও অশক্তির মূলে যে অনিয়ন্ত্রণ, লঘুগুরু ভেদজ্ঞানের অস্থিরতা, আবেগ ও দুর্দমনীয় তরঙ্গোচ্ছ্বাস ক্রিয়াশীল, নিজের অন্তরঙ্গতম সত্তার এই মৌল পরিচয়কে নবীন সেন যথেষ্ট রূপে ব্যক্ত করেছেন। প্রথম অনুরাগের স্মৃতির উজ্জ্বলতর সাক্ষী :

অবশেষে উঠিলাম, আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকার বারণ্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুমস্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা। কি স্পর্শ। বুঝিলাম আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে

আরো বুকে টানিয়া ধরিল। আমার শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল। বালিকা আমার করে একটি গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে উর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। (১ম ভাগ পৃ. ৬০)

নিজের কাব্যপ্রবণতার স্বরূপ বর্ণনায় তা স্বপ্রকাশিত :

অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। (পৃ. ১২৯-৩০)

গীতিকাব্য রচনায় ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশে তিনি যে হেমচন্দ্রের চেয়ে শতগুণে বড়, এই দাবী সজোরে প্রচারের মধ্যেও এই মানসিকতা পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করতে বসে, তুলনীয় ঘটনা হিসেবে অবলীলাক্রমে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ঐতিহাসিক মিলনের চিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। বিষয় : রৈবতক কাব্য ও কবির কৃষ্ণভক্তির অংকুর-অনুসন্ধান।

কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে...তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সে চলিয়া গেলে, দর্শনমন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি একটি যুবতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাঁহাকে লইয়া যে ব্রজলীলা করিবে, রাসরাত্রিতে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া তাহাকে যে শ্রীভগবানজ্ঞানে

আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? সেখানে বসিয়াই ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল (চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১২৯)

দশ

এই প্রবন্ধের সূত্রপাত হয় মীর-আত্মজীবনীর সারাংশ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ভূমিকা হিসেবে বাংলা আত্মজীবনীর সাধারণ বর্ণনায় উদ্যোগী হই। আমাদের আলোচনার অন্তর্গত জীবনচরিত সমূহের সীমানা নির্দিষ্ট করেছি ১৯১৮ তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত প্রকাশের কাল পর্যন্ত। মীরের পর ও শিবনাথের পূর্বে প্রচারিত আত্মমানস উদঘাটনমূলক উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিত্র পাই মাত্র দুটো। এক রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', দুই 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)'। এই শেষের বইটি কেবল প্রথম অংশই আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় অংশে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও ভাষা বিষয়ক নানা তত্ত্বের তথ্যবহুল আলোচনা। এই অংশে ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে বা আত্মসত্তার তাৎপর্যপূর্ণ পরিমণ্ডলটি উজ্জ্বল করে তুলতে লেখক প্রয়াস পান নি। বাল্যকথা বর্ণিত হয়েছে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, চলতি বাংলায়। তারপর ২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বোম্বাই প্রবাসের কথা, সাধু ভাষায়। চিত্রটি যে প্রধানতঃ বোম্বায়ের, ব্যক্তির নয়, এ সচেতনতা সত্যেন্দ্রনাথেরও ছিল। দ্বিতীয় অংশের প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলে দিয়েছেন, "এই ভাগের অনেক কথা আমার প্রণীত 'বোম্বাই চিত্র' হইতে সংগৃহীত।"

'বাল্যকথার' প্রধান আকর্ষণ সত্যেন্দ্র-সত্তার বিশিষ্ট পরিবেশের প্রাণময় বর্ণনা, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক ইতিবৃত্ত। বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে পরিবারের মেয়ে-পুরুষের প্রভাব এত বিচিত্র পথে সঞ্চারিত যে, তার অনুধ্যান স্বভাবতঃই প্রীতিকর। অন্ততঃ দু'জন বহুশ্রুত ব্যক্তিত্বের বর্ণরঞ্জিত জীবনচিত্র এখানে আছে—যা অন্যত্র অপ্রাপ্য। একজন হলেন

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৬৪ সালে তিনি তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে পত্র লেখেন, তার স্মরণীয় উদ্ধৃতাংশটুকু এরূপ :

> আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়মাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।
>
> (মূলের বাংলা অনুবাদ, পৃ. ৭)

দ্বারকানাথ যখন ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার অন্তর্গত ওয়ার্দিংএর এক হোটেলে থাকতেন, তখন তাঁর 'সর্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারী, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জার্মান একজন, চিকিৎসক Mr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যকমত তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল।'' (পৃ. ৮) প্রোফেসর ম্যাক্সমুলার সত্যেন্দ্রনাথকে তার পিতার প্যারিসে বাসকালীন জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

> ১৯৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল।—তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল। দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন।

দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্খার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্বচনীয় আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন। (পৃ. ১১—১৪)

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কাব্য-সাধনা, তত্ত্ববিদ্যা-নুশীলন, গণিতশাস্ত্র চর্চ্চা, বাক্যরচনা-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, বাংলা রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবন, এমন কি তিনি যে "সাঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবুত ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত কারদানী করতেন তার ঠিক নেই।" (পৃ. ৪৬)—বড়দাদার সকল কথাই সত্যেন্দ্রনাথ বড় দরদ দিয়ে সরস করে বর্ণনা করেছেন।

এগারো

আলোচ্য কালের মধ্যে রচিত আত্মচরিত সমূহের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' সর্বশ্রেষ্ঠ। এক শ' বছর আগে শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালী যে ভাবোন্মাদনা ও কর্মানুপ্রেরণার জোয়ার অনুভব করেছিলেন, তার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণক হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশব সেন সকলের সান্নিধ্যই তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁদের স্নেহ, অর্থ, শ্রম স্বপক্ষে লাভ করে শিবনাথ নিজের অনেক পরি-কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সমর্থ হন। তখনকার উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দুর ধর্মীয় চেতনার মুক্ত বুদ্ধির আলো যে সাধনকর্মের পথকে দ্যুতিময় করে তোলে, শিবনাথ শাস্ত্রী সে পথেরই একজন ব্রাহ্ম পথিক ও পথপ্রদর্শক। স্বভাবতই তাঁর জীবনবৃত্ত যে মণ্ডলকে ঘিরে পূর্ণতা লাভ করেছে তার অন্তর কাহিনী আত্যন্তিক মূল্যে ঐশ্বর্যশালী। যেমন,

একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাঁকোর ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহর্ষি রাজনারায়ণ বাবুকে ও আমাকে বড় ভাল-

> বাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন, মহর্ষির নিকট যেন মণি কাঞ্চনের যোগ বোধ হইল, তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎস আনন্দে উৎসারিত হইতে লাগিল, তিনজনের অট্টহাস্যে অত বড় বাড়ী কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন, নানক আসিলেন, ঋষিরা আসিলেন, উপনিষদ আসিলেন, আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি, মহর্ষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে, মহর্ষির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে।...এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মনে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মহর্ষির হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না, নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যে তাহা ঘটিত। (পৃ. ১৫৭—৯)

ব্যক্তি চরিত্রের এই মহিমা ও পরিবেশের এই সম্মোহন শক্তি দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণের জীবন-জীবনীতেও বিদ্যমান। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' অতিরিক্ত আরো কিছু সদ্‌গুণের অধিকারী বলে তা সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

এই বিশেষ গুণটি শিবনাথের শিল্পীসত্তার দান। তিনি কর্মী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। কথায় তিনি দক্ষ কারিগর, তাঁর দৃষ্টি পরিণত শিল্পীর। "শৈশবে যেদিন পাঠাভ্যাসের জন্য বাবা আমাকে কলিকাতা আনিলেন সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে, বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্‌লায়, তেমনি আমার মা সেদিন হাম্‌লাইতে লাগিলেন।" (পৃ. ৯৩)

নিরামিষাশী শিবনাথ তাঁর তরুণ বয়সের পাঠানুরাগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> যখনই কোন ভাল গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষখণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপর পড়িতাম। (পৃ. ৪০)

আক্ষেপের বিষয় এই যে, "শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন দিকভ্রষ্ট সাহিত্যিক। ইহার অন্তরবাসী কবি মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।"[২৯] "ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-ভারতীয় সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলে তিনি যে কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার গ্রন্থ 'পুষ্পমালা' এবং উপন্যাস 'মেজ-বৌ' 'যুগান্তরে'ই পাই।"[৩০]

এই আত্মচরিতের লেখক কথা-সাহিত্য-রচনার সূক্ষ্ম কলাকৌশলকে অনায়াসে এবং অলক্ষ্যে নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় প্রয়োগ করেছেন। 'যুগান্তরে' প্রতিভার যে বিশিষ্ট পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আত্মচরিতেও তার প্রকাশ স্পষ্ট। 'আত্মচরিতের' অনেক চরিত্র প্রসঙ্গেই বলা চলে, "এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ।"[৩১] এতগুলো চরিত্র এত জীবন্ত ও নিপুণভাবে অন্য কোন বাংলা আত্মজীবনীতে চিত্রিত হয় নি। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র উদ্ধৃত করব।

প্রপিতামহের বয়স ৯৫ বৎসর। চোখ জ্যোতিহারা। শিবনাথ তাঁকে 'পো' বলে ডাকতেন।

> আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। পোর পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই জন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বাম হাতে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন, বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা আপ্‌সো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশ্যে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাঁত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশ্যে ছড়ি মারিতেছেন,

সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। সুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন, আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ, কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে, আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না, এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে, একবার হাতে হাত ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন, "উ, উ।" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পোর কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উ কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও।" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, 'হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, তবে ওই সব খাক', বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেড়াল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেড়াল হয়েছে।"

(পৃ. ৩৬-৩৭)

পিতা সম্পর্কে বাল্যস্মৃতি আরো রোমাঞ্চকর। তখন শিবনাথের সদ্য বিয়ে হয়েছে। নিজের বয়স বারো-তেরো। স্ত্রী প্রসন্নময়ীর ন-দশ। বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই

আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক জেঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়ীতে আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড় পিসীর মেজো ছেলে রামযাদব চক্রবর্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং দুই জনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিয়া বাড়িতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামী-মা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না, ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক পিসতুতা বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল। ইহার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে ভটচাষ্যি পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্বে আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন "তোরা কারে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হইতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়। বড়পিসী বাবার কানে মার নামে অনেক কথা চালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কিনা

জানি না, আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ কখনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোন দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপর থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না, জানিনা। যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলেন, হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুই হাত দিয়া রান্নাঘরের দরজার দুই কাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম, বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, মা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দা'খানা দাও দেখি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন "দা কেন?" বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও না।" মা দা খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানাখন্দ বন-জঙ্গল পার হইয়া ভটচায্যি পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম, "কে রে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা। তিনি আমার পিঠে দু ঘুষা দিয়া বলিলেন, 'খবরদার কাঁদতে পারবি না।" সে ঘুষা খাইয়া কান্না

গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি। এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন, মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে পালা পালা, মার খাবার জন্য কেন দাঁড়িয়ে থাকিস।" আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।" এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া এক-খানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে।' এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাইবোনে লুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসীকে এরূপ ধাক্কা মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মান, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না। বাবা বলিলেন, "আচ্ছা তবে দেখ। এই বলিয়া চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন

আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা খাইয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া গেলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই তিনজন লোক তাপিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে, বাবা আপনি তেল যোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া 'মা মা' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির নিকটস্থ জংগলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর একজন গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে বেঁচে আছে, তবে আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন। তিনি বড় ভক্ত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে 'ভক্ত কৃষ্ণচরণ' বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন, এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁহার কথা শুনিয়া জংগল হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং "বাবারে তুই কি আছিস?" বলিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু

> লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে রয়েছে, পাশের বাড়িতে কুটুমরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভালো হল?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘষিয়া নাকে খৎ দিতেছেন। (৪৮--৫১ পৃষ্ঠা)

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলক মণি এই গ্রন্থের উজ্জ্বলতম সম্পদ। বিশেষ করে পিতা হরানন্দ। শিবনাথ যখন পিতার কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এবং উপবীত ত্যাগ করেছেন, তখন

> "পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন কি, দুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে তন্মনস্কা আমার হস্ত-পদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন বলিলাম, "মা একটু তেল দাও, নেয়ে আসি," তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকরুণ, কথা কয়?" মা বলিলেন "কথা কবে না কেন?" শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল।...আর একদিন একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ও মা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?"
>
> যাহা হউক, বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।... শেষে বাবা আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে

আমাকে বিদায় দিলেন।... তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো বর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখ দর্শন করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।...

...কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। ...আমার পিতার ইচ্ছা নয় আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতকালে বাড়ীতে যাইতাম। তিনি লোক-মুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসিত। বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইতাম।...আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপ কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২৲ টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভালো হইত।" (পৃ. ৯৭-৯৮)

নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কেউ গোপনে বানচাল করতে উদোগী হোলে হরানন্দ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন, তার দৃষ্টান্ত:

"আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে কর্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ ব্যয়ের সাহায্যার্থে গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে, বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল।" (পৃ. ২০৫)

অপরদিকে হরানন্দ যে কতো সদাশয় ও পরোপকারী, উদার ও সন্তানবৎসল ছিলেন তারও একাধিক নজির এ বইতে মজুদ রয়েছে।

আত্মচরিতকার হিসেবে শিবনাথের মস্ত সৌভাগ্য এই যে নানা রকম দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অভিঘাত সারা জীবন বিচিত্র পথে এসে তাঁর মর্মে হানা দিয়েছে। সমাজ ও ইতিহাসের চোখে তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিকথা সাধারণ মানুষের পারিবারিক উত্থান-গ্লানি-বিপর্যয়ের শোনিত ধারায় উজ্জীবিত; যতখানি তা ব্যক্ত হয়েছে, ততখানিই কীর্তিমান পুরুষ অন্তরংগ সুহৃদে পরিণত হয়েছেন। শিবনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মনের কথা, দেহ-মনের কথা, তাঁর সাধ্যমতো বলতে চেষ্টা করেছেন। স্বভাবগত 'অধ্যাত্মিক শুচিবাই'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে সমর্থ হন নি বটে, কিন্তু প্রধান কীর্তিসমূহের মূল্যবান দলিলের ফাঁকে ফাঁকে মানবীয় বিকারের এই পরিমিত স্বীকারোক্তি ইতিহাসকে স্পৃহনীয় করে তুলেছে। বর্ণিত চরিত্রের মূলগত গৌরব তাতে কোথাও বিকৃত হয় নি। পাঠকের শ্রদ্ধাবোধ কখনো পীড়িত হয় নি। মীর সাহেবের জীবনেও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার অভাব ছিল না। 'আমার জীবনী'র মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বনই হলো মীর সাহেবের প্রথম প্রেমের মর্মান্তিক শোকাবহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার পটভূমি নির্দেশ, তার ঘনায়মান জটিলতার প্রস্তুতি, তার পরম মুহূর্তের ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যান সবই এতটা উদ্দামতা, নাটকীয়তা ও অতিকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত যে তাকে সকল সময় ঠিক আত্মজীবনীর এখতেয়ারভুক্ত বলে মনে হয় না। রচনাকারীর জীবনের অপরিহার্য যশ, খ্যাতি-দীপ্ত মহত্ত্ব দৃশ্য অদৃশ্য সূত্রে হৃদয়ের গোপন লীলার সংগে আগাগোড়া গ্রথিত নয় বলে, আবেদন অনেক ক্ষেত্রে নিছক শিহরণমূলক এবং উপন্যাসোচিত। মীর-মানসের একটি প্রধান ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে সপত্নীবাদকে কেন্দ্র করে। এই বিষবৃক্ষ যেন মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে হলেও শিবনাথের গার্হস্থ্য জীবনের বিক্ষোভের মূলেও জায়া। দুই পত্নী। প্রথম পত্নী যখন

ত অষ্টাদশবর্ষীয়া তন্বী তখন শিবনাথের পিতা কোনো কারণে পুত্রবধূকে

জীবনের মতো তার পিতৃগৃহে নির্বাসিত রাখার সংকল্প নেন এবং শিবনাথকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। উভয়ের প্রতি নিজের আচরণে টানা-পোড়েন, প্রচারিত অধ্যাত্ম আদর্শ ও মানবোচিত স্বভাবের বিপরীতমুখী তাগাদায় জর্জর হয়ে শিবনাথ অনেক নিঃসংগ বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তার কিছু কিছু কথা শিবনাথ বলেছেন সংকোচের সংগে, শংকার সংগে। অতি পরিমিত আকারে। অতি নিম্ন কণ্ঠে।

> আমার পত্নীদ্বয় ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাকে (দুর্গামোহন দাস) অনেক কথা বলিলাম, এ-সকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।[৩৪]

একুশ বৎসরের শিবনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীর সংগে নানা রকম পরামর্শের পর স্থির করেছিলেন

> যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয় আমার পিতামাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না (পৃষ্ঠা ৭৯)। পত্নীকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। আমি কর্তব্যবোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম।...প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া

কোনো ভাল কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়। তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "না গো। মেয়েমানুষের আবার ক'বার বিয়ে হয়।" তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল।...আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

কিন্তু আর এক দিক দিয়া আমার এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সংগে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্কুলঘর ও কেশববাবুর আপিস ঘর ভিন্ন বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? দূরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। অবশেষে প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম।...শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বারান্দায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজমোহিনী মনে করিলেন তিনি এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোর বিষাদে পতিত হইলেন, তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

(পৃ. ১১২-১১৩)

আরো কিছুদিন পর :

একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যেভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না।

> তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন, এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাহার সঙ্গে যাপন করিব।...
> ...বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে। (পৃ. ১১৮—১১৯)

তারপর আরো পরিণত বয়সে:

> আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া পরিবারদিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতায় কর্মস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন গিয়াছিল। (পৃ. ১৪০—১৪১)

অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের আধুনিক কালের অব্রাহ্ম পাঠক এই সংগ্রামের বিস্তৃততর ইতিহাস আরো অকুণ্ঠিত স্পষ্টতার সঙ্গে বিবৃত হলো না বলে আক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না যে, যা বর্ণিত হয়েছে, তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় অপরিসীম।

বার

বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রধানতঃ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মনের কথা। এই বই প্রকাশিত হবার পর আরো উনিশ কুড়ি বছর উনি বেঁচে ছিলেন। কৃষ্ণকমল মারা যান ইং ১৯৩২ এ, বিরানব্বই বৎসর বয়সে। "তিনি ছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর, ফারসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত

করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি কৃতবিদ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্র সমাজে পূজ্য ছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সংকল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে দ্বিজেন ঠাকুর পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন কোন স্বদেশী বিদেশী কৃতি পুরুষ নেই যাঁর সান্নিধ্য ও সংঘাত, কর্ম বা চিন্তা ক্ষেত্রে তিনি তীব্র ভাবে উপলব্ধি না করেছেন। এই কারণে এই গ্রন্থে যে রীতিতে আত্মমানস বর্ণিত হয়েছে, যে রসে তা ভরে উঠেছে সেটা রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের সংগে তুলনীয়। কৃষ্ণকমলের আত্মকাহিনী, বলা বাহুল্য, ব্যক্তি জীবনের কালানুক্রমিক অভিজ্ঞতার উদঘাটন নয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সূত্র ধরে আলোচনা প্রসংগে নিজের ও যুগের চিন্তার নানা উজ্জ্বল ছবি তিনি এঁকেছেন। আশপাশের মানুষেরা রক্তমাংসের সজীবতা নিয়ে সেই তত্ত্বালোচনায় বাস্তব জীবননাট্যের প্রাণ সঞ্চারিত করেছে। "পুরাতন প্রসংগে" এই জন্যে খুব সংগত কারণেই পুরাতন কালের বহু সংখ্যক মণীষীদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাকে সূচীপত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যদিও কঁৎ মিলের জীবনচিন্তার অন্তরংগ বিশ্লেষণ কৃষ্ণকমলের জীবনদর্শনকেই ব্যক্ত করেছে, তবু আমরা এই গ্রন্থের যে অংশ সমূহ পাঠ করে সবচেয়ে বেশী হৃদয়স্পন্দনের স্মৃতি অনুভব করি সে হল যেখানে লেখক নিজের ধ্যান-ধারণার সংগে আমাদের অতি পরিচিত সেকালের কোন চিন্তানায়কের জীবনবোধের সম্পর্ক বিচার করেছেন। যেমন—

> বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না, যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত

তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস্য করিতেন, ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হা রে ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?" ললিত উত্তর দিতেন, "আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার?" বিদ্যাসাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন আরম্ভ হয়, যখন আমাদের সমাজের অনেক ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সে বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমার এই পূর্বস্মৃতি বিবৃত করিতে বসিয়া যাঁহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারীলাল, জজ দ্বারকানাথ...

আমি Positivist, আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসংগ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—"কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক, he can write and he can fight, and he can slight all things divine. (পৃ. ২২৮-২৩০)

এই পর্যায়ের জীবন চিত্রণের মধ্যে কৃষ্ণকমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুন-সৃষ্টি বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে, বিদ্যাসাগরের জীবনাচরণ

ও সাহিত্য-প্রীতি যে সমালোচনার উর্ধে নয়, এরকম কঠিন কথা সেকালে কেন একালেও এত স্বল্পশ্রুত যে, এই অংশের আবেদন তীব্ররূপে চাঞ্চল্যকর না হয়ে পারে না। কয়েকটি উদ্ধৃতি :

বিদ্যাসাগরের মুখের বুলি ও লেখার ভাষা :

> কথাবার্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ; মেকলে ডা: জন্‌সন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinism ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাংলা slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া', (to be confounded), 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিদঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সেদিকে যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয় শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বুনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও সেই অর্থে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন, অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি "সমারোহে" ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না----ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না, উহা একেবারেই ভুল।

একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা'। এই শব্দটি ন্যায় শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়---Fitness per se। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই----একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ। আমরা এক দেশের লোক, একজাত, এই শহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা করলেই পারতেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি, স্বদেশীর সঙ্গে আসা-যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।' অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়াছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন--- 'এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্ছে তবুও হিন্দি বলা হবে না!' (পৃ. ৪৭---৪৯)

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের পরশ্রীকাতরতা :

বিদ্যাসাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতন্ত্রের নিকট আর কাহারও আসন

হইতে পারে, একথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে যেমন জগৎ-সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে, নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের ---আমাদের যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,---এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল।

শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণকারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন---অষ্টাদশভাষাবার-বিলাসিনীভুজংগঃ (the fancy-man of eighteen courtezans of Languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।...

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন।... বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।'

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজীতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখিতে মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বলে বেড়ায়—'ইংরাজী আমি যৎসামান্য জানি, যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে তা সংস্কৃত শাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন—বাপ্‌রে ইংরাজীতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে। এইরূপ কোন আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোন পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই, তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য, তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দিকে দেদীপ্যমান, কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধও এইজন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।' রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ কোথায় ভাসিয়া গেল।

ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন,—সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজি ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলা ভাষার গঠন বিষয় কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যে যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখতে টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (পৃ. ৫০—৫৩)

বিদ্যাসাগরের খ্যাতির অপর পিঠ :

বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা

বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না।

আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর সাহেবদের কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্বে আমি যে তাঁহার literary jealousy-র কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। সাহেবদের নিকট পশার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না, তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও। Mrs. Besant হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল, প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রসব। (পৃষ্ঠা ৮৬–৮৭)

কালীপ্রসন্ন, বংকিম, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্পর্কেও অনেক উল্লেখযোগ্য উক্তি এ বইতে রয়েছে। বিহারীলাল যে 'যাবজ্জীবন, 'দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়া দেহ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন' এবং সাহস ও

অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী জাতির সেরূপ খুব কমই আছে'—একথাও বলেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। (১৭৩ পৃষ্ঠা)

এই গ্রন্থের আরেকজন কথক হলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অভিনেতার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে তিনি অতি সংক্ষেপে (১২৫-১৬২ পৃষ্ঠা) বাংলা রংগমঞ্চের উন্মেষ ও বিকাশ ধারাকে জাজ্জ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'পুরাতন প্রসংগের' লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত যদিও সকল প্রসংগের অন্তরালে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছেন, তথাপি যেখানে তিনি স্বপ্রাশ সেখানেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ভূমিকা অংশের কয়েক পৃষ্ঠায় আত্মকাহিনীমূলক রচনা পাঠের উৎকণ্ঠা ও আনন্দের স্বরূপকে প্রসংগক্রমে হলেও অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত করেছেন:

> হারানর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রিটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে-মাটি তিনি নিজে কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ্‌ড়া করিয়াছিলেন, যে-মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে ত, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সানবাঁধান হইয়াছে। সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীকপুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে, মাটি মাখো, মাটি মাখো। (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

তের

'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' গ্রন্থে বাঙ্গালী সিপাহী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

'সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করিয়া সেকালে যে কয়জন দেশীয় লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাশীর সৈয়দ আহমদ খান, কানপুরের নানক চাঁদ, এলাহাবাদের ভোলানাথ চন্দর এবং বাংলা দেশের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।' পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কাল ১২৯৮ থেকে ১৩০৩। তখন রচনাটির নাম ছিল 'আমার জীবন'। নাম যাই থাক না কেন গ্রন্থখানি আদৌ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনের ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক সিপাহী বদ্রোহের কালে যেসব বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা দুর্গাদাসকে বিচলিত ও অভিভূত করেছে আশ্চর্য কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা ও পুংখানুপুংখতার সংগে এ বইতে তা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য সংস্করণের (১৯৫৭ ইং) পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৮ । ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিদ্রোহ-পূর্ব ও বিদ্রোহ-বহির্ভূত বিষয়ের বর্ণনা। দুর্গাদাসের সামাজিক পরিচয়, সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি (পৃ. ৫০-৬৩) এবং বাজার দর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসংগত বর্মা মুলুকের মগ (পৃ. ২২-২৯) ও নাই-নিতাল কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ নর্তকী সম্প্রদায় (রামজানি) সম্পর্কে (পৃ. ৬৩) অনেক সূক্ষ্ম, সরস ও অজানিত কথা বলা হয়েছে। এরপর বিদ্রোহের কথা। আট সংখ্যক ইররেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের হিসাবরক্ষকের চাকুরি নিয়ে দুর্গাদাস সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। রেজিমেণ্টের সংগে ১৮৫৭তে দুর্গাদাস যখন বেরিলীতে এসে পৌছুলেন তখন চারিদিকে আসন্ন বিদ্রোহের উত্তাপ ও উৎকণ্ঠা ভালভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। বিদ্রোহের প্রকৃত বিস্ফোরণ হল রবিবার ৩১শে মে। এই বিদ্রোহে বিপর্যস্ত এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত, তার প্রবল আঘাতে চালিত ও তাড়িত দুর্গাদাস যেন বিদ্রোহের এক ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংগ। দুর্গাদাস বিদ্রোহের বাহ্য ঘটনাবলীকে অতি নিকট থেকে দেখেছেন, অতি নিকটে থাকার জন্যে তার বিষাগ্নির আঁচ এড়াতে পারেননি এবং এই নৈকট্য তাঁর ইংরেজমুগ্ধ বীর হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না বলেই বিদ্রোহের জটিলতম ঘটনাবর্ত ও তরংগাভিঘাতের সংগে

অনিবার্যভাবে যুক্ত থেকে একাধিক ক্ষেত্রে তার মর্মদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্রোহের প্রথম দিবস বর্ণিত হয়েছে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তৃতীয় দিনের বর্ণনা শেষ হয়েছে ১২৪ পৃষ্ঠায়। ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চতুর্থ দিনের কথা। এমনি করে, ১৪ই জুন পর্যন্ত বেরিলীর মুসলিম সিপাহী ও অভিজাত নাগরিক, হিন্দু বেনে, শেঠ, সন্ন্যাসী, সৈনিক ও ইংরেজ শাসক সেনাপতিবর্গের দশা-দুর্দশার কথা দুর্গাদাস পরিণত চাতুর্যের সংগে লিপিবদ্ধ করেছেন; প্রাথমিক সাফল্যের পর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ পর্বে ১৭০ পৃষ্ঠায় বইয়ের ১ম খণ্ড শেষ। বিদ্রোহী শিবির থেকে কোনক্রমে পালিয়ে দুর্গাদাস আগষ্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বেরিলীতে থাকেন। ৩১৪ পৃষ্ঠায় দুর্গাদাস বর্ণনা করেছেন কি করে একের পর এক বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি ইংরেজ শিবির নাইনিতালে গিয়ে পৌঁছুলেন। গ্রন্থের বাকী অংশ ইংরেজের কথা। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েও তাঁরা যে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে কৌশলে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেছেন, তার কাহিনী দুর্গাদাস দরদ দিয়ে বলেছেন। বিদ্রোহ দমিত, গ্রন্থও সমাপ্ত।

কাহিনীকারের শেষ বাণী :

> আবার বেরিলীতে ইংরেজদের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এখানেই আমার জীবনচরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে। (পৃ. ৪১৪)

দুর্গাদাস প্রভুভক্ত ইংরেজ ভৃত্য। স্বভাবতই তাঁর বর্ণনায় ইংরেজপ্রীতি ও ইংরেজদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জাহীন। তবু প্রশংসার বিষয় এই যে, দুর্গাদাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। বেরিলীর ফজলুল হককে গুণ্ডা ও বদমায়েশ বলেছেন বটে (পৃ. ১১৪), কিন্তু পরে তাঁর যে জীবন্ বৃত্তান্ত পেশ করেছেন তা থেকে আমরা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তেও পৌঁছুতে পারি। (পৃ. ১৭৬)। বিদ্রোহী সেনাবাহিনীদের উন্মাদনাকে ঘৃণ্যবর্ণে চিত্রিত করেও স্বীকার করেছেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে

সেটা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (পৃ. ১৬৯, ১০০)। বেরিলীতে বিদ্রোহীরা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে সকল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাতে হিন্দু ধনপতি ও রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজের দাস দুর্গাদাস যে সর্বত্র সিপাহী আন্দোলনকে নিছক মুসলিম সিপাহী ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর হেয় ষড়যন্ত্ররূপে বিচার করেন নি, তাঁর পক্ষে এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। দুর্গাদাসের মানস-প্রকৃতি ছিল নাগরিক, সৌখিন, মজলিসী। নিজের অবশ্যকরণীয় নওকরী ছাড়াও তিনি নর্তকীর কদর করতে জানতেন, নানারকম সংগীতের রসজ্ঞ সমজদার ছিলেন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে কলাবিলাসী নাগরিকদের আদর আপ্যায়নে তুষ্ট রাখতেন। হিন্দু বাঙালী সিপাহী এত ষোল আনা ইংরেজদের গোলাম হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বিচিত্র রসের পিপাসা ও আস্বাদন দুর্গাদাসের রোজনামচাকে সর্বজন-পাঠ্য সাহিত্য-কর্মের মর্যাদা দান করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা, গোলা-বারুদের বিস্ফোরণ ও রণনীতির নিষ্ঠুরতার অন্তরালে যে সকল মানবিক দ্বন্দ্বশঙ্কা, প্রেম-উৎকণ্ঠা স্বতন্ত্র নিয়মে ক্রিয়াশীল ছিল তার অকপট স্বীকারোক্তিও এখানে একাধিকবার লক্ষণীয়।

দুর্গাদাস বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করায় "বখ্‌ত খাঁ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, 'ইংরেজ আওর বাঙালী সব এক হ্যায়। তুমকো নেহি মালুম হ্যায়, কি, হাম আভি তুমারা গরদান কাটনেকো হুকুম দে সকতে হে। নিমক হারাম! বেঈমান! হাজার রুপেয়া তন্‌খা ভি কবুল নেহি করতা? খুব মালুম হ্যায় কি ইংরেজকা সাথ তুমহারী সাজিস হ্যায়'।" (পৃ. ৯৪) কিন্তু বিদ্রোহী সেনাদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক মহম্মদ সফী নিজের ব্যক্তি গত ওয়াদা রক্ষা করতে তবু পশ্চাদপদ হননি! তাঁর কল্যাণে দুর্গাদাসকে সাধারণ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হল না। বিদ্রোহী সৈনিকদের পর্যন্ত যা জোটে নি, সেই আটা, ঘি, হিন্দু-রক্ষী মারফৎ লাভ করলেন। মহম্মদ সফীর সৌজন্যের সুযোগ

নিয়ে পলায়নে পর্যন্ত সমর্থ হলেন। এরকম একবার নয় কয়েকবার ঘটেছে। নাইনিতালে ইংরেজদের সংগে মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে আরেকবার তিনি হলদোয়ানিতে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়েন।

> পূর্বোক্ত সদ্দারের আর দুইজন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল হকের সম্মুখে সমানীত করিয়া সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি কোন কথার উত্তর করিলেন না। কেননা, তখন তিনি জানু পাতিয়া মালা হস্তে 'ওজিফা' পড়িতে-ছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবী 'ওজিফা' সমাপ্ত করতঃ দুইটি হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত-লোচন, সে ভীষণ মূর্তি দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা স্বীকার করিলাম না। মৌলবী অতি পৌরুষ এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'তু কোন হ্যায় ?' আমি ইতিপূর্বে বিদ্রোহী সৈন্য-দের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, এখানে তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, 'তু আপনে তঁই চাপরাশী বানাতা হ্যায়—সব ঝুঁটা বাত হ্যায়, চাপরাশীকা গুপ্তগু এইসী সলিব নেহী হোতী হ্যায়। তু কাফরোঁকো রসদ পৌছাতা হ্যায়। লে অব উসকা মজা চখ্।' এই বলিয়া সর্দ্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ইসকো কল ফজর তোপমে উড়া দেও।'
>
> (পৃ. ২১৯)

সে রাতের মুসলমানস্পৃষ্ট পানি পান করতে অস্বীকার করায় হিন্দু বাহকের হাত দিয়ে দুধ, জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। 'বুঝিলাম সত্য সত্যই মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে।' (পৃ. ২২৫)

পরদিন সকালে :

> আমি যে স্থলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব সাহেব দুইজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

তিনি আমাকে উত্তমরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একজন প্রহরী আমার বন্ধন শিকলসমূহ শিথিল করিয়া ভীমরবে কহিল 'খাড়া হো যাও।' আমার ওষ্ঠাগত প্রাণ, উত্থানশক্তি এক রকম রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম এই বুঝি তোপে উড়াইবার বা নাসা-কর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল। দুর্গতিনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব---সেই গভর্ণর---দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, 'বাবু সাহেব। আপ হিয়া ক্যায়সে আয়ে?' ···(পৃ. ২২৬) তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। ক্রমশ: গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সৌম্যমূর্তি নবাব সাহেব ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, 'বাবু সাহেব! কাঁদিবেন না, বড়ই সংকট কাল। চোখের জল শীঘ্র মুছিয়া ফেলুন। কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন।' আমি মৌলবী ফজল হকের নিকট চাপরাশী বলিয়া যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন।

নবাব সাহেব আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'বাবু সাহেব। পহিলে মেরা গরদান হোই কাটেগা, পিছে আপ্‌কা। আপ্ কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।' অন্য কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চস্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন।... (পৃ. ২২৭)

সেই চুন্না মিয়া আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলবী ফজল হকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, 'আমি ঐ বাদীকে চিনি, ঐ ব্যক্তি ভাল মানুষ, বেরিলীতে চাপরাশীর কাজ করিত এবং সংগতিপন্ন ছিল। উহার ভ্রাতা নাইনিতালে আছে, ইহা আমি জানি। তাই ও ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। রসদ পৌঁছিবার সংগে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এ ব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান

রাজ্যের মংগলাকাংক্ষী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।' এইরূপ নানা কথা চুন্না মিয়া ফজল হককে বুঝাইয়া বলিলে, ফজল হক কহিলেন, 'হুজুর। আপ মালিক হ্যায় যো আপ জানতে হেঁ তো ছোড় দিজিয়ে।'...(পৃ. ২২৮)

আমার সেবার জন্য চুন্না মিয়া চারি জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বাজার হইতে নববস্ত্র আনিয়া দিল। আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, চাল, ডাল, আলু, আটা ও অন্যান্য মসলাসমূহ আনীতহ ইল। মাটির উনান তৈয়ার হইল।

বলা বাহুল্য. আমার মুক্তির সংগে সংগে আমার প্রার্থনানুসারে টাটুওয়ালা ও সেই নবীন হিন্দুস্থানী যুবকেরও মুক্তিলাভ হয়।

(পৃ. ২৩১)

মুক্তিলাভ করে দুর্গাদাস ইংরেজদের সংগে যোগ দেন এবং বিদ্রোহ-দমনে এক বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা বদান্যতামূলক রণনীতিবিরুদ্ধ আচরণ ছাড়াও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর দুর্বলতার ও ব্যর্থতার অনেকগুলো কারণ দুর্গাদাস গ্রন্থের নানা স্থলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতালাভের অন্ত-র্দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক বিশৃংখলা সেগুলোর মধ্যে প্রধান। যে অভিজাত শক্তি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণে তৎপরতা প্রকাশ করেন, তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল মধ্যযুগীয়, নেতিবাচক। তাঁদের চারিত্রিক সত্তাও ছিল মজ্জাহীন। হলদোয়ানি-নাইনিতালের চরম সংগ্রামে বিদ্রোহীদল যে আত্মঘাতী অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দেয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেন:

এই সময় আট দশটি তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং আড়াই সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীগণ যদি নাইনিতাল আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহাদের নাইনিতাল করতলগত হইত। ইংরজ একটি মাত্র গোর্খা পল্টন লইয়া কিছুতেই তখন

> নাইনিতাল রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ, বেরিলী হইতে প্রায় এগার হাজার সৈন্য নাইনিতাল আক্রমণার্থ পাঠাইয়াছেন। তাহারা কিন্তু হলদোয়ানি প্রভৃতি নানা স্থানে আডডা করিয়া বসিয়া আছে, কেবল শুভকালের প্রতীক্ষা করিতেছে।—এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডায়, আলস্যে এবং উপেক্ষায় দিন কাটিতে নাইনিতাল আক্রমণ আর করা হইল না। (পৃ. ৩২২)

রসদের অপ্রাচুর্য, পাহাড়ীয়া অঞ্চলের সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে সৈনিকদের মধ্যে হল্লা, রেশারেশি, নেতৃবৃন্দের অন্যান্য দুর্বলতার সংগে যুক্ত হয়ে এই এলাকার বিদ্রোহীদের পতন আশু এবং অনিবার্য করে তুলল।

'বিদ্রোহে বাঙালীর' আবেদন মূলতঃ রোমাঞ্চকর। কি করে বাংগালী সিপাহী দুর্গাদাস বিদ্রোহের কবলে পড়ে বাড়ি, ঘোড়া, টাকা হারালেন, (পৃ. ৬৯-৭৮), বন্দী হলেন, মৃত্যুর দণ্ডাদেশে বধ্যভূমিতে নীত হয়েও মুক্তি পেলেন, পলায়নের পথে ঘোর নিশাকালে ভয়ানক অরণ্যে দিশাহারা হলেন (পৃ. ২৪২-২৬৩), ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনার ভার পেলেন, বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন—এসকল লোমহর্ষক কথাই এই বইতে বর্ণময় রূপ লাভ করেছে। এই শিহরণমূলক কাহিনীর ধুনটের ফাঁকে ফাঁকে দুর্গাদাস যে অপরিচিত জগতের মানুষ ও আচরণের প্রাণপুষ্ট স্মৃতিচিত্র এঁকে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তার সমগোত্রীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

নিছক সিপাহী বিদ্রোহের আলেখ্য হিসেবেও বইটি মূল্যবান। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নেকনজরে দেখতে পারেনি। এর মধ্যযুগীয়তা তাকে স্বাধীনতার এই প্রবল বিক্ষোভ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে দেয়নি। মুসলিম-শাসন সম্পর্কে বৈরীভাব ও তুলনায় পাশ্চাত্য শাসকবর্গ সম্পর্কে মোহ বিদ্রোহ-প্রসংগে তাকে ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হতে দেয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে মিউটিনী সম্পর্কে মাত্র সাড়ে তিন লাইন লিখেছেন :

> জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ মিউটিনী ঘটে, এবং আমাদের কলেজ পটলডাঙ্গা হইতে উঠিয়া বহুবাজার রোডের

তিনটি বাড়ীতে থাকে। মিউটিনী থাকিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে। (পৃ. ৩৫-৪৩)

রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইংরেজ এবং ইংরেজাশ্রিত হিন্দু নগরবাসী বিদ্রোহের বিস্ফোরণে কি পরিমাণ আতংকিত ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন উভয় গ্রন্থকারই তা সকৌতুকে বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনার পেছনে ইংরেজের প্রতি বক্র অনুকম্পা যেমন স্পষ্ট তেমনি বিদ্রোহীদের প্রতি অবিশ্বাসও দৃঢ়মূল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিচিত্র পর্যায়ে জাতিবৈরিতা কি অনুপাতে মিশ্রিত তার স্বরূপ নির্ণয়ে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা রচনামাত্রেই বিশেষ সাহায্য করবে। 'বিদ্রোহে বাঙালী' যে এ-ক্ষেত্রে অতি প্রামাণ্য এবং বিস্তৃত দলিলরূপে গৃহীত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্গাদাস তাঁর আশেপাশের নাগরিক ও সামরিক জীবনের গঠনপ্রকৃতি যে রীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন তার সূক্ষ্মতা ও পুংখানুপুংখতার তারিফ অন্যত্র করেছি। তৎকালীন বাজার দর ও দুর্গাদাসের নিজস্ব ধন-দৌলতের সংকেত বহনকারী একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধৃতি নজীর হিসেবে পেশ করে 'বিদ্রোহে বাঙালীর' বর্ণনা শেষ করব।

আমার বাটীতে মা-কালীর নামে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ বলিদান হইত। দুই সের করিয়া মাছের বরাদ্দ ছিল। ঘৃত, দুগ্ধ. দধি, মাখন—এ সকল চালাও ছিল। খাইতাম আমরা দুই ভাই। এত বড়-মানুষি সত্ত্বেও যে মাসিক খরচ খুব বেশী হইত, তাহা নহে। তখন বেরিলীতে একশত সিক্কার ওজনে এক টাকায় আড়াই সের ভাল ঘৃত পাওয়া যাইত। আমার চাউল আসিত অতি উৎকৃষ্ট। পিলিভিটের নিউরিয়া নামক এক স্থান আছে, তথাকার চাউল প্রসিদ্ধ। মিহি চাউল লম্বা লম্বা দানা। সম্মুখে সেই চাউলের ভাত বাড়িয়া দিলে মল্লিকা ফুলের সুগন্ধে যেন সে স্থান আমোদিত করিত। সেই চালের মণ ছিল ৩।।০ টাকা। এখন সে চাল ১২৲ টাকা মণেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রাশি চাল ১।।০ বা

২৲ টাকা মণ ছিল। উৎকৃষ্ট আটা ১৲ টাকায় ৩২ সের পাওয়া যাইত। খাঁটী দুধ টাকায় ৩০ সের। বাজারে দুধ (মহিষের) এক পয়সা সের। হিন্দুস্থানীরা মাছ-মাংস বড় অধিক খাইত না। বেরিলীর মুসলমান-গণ মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত। মাছের সের /০ কখনও ৵০। রুই, কাতলা, পুঁটি মাছ মিলিত। পাঁঠা একটার মূল্য ৷৷০ হইতে ১৲ টাকা।... ভাল আম চারি আনায় বা পাঁচ আনায় একশত। খুব খাস আম আট আনা শ'য়ের উর্ধ্বে কৈ, আমি কখনও দেখি নাই। (পৃ. ৪৩)
বেরিলীতে যখন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫৲ মূল্যে এক লৌহ-সিন্দুক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সিন্দুকের ভিতর বেরিলীর বাসায় আমার টাকা থাকিত। মোহর, টাকা, নোট এই তিন রকমে ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রবল ছিল না, কোম্পানীর কাগজের সুদ অতি কম বলিয়া আমি ঐ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনি নাই। নগদ টাকা তোড়াবন্দী করা সিন্দুকে থাকিত। (পৃ, ৪৫)
ব্রহ্মদেশে সর্বরকমে আমার মাসিক কিছু কম চারি শত টাকা মাহিনা ছিল। ব্রহ্মদেশে আমার এক পয়সাও খরচ ছিল না। মাহিনার টাকা সমস্তই জমিত। (পৃ. ৪১) ব্রহ্মদেশ হইতে আমি প্রায় বার হাজার টাকা আনিয়াছিলাম। ..বেরিলীতে তখন আমার মাসিক মাহিনা ছিল ১৬৫৲ টাকা (পৃ. ৪৬)। আমার নিকট যে ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ধার দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।.. অনিচ্ছাসত্ত্বেও এরূপভাবে ধার দেওয়ায় আমার লোকসান কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রায় আট নয় শত টাকা সুদ পাইতে লাগিলাম। সকলেরই নিকট মান্য ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইলাম। (পৃ. ৫০)

চোদ্দ

ডঃ জনসন মনে করতেন যে কেবলমাত্র স্বরচিত হলেই তাকে আদর্শ জীবনচরিত বলা যেতে পারে। অন্যথায় ত্রুটি-বিচ্যুতির অশেষ সম্ভাবনা।

কারণ কারো জীবনচরিত রচনা করা মানে সে ব্যক্তির কর্ম-জীবনের নানা ঘটনা ও কীর্তিসমূহের একটা খানাতল্লাসীমূলক অতি দীর্ঘ ক্লান্তিকর তালিকা তৈরী করা নয়। জীবনচরিত তাহলে সাহিত্যের অঙ্গ না হয়ে সমাজ বিজ্ঞানের ভূষণ বলে বিবেচিত হত এবং কেবল সত্যাসত্যের বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডেই তার মূল্য নিরূপণ করা যেত। সেরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে কারো জীবন বর্ণিত হয়নি তা নয়।

> কোনো কোনো জীবনচরিতকার তাঁদের গ্রন্থে কেবল তথ্য জড়ো করে গেছেন। তাও এমন জাতের যা সাধারণের অধিগম্য দলিল দস্তাবেজ থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারতো। তাঁরা কেবল ব্যক্তির কীর্তিকলাপের কালানুক্রমিক তালিকাই প্রস্তুত করেছেন, জীবনী রচনা করেননি। নায়কের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আচরণ সম্পর্কে এতই ঔদা-সীন্য প্রকাশ করেছেন যে, লেখকের সকল শ্রম ও পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি যে এই বংশ-পদবী জন্মমৃত্যুর নির্ভুল তারিখ সম্বলিত বিপুল গ্রন্থটি পাঠ করার পরিবর্তে যদি আমরা বর্ণিত চরিত্রের ভৃত্যের সঙ্গে ক্ষণকাল আলাপ করার সুযোগ পেতাম তাহলে সে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অনেক বেশী পরিমাণে জানতে পারতাম।[৩৬]

আমরা সাহিত্য-বিচারে এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ অহেতুক মনে করি। "জীবনী-কারের কাজ হলো যে সকল কর্ম ও কীর্তি ব্যক্তির স্থূল গৌরবের কারণস্বরূপ সেগুলোর উপর স্বল্প গুরুত্ব আরোপ করা। সদর এলাকা ত্যাগ করে প্রবেশ করতে হবে অন্দর মহলে, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের গোপনতম কন্দরে। প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সহজ আচরণের ক্ষুদ্রতম ঐশ্বর্যকেও অনাবৃত করে উপস্থিত করতে হবে ব্যক্তিকে—সেখানে অন্যের সঙ্গে তার প্রতি তুলনা শুধুমাত্র মানবোচিত ক্ষমতায় ও দুর্বলতায়।"[৩৭] ব্যক্তিসত্তার এমন হার্দ্য উদ্‌ঘাটন অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া দুরূহ। অথচ এ কাজটি সুসিদ্ধ না হলে জীবনী-পাঠের আসল আনন্দই মাটি।

> জীবনচরিতে বর্ণিত মহৎ জীবনের ভিত্তিভূমিতে পাঠক যখন এমন মানবীয় ভাব ও কর্মের সন্ধান পায় যার সঙ্গে তার মতো

সাধারণ সামাজিকও একাত্মবোধ করতে পারে, তখনই সে আনন্দ লাভ করে। অন্য কোন শ্রেণীর রচনাই পাঠকের চেতনাকে এত দ্রুত সজাগ করে তোলে না, এত মুগ্ধ করে রাখে না, এত অনুকরণসাধ্য আদর্শের দ্বারা সংক্রামিত করে না। বাইরের বসন ভূষণ, ভাগ্যচক্রে লাভ করা যশ-প্রতিপত্তি—এগুলো থেকে আলাদা করে মানুষকে বিচার করলে দেখা যাবে যে তার অনেক ভালো-মন্দো গুণাগুণ অন্য কারো থেকে স্বতন্ত্র নয়। একই বাসনার দ্বারা আমরা চালিত, একই মোহে আচ্ছন্ন, একই আশায় উদ্দীপ্ত, বিপদে বিচলিত, কামনায় বিজড়িত, আনন্দে বিভোর।[৩৮]

মূলত: জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর শিল্পরূপ একই রসের আবেদনকে মূর্ত করে তুলতে প্রয়াসী। সংজ্ঞানুসারে আত্মচরিত হল স্বরচিত জীবনচরিত।[৩৯] বিদ্যাসাগর সম্ভবত: নিজেই নিজের বইয়ের নামকরণ করেন 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)'। জীবনী ও আত্মজীবনী উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে তা কতোটা তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করেছে, জন্মমৃত্যুর বন্ধনীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অন্তহীন রহস্য মহনীয়রূপে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নাটক নভেলে সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য শুধু এই যে শিল্পীর কলারীতির বিনোদনে যে মোহই বিস্তার করুক না কেন, পাঠকের এ বিশ্বাস অটুট থাকা চাই যে কল্পনাহীন বাস্তবই এখানে সার্বভৌম।

এই প্রসঙ্গে পাঠকের আরো একটি দাবী বিচারযোগ্য। জীবনী বা আত্মজীবনীতে শিল্পরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্রটির কি সামাজিক ও লৌকিক সত্য হিসেবেও মূল্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়? যদি তিনি ইতিহাসের কোনো সুবিদিত মহৎ ও স্মরণীয় পুরুষ হন, মনে হয় যেন. আত্মচরিতকারের পক্ষে তাহলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রত্যাশিত আনন্দ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পাঠক যেন আগে থেকে খালি আসন হৃদয়ে প্রসারিত করে রেখেছেন, মনের মানুষ মনের মতো করে এখন দখল চাইলেই অলংকৃত ও উল্লসিত বোধ করবেন।

জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে যে অনৈক্য তা প্রধানত: রূপগত, ধর্মগত নয়। জীবনচরিতে লেখকের নিজস্ব ধ্যানধারণার অতিপ্রক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তার কারণ অনমান করা কঠিন নয়। লেখকের নিজের জীবনের প্রিয় বিশ্বাসের অনুমোদন, অনুসন্ধান ও তার প্রতিফলন আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক সারবান জীবনালেখ্যকে একপেশে অনির্ভর-যোগ্য চিত্রে পরিণত করেছে। কিন্তু আত্মজীবনীতে লেখকের নিতান্ত নিজস্ব ক্রোধ, পেম প্রীতি, সংস্কার বিশ্বাস, সাধনা সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া কর্ম সবই অতি অন্তরংগ রূপে বর্ণনীয়। যত তিনি ব্যক্তিগত হবেন, রচনায় শুধু মাত্র নিজেকে ব্যক্ত করবেন, নিজের চিত্ত ও চরিত্রের গূঢ় মর্ম প্রকাশে সক্ষম হবেন, নিজের বিদিত সত্তার বিকাশ যে সকল তুচ্ছ মহৎ ঘটনাবস্তুর অধীন ছিল তার বর্ণনা শোভন ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপে করতে পারবেন, ততই অটোবায়োগ্রাফিটি চমৎকারিত্ব লাভ করবে।

পাঁচ

বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রকৃত জীবন তাদের আত্মজীবনীসমূহকে শিল্পকর্ম নিরপেক্ষ হৃদয়গ্রাহিতায় ভরে রেখেছে; রাসসুন্দরী দাসীর আত্মকাহিনী সে মহিমার সুযোগ গ্রহণে অপারগ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কর্ম-জীবন তুচ্ছ ও নগণ্য না হলেও তুলনায় বিবর্ণ। মীর মশাররফ হোসেন সমকালীন জীবনবোধের কোন প্রধান ধারাকে সূচিত বা নিয়ন্ত্রিত করবার অবকাশ পাননি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের যে নবীন উৎকণ্ঠা ভাবে ও কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর নাগরিক জীবনকে চঞ্চল করে তুলেছিল তার সান্নিধ্য বর্জন করে মীর সাহেব আজীবন মফস্বলে কাটিয়ে-ছেন। নতুন যুগের নির্মাণকারী সহযোগী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কথা যতো অবলীলাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাদের আত্মকথায় উল্লেখ করেছেন মীর সাহেবের তা সাধ্যাতীত ছিল। তার 'আমার জীবনীর কথ্যবস্তুর লৌকিক পরিমণ্ডলটি দেশের হিন্দু-মুসলিম মানসের

বিবর্তন বৃত্তে কোন অসাধারণ গৌরবের দাবীদার নয়। 'আমার জীবনী'র শিল্পমর্যাদা কোন অকল্পিত, সুপ্রচারিত কর্মরাশির পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেনি। এ এক প্রকার নিরবলম্ব একক সত্তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার রোজনামচা মাত্র, বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্ত জয় করেছে। মীরের সার্থকতা জনৈক ব্যক্তির 'মনের কথা' প্রকাশ করায়। মীর সাহেব তার দক্ষ কারিগর। অন্দর মহলের কথা তিনি জানেন এবং বলতে জানেন। কিন্তু এ অন্দর-মহলের সদর এলাকায় আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত ভাব ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতি অনুজ্জ্বল, দুর্নিলক্ষ্য।

ষোল

একটি একেবারে মৌল প্রশ্ন আমরা এযাবৎ এড়িয়ে গেছি। 'আমার জীবনী'তে মীর সাহেব মনের কথা খুলে বলবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন বটে, কিন্তু আমরা পাঠশেষে প্রশ্ন না করে পারি না: সত্য সত্য কি 'মনের কথা' প্রকাশ লাভ করেছে? স্বরচিত বলেই কি সরল অর্থে সকল আত্মজীবনী লেখকের আত্মসাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য দলিল বলে গৃহীত হবে? ডঃ জনসন অবশ্য অনেক আশা নিয়ে বলেছিলেন যে, 'জীবনচরিত স্বরচিত হলেই তা সম্পূর্ণ সত্যমূলক হওয়া সম্ভব।" আমরা সংশয়বাদী রচনাকারী হয়তো সত্য-কথনে কুণ্ঠিত নন। নিজের চিত্ত ও কর্ম ব্যাখ্যা করার মানসিকতাও হয়তো তার আছে। কিন্তু সত্তার সার প্রকাশ করা, নিপুণভাবে তাকে ব্যক্ত করা শিল্পকর্ম হিসাবেই ক্ষমতাসাপেক্ষ। এক-আধজন প্রতিভাবান আত্মচরিত লেখক হয়তো একটা প্রশংসনীয় নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বমানস বিচারে ও বিশ্লেষণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অপরের জীবনবৃত্ত রচনায় জীবনীকার যে শবব্যবচ্ছেদকারীর নির্বিকারত্ব নিয়ে পুরাতন তথ্যের স্তূপের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করে বেড়াতে পারেন, নিজের জীবনের গোপন-অগোপন, উচু-নীচু গ্লানি-গর্ব সম্পর্কে সেরকম অকুণ্ঠিত বেপরোয়া মনোভাব শতেকে একজনের মধ্যে মিলতে

পারে। নিকলসন সাহেবের মতে এখন পর্যন্ত সে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করেনি।[২৯]

ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে আদালতের কাঠগড়ায় যে সাক্ষ্যদান করা হয়, উকিল মাত্রেই জানেন যে, তা অকাট্য সত্য নয়। লেখকের জবানবন্দীও মিশ্রিত সত্য মাত্র। সত্যভাষণের নানা স্তরে আত্মজীবনীকারের প্রকাশ-ব্যগ্র চেতনা সঞ্চরণশীল। তার মধ্য থেকে নির্জলা লৌকিক সত্যটি উদ্ধার করতে হলে অনেক সময় বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়। বিচিত্র উৎস থেকে আহরিত বাহ্য প্রমাণ ও আন্তর নজীরসমূহকে পরস্পরের আলোতে পরখ করে তারপর আমরা এক একটি গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে যে সকল বৃত্তান্ত মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন পত্রিকা-পুস্তকে প্রকাশিত হতে দেখেছি তার অনেক কথাই কোনো বিশুদ্ধ বিচারের ফল নয়, নিছক অনুমান, না হয় সরল চিত্তে গৃহীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত মীরেরই কোনো উক্তি।

মীর সাহেব তাঁর শেষ বয়সে রচিত এই আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম প্রণয়ের ওপর যে নাটকীয় ও রোমান্স রস আরোপ করেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করে না। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে এই প্রেমের ব্যর্থ পরিণতির বর্ণনা। অনেক ক্ষেত্রেই তা উপন্যাসে চিত্রিত হৃদয় লীলার কাহিনীর মতো সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। এই কাহিনী রচনায় মীর সাহেবের একটা বড় কৃতিত্ব এই যে, মূল পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনাচ্ছলে কোথাও নিজেকে তিনি প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে বৃহদায়তন করে আঁকেননি। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর প্রিয়তমা যখন নিশ্চিন্ত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে—সেই অন্তিম চিত্র রচনার কালেও মীর মশাররফ ঝাঁড়ফুঁক, তুড়মী, ইত্যাদি বাজীকরী বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতা ঘোষণায় একটুও নিম্নকণ্ঠ বা পরিমিতবাক নন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রখর প্রেমের দীপালোকে যে চরিত্রটি এই গ্রন্থে ঝলমল করে উঠেছে তিনি মানব নন, মানবী; মীর মশাররফ হোসেন নন, ইনি তাঁর পরিপক্ক কৈশোরের অতি পরিণত প্রেমিকা, তাঁর মানসসুন্দরী। আঙ্গিক ও আবেদনের এই বিশিষ্ট

পরিচর্যা। মীরের 'আমার জীবনী'কে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মচরিতগুলো থেকে পৃথক করে রেখেছে। কেবল মাত্র নবীন সেনের 'আমার জীবন' অংশত এর জ্ঞাতিস্থানীয়। সেখানেও প্রথম প্রণয়ের একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে যার নায়িকা অতিশয় কিশোরী হলেও প্রেমের বাসনা ও কামনাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত করতে জানে এবং কিশোর নায়কও রঙ্গমঞ্চীয় পটুত্বের সঙ্গে সে লীলায় অংশ গ্রহণ করেছে।[৪১] প্রথমে প্রেমের আদর্শায়িত বর্ণনায় প্রগল্‌ভ আরেকজন প্রবীণ পুরুষ হলেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।[৪২]

সাতেরো

যে সকল রন্ধ্র পথে আত্মজীবনীতে মিথ্যাচার প্রবেশ করে[৪৩] তার একটি হল মানুষের স্মৃতির স্বাভাবিক ক্ষয় প্রবণতা। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতি সাধারণতঃ কুয়াশাচ্ছন্ন। যে স্পষ্টতা, অখণ্ডতা ও ধারাবাহিকতা নবীন ও মীরের রচনায় দীপ্যমান তা এই কারণেও অনেক পাঠকের কাছে স্থান-বিশেষে কল্পনারোপিত বলে মনে হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্বরচিত জীবন কাহিনীতেও লেখক রস সম্পাদনের মোহে আত্মবিস্মৃতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। মীর সাহেবের চেয়ে নবীন সেন এই মোহের বেশী বশ। তৃতীয়তঃ যে স্মৃতি অপ্রীতিকর তাকে পরিবর্জন করার মানবসুলভ মোহের প্রবণতা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। চতুর্থতঃ যে অভিজ্ঞতা গ্লানিকর হেয়বোধের সংগে বিজড়িত তাকে অবদমিত বা একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়ার প্রবৃত্তি থেকেও কোনো আত্মচরিতকার মুক্ত নন। পার্থক্য শুধু এই যে সে বিলুপ্তি কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন।[৪৪] দেহের বিকার বর্ণনায় মীর সাহেব যতটা অকুণ্ঠ হতে পেরেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মজীবনী লেখকের তুলনায় স্মরণীয়। পঞ্চম, স্মৃতি যে কেবল সময়ে ক্ষয়ে যায় বা রচয়িতার ইচ্ছায় লোপ পায় তাই নয়, পরিণত বয়সের পরিবর্তিত মানসের অনেক নতুন যুক্তিব্যাখ্যায় মণ্ডিত হয়ে তার রূপান্তরও ঘটে। প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মীর সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে যে তীব্র তিক্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন, মৃত প্রেমিকার চরিত্রকে যে আবেগ নিয়ে

আদর্শায়িত করেছেন তার কতটা প্রকৃত অবস্থার অনুসারী তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল আজিজ-উন-নিসা। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। প্রচুর হাসতে পারতেন। এই নবীনাকে যখন বিয়ে করেন তখন মীর সাহেবের বয়স সাড়ে সতেরো। এই বিয়ের আট বছরের মাথায় মীর সাহেব যে মাসিকপত্র সম্পাদন করেন তার নাম ছিল 'আজীজন নেহার'। নিশ্চয়ই পত্রিকা একদিনে প্রকাশিত হয়নি, তার জন্যে দীর্ঘ কাল জল্পনাকল্পনা করতে হয়েছে। তখন নামকরণের পেছনে যে পতিহৃদয় ক্রিয়াশীল ছিল তার স্বরূপ পত্নীবৈরিতার আলোকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। পারিবারিক সংবাদ পরিবেশনে মীর সাহেব যে অনেক সময়ে রচনাকালীন মুহূর্তের পরিবর্তনশীল ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হতেন তার অন্য দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে। নিজের পিতামাতার, বিশেষ করে মাতার অসন্দিগ্ধ অকৃত্রিম অমলিন পতিপ্রেমের যে চিত্র 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়' এঁকেছেন,[৪৫] 'আমার জীবনী'তে তার বিরুদ্ধ সত্যকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন।[৪৬] এই জন্যে ইতিপূর্বে আমরা এরকম মত প্রকাশ করেছি যে, মীর-জগৎ ও মীর-মানসকে সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৯০৯), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৯০৯), 'আমার জীবনী' (১৯১০) ও 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করতে হবে, এক বইয়ের দুই চরণের মধ্যবর্তী অনুক্ত মর্মকে অন্য বইয়ে উদ্ঘাটিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার দ্বারা খোলাসা করে নিতে হবে। মীরের অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা কালে আমরা আমাদের এই বক্তব্যকে আরো বিশদরূপ দান করতে সচেষ্ট হব। ইতিমধ্যে মূলের সংগে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক, এই উদ্দেশ্যে 'আমার জীবনীর' দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের পৃষ্ঠানুক্রমিক সংকলন পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

তথ্য-সংকেত

১ মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', কলিকাতা ১৩১৫।
রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপের দৌলতে ১৯৫৬ সালে একবার

মার্কিন মুলুকে যাওয়ার পথে এবং আরেকবার ১৯৫৮তে মার্কিন মুলুক থেকে ফেরার পথে চার হপ্তা কোরে দুবারে মোট আটহপ্তা লণ্ডনে বই ঘাঁটার সুযোগ পাই। এই সময়ে মীর সাহেবের গ্রন্থটি কমনওয়েলথ রিলেশন্স্ লাইব্রেরীতে পাঠ করি। এই সুযোগ লাভের জন্য আমি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

২ প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা', কলিকাতা ১৩৫৩।

৩ বিপিন বিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসংগ', কলিকাতা ১৩২০।

৪ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্রোহে বাঙালী' কলিকাতা ১৯৫৭। প্রথম প্রকাশ ১২৯৮—১৩০১, মাসিক 'জন্মভূমি'তে।

৫ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', কলিকাতা ১৩১১।

৬ রাসসুন্দরী দাসী, 'আমার জীবন', কলিকাতা ১২৭৫।

৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)', কলিকাতা ১৮৯১।

৮ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় 'আত্মজীবন-চরিত', কলিকাতা ১৩০৩।

৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী', কলিকাতা ১৮৯৮।

১০ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', কলিকাতা ১৯০৯।

১১ নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', পাঁচ খণ্ড, কলিকাতা ১৯০৮— ১৯১৩।

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', ১৯১১—১৯১২।

১৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)', কলিকাতা ১৯১৫।

১৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', কলিকাতা ১৯১৮।

১৫ প্রমথ চৌধুরী পূর্বোক্ত, পৃ. ৸৴০

১৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৫৫ মাঘ, পৃ. ২৮২—২৮৩।

১৭ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ.১৪৬-৭। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১৯১৪)

২য় খণ্ডে, রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীর এক সুবৃহৎ অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধ লিখবার সময় তা আমার নজর এড়িয়ে যায়।

১৮ ঐ, পৃ. ১৪৮।

১৯ 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)', বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৪৪ ফাল্গুন। এই সংগ্রহে মুদ্রিত 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)'-এর বিজ্ঞাপন।

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চারিত্র পূজা,' বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬১, পৃ. ১৬-১৭।

২১ গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৫, পৃ. ১৭২, দ্রষ্টব্য।

২২ 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী', পূর্বোক্ত, ভূমিকা পৃ. ৴৹।

২৪ 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।

২৫ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

২৬ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য়, খণ্ড, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ. ৮।

২৭ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাব্যমালা', ১৩২৭, পৃ. ৬৫।

২৮ সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

২৯ ঐ, পৃ. ৩২৫।

৩০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শিবনাথ শাস্ত্রী', সাহিত্য সাধক-চরিতমালা ৭৫, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃ. ৪১।

৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক সাহিত্য', বিশ্বভারতী ১৩৫৫, পৃ. ১০৫।

৩৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'ইংলণ্ডের ডায়রী', কলিকাতা ১৩৬৪, পৃ. ১৯।

৩৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত এবং রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত পৃ. ৯৯-১০১।

৩৬ Brown, E. P. Arranged & Compiled, *The Critical Opinions of Samuel Johnson*, Princeton University press, 1926, pp, 25-26.

৩৭ ঐ।

৩৮ ঐ।

৩৯ সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', কলিকাতা ১৯৫৬। লেখক সোমেন বসু ৩য় পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আত্মজীবনী শুধু ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী ঘটনা পারম্পর্য রক্ষিত ধারাবাহিক জীবনকথা নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনী।" এই সংজ্ঞা সার্থক জীবনী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। সোমেন বসুর বইটি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা শেষ হবার পর হাতে পড়ে। সাধারণ বিষয়বস্তু এক হলেও, আমাদের উভয়ের আলোচনার রীতি এক নয়। সিদ্ধান্ত সমূহও পৃথক। তাছাড়া গোটা তিনেক বই ছাড়া ওঁর ও আমার আলোচনার এলাকা ঐক্যহীন। এসব মনে করে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হলাম না।

৪০ Nicolson,, H. *Development of English Biography*, London, 1927, p. 15.

৪১ নবীন সেন, 'আমার জীবনী', ১ম খণ্ড,, ১৯০৮, পৃ. ৬০।

৪২ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

৪৩ Maurois, Andre'; *Aspects of Biography*, Cambridge, 1929, Chapter 5, pp. 131-160 :

৪৪ শরীরকে সাহিত্যে স্থান দিতে বাঙালী লেখক নিতান্ত কুণ্ঠিত ও নারাজ। বিলেতের ভিক্টোরীয় সাহিত্য এবং স্বদেশের ব্রাহ্ম চিন্তা-নায়কদের অপরিমিত শালীনতা পূজার প্রভাবই হয়তো আমাদের সত্যদমনের স্পৃহাকে জিইয়ে রেখেছে। দ্রষ্টব্য, শিবনারায়ণ রায়, 'সাহিত্য চিন্তা', পৃ. ৬১-৬২।

৪৫ মীর মশাররফ হোসেন, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কলিকাতা ১৮৯০, ষড়বিংশ তরঙ্গ, পৃ. ১৩৪-১৩৮।

৪৬ মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী' 'পূর্বোক্ত' পৃ. ২৪৪।

বিবি কুলসুম

১.০. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা চারিটি। এই শ্রেণীর রচনাকে ভিত্তি করে মীরের জীবনচিত্র আঁকতে হলে আরম্ভ করতে হয় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' দিয়ে। এই গ্রন্থের আত্মজীবনী-মূলক অংশের বর্ণনীয় বিষয় পিতামাতার দাম্পত্যজীবন ও নিজের বাল্য-জীবনের কথা। 'আমার জীবনী'তে পাব কিশোর যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে কর্মজীবনের ফিবিস্তি। 'বিবি কুলসুম' মীরের দাম্পত্যজীবনের আরশী। গ্রন্থটি একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। এইটেই মীরের সর্বশেষ রচনা। পরিপূর্ণ সুখের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে প্রিয়তমা পত্নী কুলসুমের মৃত্যুতে। স্বামী শোকার্ত হৃদয়ে মৃত পত্নীর জীবনী রচনা করেছেন। আবেগের প্রবাহ প্রতিরোধ করার প্রবৃত্তিই তখন গ্রন্থকারের নাই। স্নেহ-ভালবাসার স্মৃতির দ্বারা তাড়িত হয়ে লেখক ঘরের এবং মনের এমন অনেক ছোটবড় কথা লিখে গেছেন যা হয়ত অন্যরকম মানসিক অবস্থায় উল্লেখ নাও করতে পারতেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভাষাকে বেগবান করে তুলেছে। অনুভূতির আন্তরিকতা সামান্য কথনকেও এক বিশেষ উষ্ণতা দান করেছে। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'আমার জীবনী'র পরই হয়ত 'বিবি কুলসুম' সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী রচনা। মীর-মানসের অবক্ষয়ের কালে 'বিবি কুলসুম'ই একমাত্র রচনা, যার মধ্যে গ্রন্থকারের পরিণত শিল্পচেতনার সকল চিহ্ন অবলুপ্ত নয়।

১. কুলসুম বিবির জন্মস্থান 'জিলা নদীয়ার মহকুমা কুষ্টিয়ার থানা নওপাড়ার বারখাদা গ্রাম'। দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১২৬৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ সদরদ্দী, ওরফে সদু শেখ। মাতার নাম লাজন। বাল্যাবস্থায় কুলসুমের নাম ছিল কালী। নদীয়া জেলায় সে-সময়ে অনেক মুসলমানেরই যে হিন্দু নাম রাখা হোত, সে কথা

সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা লেখক উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন যে কৃষ্ণনগর কুষ্টিয়ায় এক সামসুদ্দীনকে সতীশ, মকদুমকে মদন বোলে সম্বোধন করা হোত। মুসলমান ছেলের নন্দ, গৌর, কালচাঁদ, হরে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি নামও চালু ছিল।

২. ২. প্রণয়ের উন্মেষ ও পরে পরিণয়ে পরিণতির বর্ণনায় গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব নাটকীয় বর্ণনাশক্তির অনুশীলন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর নবীন যুবক মীর মশাররফ হোসেন ঘোড়ায় চড়ে, বালিকা কুলসুমদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে, সালঘর মধুয়ায় পিতৃবন্ধু টমাস কেনীর কুঠিতে যাতায়াত করতেন। প্রায় তিন চার বছর কিছু ঘটেনি। তারপর:

> একদিন বেলা দুই প্রহর সময় দেখি, আমাদের গ্রামের দক্ষিণের মাঝিদিগের পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। ফাল্গুন মাস, বাতাসও একটানা।....একটি যুবতী একাই দৌড়িযাছে, আগুনের তাড়না, তাহার পর দুইটা ঘোড়ার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়া ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর বাঁচাও বলিতেছে। দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল।
>
> সেই যে দেখিলাম, চিনিলাম, পূর্বে দেখিয়াছি, আজ ঘটনাক্রমে দেখিলাম। ঘরপোড়া আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না, ঘোড়ায় তাড়া না করিলে আমার বক্ষের মাঝে লুকাইত না। অভয় দান করিলাম। বক্ষে বক্ষে স্পর্শ হইল। সে সুখে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রতি রক্তবিন্দুতে, আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া দেহ মন উষ্ণতর প্রবাহে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি দেখিতেছি কুলসুম কাঁপিতেছে। তাহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। আমার বক্ষে তাহার বক্ষ, আমার কণ্ঠে তাহার মস্তক।...

সে সময়ে এক 'রত্নবতী' ছাড়া লেখকের অন্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মীরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু' প্রকাশিত হয় ১২৭৯তে। এই হিসাবে কুলসুমের বয়স তখন এগারোর বেশী হওয়ার কথা নয়। মীরের

পঁচিশ। শতবর্ষ পূর্বের প্রেম তাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা অনুভব করেনি। তখনকার হৃদয়ের অনুভূতি বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন :

> কুলসুম ভিন্ন জগতে আমার কেহ নাই, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মালাদিগের ঘরপোড়া আগুনের কণামাত্র রহিল না। নির্বাণ হইয়াছিল। কিন্তু কুলসুম তাহার হৃদয়স্থ অগ্নি আমার হৃদয়ে যে পরিমাণ অনল ঢালিয়া গিয়াছিল তাহা কিছুতেই নির্বাণ হইল না। সে অদৃশ্য অনলের মহাশক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে কোন এক রাতে কৌশলে কুলসুমকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সকাল বেলা কুলসুম বিনদীয়ার হজরতের কাছে মুরিদ হলেন। সেই রাত্রেই মীর ইজ্জত আলী নেকাহ্ পড়ালেন। দেন মোহর ঠিক হয় পাঁচহাজার টাকা। নেকাহ্ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে সকলে পীরের উচ্ছিষ্ট সরবত পান করেন। সম্ভবতঃ এটা ১২৮০ সাল। ১২৮১তে কুলসুম বিবিকে সঙ্গে করে মীর সাহেব নিয়মিত যমুনা নদীতে নৌকাভ্রমণে বার হতেন। 'কত কথাই বলিতাম। কথা কিছুতেই ফুরাইত না।'

২. ৩. দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে মীরের দাম্পত্যজীবন সুখে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রন্থকার স্বীকার করেন যে এই বিবাহের আগে তাঁর চরিত্রে অনেক প্রকার দোষ ঘটেছিল। প্রথম পত্নীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে গৃহে কোন শান্তি খুঁজে পান নি, দোকানে বাজারে ক্ষতিপূরণ অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। কুলসুম বিবির সঙ্গে ধর্মসঙ্গত মিলনই তাকে রক্ষা করে। প্রায় ছত্রিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনে কুলসুম বিবি একাদশ সন্তানের জননী হন। পতিঃপ্রেমলাভের সৌভাগ্য ঘোষণা করে কুলসুম নিজেই প্রতিবেশিনীকে বলেছেন :

> দিদি, আমি আমার জীবনে...বিপরীত দেখিলাম। ক্রমে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভালবাসারও সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই বৃদ্ধি...। ক্রমে দিন দিন বেশী আদর-যত্ন।

প্রৌঢ় বয়সে স্বামীকে বলেছেন :

> ধর্ম্মতঃ তোমার গা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, পূর্ব হইতে, আমার যৌবন কাল হইতে এখন তোমাকে চতুর্গুণ ভালবাসি। আর কিছুই নহে।

> সুখ ভোগ আমি যত করিয়াছি, স্বামীর ভালবাসা প্রেম আমি যত লাভ করিয়াছি, এই চক্ষে আমি কাহাকেও আমার সমান স্বামীসুখে সুখী খুঁজিয়া পাই নাই।

নিজের সুখের কথা জাহির করতে মীর সাহেব নিজেও কম আগ্রহশীল নন :

> ১২টার মধ্যে স্নান আহার শেষ করিতে হইবে, আমার বাঁধা নিয়ম। একত্র আহার করিয়া আমি কাছারিতে চলিয়া যাইতাম। কাছারি হইতে আসিয়াই উহার উরুদেশে মাথা রাখিয়া আমি একটু ঘুমাইব। ৩০ মিনিটের বেশী নহে। তাহার পর জাগিলেই আমার হাত পা টিপিয়া দেওয়া কুলসুম বিবির কর্তব্য ছিল। ৭টা বাজিলেই উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া পুস্তক পাঠ, না হয় গ্রামোফোন গান শুনা অথবা দুজনে তাস খেলা করা। রাত্র আটটা বাজিলেই আহার, আহারের গোলমাল মিটিতে দশটা বাজিয়া যাইত। তাহার পরে আমার নিজ লিখার কার্য। যেই ১২টা বাজিয়া গেল আমিও শয্যায়। কুলসুম বিবি যেদিন নূতন কোন লিখার কথা শুনিতেন, সেদিন আর শয়ন শয্যায় যাইতেন না। লিখা শুনিয়া পরে শয়ন করিতেন। তিনি রাত্র ৪টা বাজিয়া না গেলে, বিছানায় শুইতেন না। শৌচাগার গমন, বস্ত্র পবিবর্তন প্রভাতীয় উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে চা, আণ্ডা, আলু সিদ্ধ আমার জন্য প্রস্তুত।
>
> আমি আমার জীবনের সাংসারিক সুখ বিবি কুলসুমের জন্য বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি।

২. ৪ কুলসুম বিবির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে লেখক অনেক অন্তরঙ্গ তথ্য প্রকাশ করেছেন। কুলসুম অসামান্য সুন্দরী ছিলেন না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুশ্রী মহিলা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হন। হাসি-ভরা মুখ। তবে লেখক বলেছেন যে, কুলসুম তেজস্বী মহিলা ছিলেন, সময় বিশেষ খুবই রেগে যেতেন। যেমন,

যদিও তাঁহার আহার সামান্য, কিন্তু ক্ষুধা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ক্ষুধা হইলে অস্থির হইতেন। ক্রোধের সীমা থাকিত না। রমজানের রোজার সময় তিনটা চারটার পর বিশেষ আবশ্যক না হইলে তাঁহার নিকট যাইতাম না।

কুলসুম বিবি যৌবনে বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, পুস্তকাদি পড়া বিশেষ যত্ন করে শিক্ষা করেন। তিনি স্বাধীনতা ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" আওড়াইতেন। স্বামীর বই বিক্রীর টাকা পয়সার হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল বিবি কুলসুমের। এমন কি অর্ডার মোতাবেক ডাকযোগে বই ভি, পি, করে পাইঠাবার ভারও মীর সাহেব ওঁর ওপর ছেড়ে দেন। "পুস্তক বিক্রয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪৲ আয় হইতে লাগিল"।

কুলসুম বিবি স্বাধীনতা ভালবাসলেও নানা কারণে স্বদেশী আন্দোলন পছন্দ করতেন না। সম্ভবত: আন্দোলনকারীদের পছন্দ করতেন না কিংবা আন্দোলনের পরিমাণ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না।

ঘরে তণ্ডুল নাস্তি ওদিকে ধনকুবের অদ্বিতীয় রাজশক্তি সম্পন্ন ব্রিটিশ-জাতি, বিদ্যাবুদ্ধিতে জগতশ্রেষ্ঠ। সভ্যতায় জগতে সর্বজাতির আদর্শ এবং অগ্রণী। বিচার ক্ষেত্রে স্থির ধীর। এমন নিরপেক্ষ রাজার অসন্তোষের কারণ, বিরক্তির কারণ করিয়া লাভ কি হইবে?

পত্নীমত অনুমোদন করে মীর বলেন:

যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশহিতকর সভায় যাইতে পারেন। দুবেলা উপোসের হাঁড়ি মাথায় করিয়া পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিত সাধন, সভায় যাইয়া কৃত্রিম ভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভাসমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্ত নই।

সভাসমিতিতে যোগদান সম্পর্কে মীর-মানসের নির্লিপ্ততা যে সম্ভবত: ব্যক্তি-গত দ্বেষবিদ্বেষ প্রসূত তা প্রকাশ পেয়েছে কুলসুম বিবির এক পরামর্শে:

তোমাকে কাব্যবিশারদ পত্র লিখিয়াছে, সাবধান বিশারদের কথায় ভুলিও না। তোমাকে ছ মাস পর্যন্ত কি ভোগান ভোগাইয়াছেন।

দশ হাজার বিষাদ-সিন্ধু সস্তাদরে লইয়া খবরের কাগজের জন্য উপহার দিবে। মনিবে তিন মাস, চাকরে তিন মাস ঘুরাইয়া দিব্বি খাতির করেছে। ওর নাম মুখে আনিও না। ওরূপ সভায় আমি তোমাকে যাইতে দিব না।

২. ৫. মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'। 'বিষাদ-সিন্ধু'র অন্যতম শিল্পকীর্তি মানব চরিত্রের রহস্য উন্মোচন। দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি সপত্নীবাদের বহ্নিশিখায় কি করে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, শিল্পী তার এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। মীর-মানসের এই জীবনদৃষ্টির মূলে হয়তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আজীজন বিবি কুলসুম বিবিকে কখনই সহ্য করতে রাজী হননি। স্বামীর হৃদয় জয় করার আশা পরিত্যাগ করে সতীনের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন, "মীর সাহেব আলীর সহায়ে নুরুদ্দীন ডাকাতের সাহায্যে কুলসুমকে জগৎ হইতে সরাইতে পরামর্শ আঁটিয়াছেন"। চেষ্টা সফল হয়নি, ফল বিপরীত হয়েছে। মীর সাহেব হৃষ্টচিত্তে মন্তব্য করেছেন:

> সপত্নী হিংসাবাদে দিন দিন মনের গতি ও সদিচ্ছা সকল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমাকে বাধ্য করিবার জন্য শাসননীতি আরম্ভ করিলেন, শাসনে, গর্জনে, কুলসুম সহিত শত্রুতাচরণে তাহাকে জব্দ করিবার মানসে নানা প্রকার কৌশল জাল গোপনে গোপনে বিস্তার করা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। দিন দিন তিনি এক সিঁড়ি করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। প্রাচীন কথা,
>
> পিয়া জেসকো চাহে
> ওহি সোহাগন হায়।।

২. ৬. গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মীরের সন্তানাদির জন্মের তারিখ এবং জন্মস্থানের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১২৮৬ সালে, ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার দিবাগত রাত্রে প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা ডাক নাম সতী, ভাল নাম রওসান আরা। দুই বৎসর পরে আরেক

কন্যা। এক বৎসর বয়সেই এই কন্যা'র মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর এক পুত্র, ডাক নাম সত্যবান, ভাল নাম মীর এব্রাহিম হোসেন। এই ১২৯২ এর দিকে চরম আর্থিক অনটনে সমগ্র পরিবার বিশেষ কষ্ট ভোগ করে। 'ভাতে কাপড়ে কষ্ট।' ১২৯২ সালে মীর সাহেব দেলদুয়ার চলে যান, শ্রীমতী করিমন্‌নেসা সাহেবার স্টেটের ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে। এই দেলদুয়ারের বাটিতেই ১২৯২ সালের ৯ই আশ্বিন চতুর্থ সন্তান কন্যা আমিনা খাতুন জন্মলাভ করে। ডাক নাম ছিল কুকি। ১২৯৩ সালে একবার লাহিনীপাড়া যান। ১২৯৪ সালের ১লা আশ্বিন জমজ কন্যা জন্ম নেয়। একজনের নাম ছালেহা ওরফে সুনীতি, অন্যজন সালেমা ওরফে সুমতী। কার্তিক মাসে টাঙ্গাইলের নতুন বাসায় উঠে আসেন। ১২৯৫ সালের ১৩ই মাঘ পুত্র আশরাফ হোসেনেব জন্ম, ডাক নাম রণজিত। টাঙ্গাইলের বাসা বাড়ীতেই ১২৯৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ জন্মলাভ করে পুত্র মীর ওমর দরাজ, ডাক নাম সুধন্যা। ১২৯৯-এর ২৩শে আষাঢ়, পুত্র মীর মহবুব হোসেনের জন্ম, ডাক নাম ধর্ম্মরাজ। পরে আরও এক কন্যা ও এক পুত্র লাভ ঘটে। শেষের দুজনই সম্ভবত: লাহিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে।

২. ৬. এই বইয়ে মীর মশাররফ হোসেন প্রায় কোন কথাই রেখে ঢেকে বলতে চাননি। আত্মকথা বর্ণনা করতে বসে কেবল সত্য, সমগ্র সত্য এবং সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই লিপিবদ্ধ করবেন না, মীর সাহেব অনেক স্থলে এই রকম সংকল্প গ্রহণ করেন। স্থলবিশেষে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, অকথনীয় প্রসংগের অবতারণা করে আমাদের অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছেন। ১২৯৩-এর দিকে কি করে এক শ্যামবর্ণা ইঙ্গ বঙ্গ বারবণিতার 'গর্ভে আমার ঔরসে একটি পুত্র জন্মিল' অবলীলাক্রমে সে-কথা ঘোষণা করেছেন। বিবি কুলসুম যেদিন মহা ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ীর এক দাসীকে মারবার জন্য একখানা জ্বালানী কাঠের চেলা হাতে নিয়ে তাড়া করেছিলেন সেদিন নাকি, গ্রন্থকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, মীর সাহেবকে কাতর কণ্ঠে বলতে হয়েছিল, 'আমি মিথ্যাবাদী নহি' বিশ্বাসঘাতক নহি। আমি কাহারও

সহিত কোন কথা কহি নাই, কাহারও গায়ে হাত দেই নাই'। কুলসুম বিবি এক বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। মীর সাহেব তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন :

> রাত্রি বারটার পর কুলসুম বিবি লণ্ঠন লইয়া পায়খানায় গিয়াছিলেন। রাত বেশী হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট পায়খানায় না গিয়া ঘরের পিছনের দিকে একটা পড়া ঘরের খালি ভিটার উপর বসিয়াছিলেন। সম্মুখে আম বাগান, অন্য গাছগাছড়ায় সামান্য জংগল,—বসিয়া কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, জংগলের কিনারায় প্রবীণ এক ব্যাঘ্র, লাল রং তাহার উপর কাল ডোরা, মাটিতে বুক ঠেকাইয়া সম্মুখের দুই হাতা মাটিতে লাগাইতেছে, উঠাইতেছে, লেজটা পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরিয়া উচ্চে নড়াচড়া করিতেছে। বাঘের এই অবস্থা চক্ষে পড়িবামাত্র বদনা হাতে করিয়া এক দৌড়ে ঘরের বারান্দায় উঠিয়াই পড়িয়া গিয়াছেন। ঘরের মধ্যে যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা ঐ অবস্থা দেখিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। মুখে বলিলেন·· বাঘ, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। অচৈতন্য, দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছে। আমিনদ্দীন মামু সাহেব মাথায় মুখে জল দিতেছেন।...বাঘ ডাকিয়া গর্জিয়া লণ্ঠনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন সে শিকার নাই। অমনি গর্জিয়া গর্জিয়া যে ঘরে কুলসুম বিবি ছিলেন সেই ঘরের বেড়া ভাংগিতে লাগিল। হাতা মারিয়া চাটাই বাঁশ চুরমার করিতে লাগিল।...কাঁপুনি গেল না। গায়ে জ্বর আসিল, ঘন ঘন দাস্ত হইতে লাগিল। দুইদিন পর ঈশ্বর ইচ্ছায় আরোগ্য হইলেন।

২. ৭. এই বইয়ের অনেক গুণ। রচনা আন্তরিকতাপূর্ণ, তথ্যের উল্লেখ সত্যাশ্রয়ী। চরিত্রসৃষ্টির কৌশল লেখকের আয়ত্তাধীন ছিল বলে তিনি মৃত ব্যক্তিকে নবজন্ম দান করতে পেরেছিলেন। একটি বিশেষ কালের একজন কৃতী পুরুষের দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী রচনা করতে বসে মীর সাহেব একটা মৃত যুগকে চিরকালের জন্য জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন। এই বইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রৌঢ়া পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় কাতর এক প্রাচীন

পতিহৃদয়ের দুর্বার শোকোচ্ছ্বাস। গ্রন্থের সর্বত্র এই উচ্ছ্বাসের স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা কেবল ভূমিকার দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করে বিবি কুলসুমের ওপর আমাদের আলোচনা শেষ করছি :

সারাটি দিন খাটিয়া পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় যাহা দেখিয়া মনে শান্তি জন্মিত, অতুল সুখ বোধ হইত, মানসিক গ্লানি, ক্লান্তি, শ্রান্তি দূর হইত—দূর হইত যে হাসির আভা প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইত—তাহা যেন নাই। উপবেশন কক্ষ, শয়ন শয্যা, ভাণ্ডার, স্নানাগার, রন্ধনশালা—মনে মনে মনের আকর্ষণে খুঁজিয়া দেখি—যাহা আমার এই পোড়া চক্ষু দেখিতে চায় তাহা নাই। শয্যায় সে ঘ্রাণ নাই, বালিশে মণপ্রাণহারী সে ঘোর আঘ্রাণ নাই। স্বভাবতঃই দেহক্লেদে একরূপ গন্ধ আছে। সে গন্ধ পরিধেয় বসনে, বিছানার চাদরে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ নাসিকায় দুর্গন্ধ বোধ করে। কেহ নানাবিধ ফুলের, যথা— যুঁই জবার—কেহ পদ্ম কেহ নলিনী, কেহ কামিনি, কেহ রজনীগন্ধার, কেহ বা গাঁদার গন্ধের আভাস পাইয়া আত্মপ্রাণ সঁপিয়া দেয়।

আমি যে ঘ্রাণে আত্মহারা, মাতোয়ারা—যে ঘ্রাণে প্রাণ মন শীতল করিত, তাহা আর এখন পাই না। বাড়ীর সকলেই আছে, সুন্দর শ্যাম বর্ণ, কাল, একেবারে সাদা ধবধব তাহাও আছে, সকল প্রকার মুখই আছে দেখি, কিন্তু আমি যে মুখ চাই, তাহা দেখিতে পাই না। সেমুখ চাঁদ বদনী নয়—সূর্যমুখী নয়, শুকতারার ন্যায় শুভ্র নয়, অপ্সরা সদৃশ্য সুদৃশ্য কান্তি নয়, সুরপরবাসিনী সুন্দরীগণের ন্যায় মুখের অবয়ব নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গোলগাল নহে, একটু দীর্ঘ ছাঁদের, হাসিভরা মুখখানি দেখিতে চাই। সেই দীর্ঘায়তন চক্ষু দুটির স্নেহভাব, সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা, পূর্ণ চাহনি দেখিতে চাই, পাই না। কোথায় গেল! ঘরময় খুঁজি, পাই না। কোথায় গেল।

আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায় আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, আমার বহুকালের যত্নের ধন বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্টে,

বহু যন্ত্রণা যাতনা গঞ্জনা, আত্মীয়-স্বজনের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন রত্ন মাণিক যাহাই বলি—সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ 80 বৎসর পরে তাহা হারাইয়াছি।

কে হরিয়া লইল? না স্বইচ্ছায় চলিয়া গেল? না কেহ কোনরূপ কুহকজাল বিস্তার করিয়া, আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি না?.........

বিবি কুলসুম আমার জীবনের জীবনী, জীবনের জীবনী নয়ন মন-রঞ্জনী চিত্তহারিণী চিত্তাকর্ষিণী, আমার কানে মধুরভাষিণী, সুহাসিনী, আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদু:খভোগিনী, মম চক্ষে কমল সদৃশ কমলা, সরলা, সতীসাধ্বী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, দয়াবতী, সর্বকার্যে সুমতী, স্নেহবতী, সত্যপ্রিয়া, সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী, পরিচারিকা, পাচিকা, ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী, পতিগতপ্রাণা, স্বামীসোহাগিনী, প্রণয়িনী, স্বামী-প্রেমে আত্মহারা, স্বামীর গুপ্ততত্ত্ব হৃদয় অভ্যন্তরে সুরক্ষিণী, পরস্পব প্রেমানুরাগ অপ্রকাশ্য ব্যবহার, ভালবাসা, প্রেম, লিখন, পঠন, আন্তরিক যত্নে অতিগুপ্তভাবে সংরক্ষিণী জীবনের সংগিনী, পবিত্র অর্ধাংগিনী, ধর্মপত্নী, একাদশ সন্তানের জননী, আমার বুদ্ধি বিবেকে এত গুণের অধিকারিণী বিবি কুলসুম সুশ্রী ছিলেন না। তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ সুশ্রী নারী দুনিয়ায় রহিয়াছে। কিন্তু আমার চক্ষে যাহা তাহা—প্রায় সকলি বলিয়াছি।

ভূমিকার শেষাংশে, গ্রন্থের মূল্য নির্দেশের স্থলেও এ আবেগ অবদমিত থাকেনি:

এ জীবনীর মূল্য নাই, অমূল্য, প্যাকিং খরচ ডাক মাশুল বাবদ মাত্র ৶০ আনা। হাতে হাতে লইলে কিছুই খরচ নাই—

পরিশিষ্ট

এক

উদাসীন পথিকের মনের কথা

ষড়বিংশ তরঙ্গ

দৌলতন্‌নেসা

মাননীয়া দৌলতন্‌নেসা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, নাসিকা, ভ্রূ, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণীর মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাইলাম না। হয়ত এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি করিব। পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমণীকেই দৌলতন্‌নেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে? কিন্তু পথিকের চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া যদি এই তরংগ পাঠ না করেন, আক্ষেপ নাই। কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আসিয়া বিশুদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি পবিত্র সচ্চরিত্রা, দেবী সদৃশা, রমণীকুলের শিরোমণি মহোদয়াগণও রহিয়াছেন। মহামতি লেখকগণ হস্তে যিনি যে অবস্থায় যে প্রকার কল্পনার চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহারাও অনেকে রহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে, তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—পবিত্রা, অনেকেই স্বর্গীয়া রমণী সদৃশা। অনেকেই রূপে গুণে ভূবন বিখ্যাত। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বাংগিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সে কথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতন্‌নেসার রূপ যেন জগতের আরাধ্যা, পথিক চক্ষে ঐ রূপ যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং

তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন—মহা নিন্দুক, মহাপাপী বলিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনাও করিতে পারেন—করুন, পথিক তাহা সহ্য করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যাঁহার যেরূপ মনের গতি, এবং মাথার ক্ষমতা তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, কন্যা, ইঁহারা মহা পবিত্রা এবং পুণ্যবতী। দৌলতন্‌নেসা তাঁহাদের কিঙ্করীর কিঙ্করী। মুসলমান-জগৎ চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী। কিন্তু সপত্নীবাদে, হিংসার আগুনে তিনি মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই। আকারে প্রকারে হাবভাবেও কখনও সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব। আর একটি কথা।

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামান্য হাসান-হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা যিনি ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয়-দাত্রী। তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ-মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে মহা যাতনাসম্ভূত মহাবিষ সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছিল, পয়গম্বরের দুহিতা, এমামের জননী, মহাবীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বিবি হনুফার নামে জ্বলিয়া উঠিতেন।

পথিকের পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই। সে মিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের জন্যও স্বামীর মন হইতে সরিয়া যান নাই। ইহা কি কুলস্ত্রীর গৌরবের কথা নহে। উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে।

বিবি আয়েশা সিদ্দিকা হযরত মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হযরত নূর নবী মহম্মদ আয়েশা সিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সীমা, ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন

জগতে ভাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময় আয়েশা সিদ্দিকার বয়স সবে মাত্র ১৮ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সে পতি পরায়ণা, পতি-গতপ্রাণা ছিলেন। বদরুল আকবরীর যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্রী হইতে হইয়াছিল।

রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা প্রভু মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী। এক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের কার্যে ও বিশ্বাস গুণে বয়সের ন্যূনাধিক্য থাকা সত্ত্বেও যুবা মুহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সে সময় প্রভুর বয়স ২৬ বৎসর। তখনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব খণ্ডে পরিচিত হন নাই।

পথিকের পূজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া সেই স্বামী পদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কাঁদাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে।

অন্যরূপ চিত্র দেখুন! আফ্রিকা খণ্ডে নীলনদ-তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজীজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার রূপ গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী মহোদয় সহস্র মুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম জলেখা। তিনিও ধর্ম্মের মাথায় কুঠার মারিয়া পবিত্র প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, রূপে মোহিতা হইয়া, রমণীকুলে কলঙ্ক-রেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে 'হফ্‌ত খানা' (সপ্ততল বাশর) নির্ম্মাণ করিয়া নিজ মূর্ত্তিসহ মান-সান্বিত নাগরের প্রেমভাব পূর্ণ, কুরুচি সম্পন্ন নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে,প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়া ছিলেন। মহাঋষির মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি ফিরাইতে সাধ্য কার? সে চিত্রে সে ভুলিল না। জলেখা মিথ্যা ভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন—মহারত্ন...ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভারতরমণী নূরজাহান শেষে রাজরাণী। প্রথমে শের আফগানের মনো-মোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য পতিভক্তি! অনায়াসে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন! রাজদৌরাত্ম্য ভয় অবশ্য ছিল স্বীকার করি, কিন্তু স্বামী উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিতে কি সে সময় কোন উপায় ছিল না? যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক সীমন্তিনীর রূপ গুণের প্রশংসা সহস্র মুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইল। তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কিম যে চক্ষে আয়েশার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে পজিসনে তিলোত্তমার ফটো তুলিয়াছেন, যে তুলিতে কুন্দনন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন, এবং গুণাকর যে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কুভাবসম্পন্না মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু সে পজিসনে, সে তুলি, সে রুচি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্‌নেসার রূপ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা দৌলতন্‌নেসা পবিত্রা, মহাপবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্র পদই পথিকের মুক্তিপদ, পূজনীয় পদ। তুলনা করিয়াই বা আর কি দেখাইব? কাজেই নীরব। কাজেই সে কালের কথা একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনোযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুনুন।

মীর সাহেব পৈতৃক বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতন্‌নেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে স্বামী হস্তে পদসেবায় সর্বদা রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোন-রূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ্‌প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতন্‌নেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ-আহলাদেই আছেন। দৌলতন্‌-নেসার কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুরের ঝনঝনিও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা

হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি হাসি কথা।

পাড়া প্রতিবাসীরা সময় সময় অনেক অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি এক ঘরের একটি মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্বদা রংগ রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক্, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীর সাহেবের এ নিতান্তই অন্যায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড় পস্তাইবে। দৌলতন্নেসা হাসিয়া বলিতেন, বাড়ী, ঘর, টাকা কাহার? বলত বন্। আপন জীবনই যখন আপনার নয়, এ জগতই যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন গৌরব কিসের? তার পরে তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন, এত টাকা তাঁহার ছিল। না ছিল কি? সন্তান-সন্ততি পরিবার সকলই ছিল। সংসারে লোকের যাহা চাই, সকলি অতি পরিপাটিরূপে তাঁহার ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোন দিন কোন কথা মুখে আনেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বন্। তাঁহার মনে দুঃখ কত? ও গান, বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন। তাহার অসীম চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক; তাঁহার মনের দুঃখ ক্রমে উপশম হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ। প্রতিবাসীরা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত।

ত্রয়োত্রিংশ তরংগ

ঘরের কথা

মীর সাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্যে মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স

বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ আহলাদ, সর্ব্বদা হাসি খুশী, রংগ তামাসা, গান বাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনই রহিয়াছে। মনে কি আছে ঈশ্বর জানে। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পূর্ব্বে ছিল, হাবভাবে বোধ হয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে। সাধারণ চক্ষে, দশ বছর পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহা। পূর্ব্বে স্ত্রীপুত্র বিয়োগের পরে যে ভাব,—জামাই কর্ত্তৃক পৈত্রিক সম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্ত্তমান সুখ সময়েও সেই একই ভাব। মীর সাহেবের মনের ভাব সুখে দুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসির আভা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সাধারণ লোক সে কথা লইয়াও কতসময়ে কত আন্দোলন করিয়াছে। মীর সাহেব কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ, সুখে দুঃখে সমান ভাব। অন্তরের অন্তঃস্থানের ভাব অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন অন্যের জানিবার সাধ্য ছিল না। বসীরদ্দীন সাঁওতা ছাড়িয়া মীর সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চির আমোদের সহিত সংসার যাত্রা নিশ্চিন্ত ভাবে নির্বাহ করিতেন। খানসামা বিনদ বিদ্রোহী দলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে। কিন্তু পূর্ব মত আদর, ভালবাসা আর নাই। সাগোলাম এখন স্বয়ং মালিক।

মীর সাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী জিন্নাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি দৌলতন্নেসা ও তাঁহার মাতায় বর্ত্তিয়াছে বটে, কিন্তু মীর সাহেবই মালিক। মীর সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নাম মাত্র তাঁহাদের।

সাগোলাম এবং মীর সাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহিনীপাড়া এ-পাড়া ও-পাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখা শুনা হয় না। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবার্তা হয় না। উভয়ের চাকরে চাকরে, প্রজায় প্রজায়, অনুগত লোকজনের সহিত অনুগত লোকের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ, বচসা হইয়া থাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়া দাঁড়ায়। আদালত পর্য্যন্ত খবর হয়। উভয় পক্ষের লোকের জরিমানা, ফাটক হইতেছে, যাইতেছে, মিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন

ব্যক্তি মীর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার পরামর্শমত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ বাধ্য হইয়া সাগোলামের আশ্রয় লইতেছে। সাগোলাম যত্নপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এখন মীর সাহেব কেনীর পক্ষে। দেশের লোকের বিপক্ষে।

মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয়। এ কথা এত দিন চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে ঘরের কথা পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের ছিল না। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনাস্রোতে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্য্যের আদি অন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন। কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বুদ্ধিমান সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞান, বুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনাস্রোতে অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া, কত জীবন্ত জীবন ভাসাইয়া ভাসাইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কোন্ বিষাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়।

মীর সাহেব জ্ঞানবান। পারিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা শরীরের রক্ত কাহারই তরল নহে। কেহই পাতলা নহেন। নূতন সংসারী নহেন, নানা বিষয়ে পরিপক্ক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটী কাঁচা কার্য্য হইতেছে যে তাহার আভাসে ইংগিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না। সেই বামা কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুর ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলতন্নেসার কর্ণে প্রবেশ করিত, সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্ম্মগত আভ্যন্তরিক ভাব ও আভাস। দৌলতন্নেসা স্বামী-সোহাগিনী। বিশেষ, সন্তান-সন্ততি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ারই কথা। স্ত্রী-ধনে ধনবান, স্ত্রী-কল্যাণে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভাল-বাসা আছে বলিয়াই স্ত্রী-ধনে অধিকার রূপসীর সহ্য হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখী হয়। বহুদিন হইতে

চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মীর সাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ন করেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতন্‌নেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাঁহার মন স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীও জুটিয়া গেল।

দৌলতন্‌নেসা রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাঁহার সেই পূর্ব ভাব, পূর্ব কথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীর সাহেব-দৌলতন্‌নেসায় যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয়-ভাব বর্তমান তাহা ভংগ করা। সাধ্য কি? রূপসীর সাধ্য কি সে দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতন্‌নেসাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশা বৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিৎ পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই। এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারে নাই, সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক; সামান্য-ভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই। তখন ঐ সোজা পথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির উপায়। এই সিদ্ধান্তই মনে মনে আঁটিয়া আসরে নামিয়াছে। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে? অনুগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা মীর সাহেব স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করেন নাই। কোন দিন কোন সময় সে কথা ভাবিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামী-পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মীর সাহেব মনের সংগে ভালবাসিয়া, মনে মনে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম মানুষ চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয় ভাব, বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে না হইবে আশ্চর্য্য কি। তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্মভাবে আকুল নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সার। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মরিলেই ফুরাইল। হিসাব

নিকাশের ধার কে ধারে, কেই বা অদেখা ঈশ্বরকে ভয় করে এইত রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি।

বসীরদ্দীন সহচরীর অনুগত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আজ্ঞাবহ। অথচ তাহারা দৌলতন্নেসার বেতনভোগী, দৌলতন্নেসার অন্নে প্রতিপালিত। বসীরদ্দীনের অন্নের সংস্থানও দৌলতন্নেসার অর্থে —তবে মীর সাহেবের হস্তে, এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতন্নেসার খাস দাসী চার জন। তাহার এক জনের নাম সব্জা। দুর্গতী, হুরণ, নূরণ, চাম্পা। এই চারজন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তাঁহার সম্মুখে থাকিত। ফয়ফরমাস ইত্যাদি কার্য করিত। দৌলতন্নেসা ইহাদিগকে অন্য অন্য দাসী অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, বিশ্বাসও করিতেন। ইহারা চারজন বাড়ীর বাহির হইত না। সব্জা বৃদ্ধা, বাহির বাটীর মধ্যে সকল সময় সর্ববস্থানে সমান ভাবে যাওয়া আসা করিত। সব্জার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সব্জার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইয়া থাকে। এই সব্জাই সহচরীব সাহায্যকারিণী। মীর সাহেব শালঘর কুঠিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই আসিবার কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতভাবে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল। প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠক-খানার কার্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীরদ্দীন নিয়মিত চাকুরী বাঁচাইতে বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিল। মীর সাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ কি করা ? গান-বাজনা করিতে সাহস হইল না। উভয়ে তাস খেলা করিতে বসিলেন।—"শুধু বসে থাকাও ত মহা দায়। তুমি একটি গান গাও আমি আস্তে আস্তে সংগত করি।"...

"বাবা সে আমার দ্বারা এখন হইবে না। মীর সাহেব না আসিলে বৈঠকখানায়, গান বাজনা করে কার সাধ্য; এতেই সকলে চটা। বাড়ী শুদ্ধ লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবি সাহেবের জন্যই রক্ষা।

এমন মেয়ে হয় নাই। এ কালে কেউ দেখে নাই। বাপ্‌রে বাপ্‌। তারই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে?"

"সেকি আর বলতে! আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ী হতে একবার ঘুরে আসি—" স্ত্রী মূর্ত্তি দুই এক পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রী মূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রী মূর্ত্তিটা বাড়ীর লোক, বয়সও বেশী—দৌলতন্‌নেসার পরিচারিকা দুর্গতীর মাতা, নাম সব্‌জা। মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সব্‌জা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তর অঞ্চলে দাসী বিকিকিনিতে দোষ ছিল না। বাড়ীর দাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তান-সন্ততি হইয়াছে—সব্‌জার পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতন্‌নেসার চারিজন খাস পরিচারিকার মধ্যে একজন দুর্গতী।—তাহাতে সব্‌জার একটু আদরও আছে। মেয়ে মহলে সকলে একটু ভয় করে।... ... ...

"কি কৌশলে, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহা ত মনে আছে?"

"তা বেশ মনে আছে। শিকড়টাও কএক দিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। গুঁড়ো করতে আর বেশী মেহনত লাগবে না। দেখ ঐ শিকড়ের গুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পারবো না। আর যা দিয়েছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না—আমার প্রাণ থাকতে পারবো না।"

"আচ্ছা শিকড়টা গুঁড়ো করে কোন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে পারবে?"

"হঁা—পারবো। আর যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।"

"কি বলিলাম?"

"তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলিতেছি—যে দিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট চলিয়াছে, সেইদিন তোমাকে মনের মত খুসি করবো। বকশিশ ত ধরা রইল—"

সব্‌জা উঠিতে পড়িতে সাত পাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সব্‌জার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের

দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটি দ্বারে খাড়া হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

ঘরের কথা

দৌলতন্‌নেসা সেই যে পীড়িত শয্যায় পড়িয়াছেন, আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি।...অনেকেই দৌলতন্‌নেসার জীবনে নিরাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মাতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পীড়া আরোগ্য হইবে। এক ঘরের এক কন্যা, এক বংশের একটিমাত্র কন্যা। দৌলতন্‌নেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, এ কথা তাঁহার মনে একদিনের জন্যও ওঠে নাই। কিন্তু চক্ষের জলে সর্বদাই ভাসিতেছেন।...মীর-সাহেব পুরুষ, কিছুদিন স্ত্রী-বিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে। কিন্তু মুন্‌সীর বিবির আর কল্যাণ নাই। ভালাই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়। হায়। ছোট দুটি ছেলেরই বা কি দশা হইবে। হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়;—ছয় মাস যায়, পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি! কি ভয়ানক বিষয়। উহু বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অংগ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থান পর্যন্ত আঘাত লাগে। হায় রে হিংসা। হায় রে আমোদ। নর্ত্তকীসহ একত্র আমোদ। আজ দৌলতন্‌নেসার নাড়ী পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া মলিন বদনে বাহিরে আসিলেন। মীর সাহেব কবিরাজদিগের হাবভাব দেখিয়া বুঝিয়া, অবস্থা শুনিয়া সজল নয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সে জ্বলন্ত জ্যোতিঃপূর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গতকল্য যাহা ছিল তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিত লোচনে খরতর জ্যোতিঃর অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আজ তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। পদতলে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটি পুত্র তাহারা অতি

শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শোনা যাইতেছে। মীর সাহেব অনেকক্ষণ সহধর্মিণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন বোধ হয়।

দৌলতন্‌নেসা কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশে তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্র দ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুই হাতে ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীর সাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইলেন। কোন দিন কোন লোকে যে চক্ষে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীর সাহেবের চক্ষে অবিশ্রাম জলধারা পতন দেখিল।...

মীর সাহেবের অভিমতে তাঁহার পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতন্‌-নেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সাগোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতার বাড়ীঘর, জমিদারী সে সময় সকলি সাগোলামের। মীব সাহেবের কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতন্‌নেসার সমাধি সাঁওতায় হইতে সাগোলাম কোনো আপত্তি কবিলেন না। এত দিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবে না। তবে তাহার পরিণামফল পারিণামফলেব সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছে রহিল।

দুই।

আমার জীবনী। প্রথম খণ্ড। স্বত্বাধিকারী শ্রী মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক গ্রন্থিত। কলিকাতা, ৩৬ নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী—মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত। ১৩১৫ সাল, ১লা আশ্বিন। কলিকাতা, ১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 'কলিকাতা যন্ত্রে' শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটী কথা।

১। আমার জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ৮ পেজী ডিমাই চার ফর্ম্মা মাসে মাসে অথবা মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে।
২। প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্ম্মা আমার জীবনী থাকিবে। অপর ফর্ম্মায় 'গাজীমিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। আমার জীবনীর সহিত 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র শেষ অংশের বিশেষ সংশ্রব আছে—... ... ...
১০ ।-------।

বিনয়াবনত—···।

আমার আত্মকথা। প্রার্থনা।

হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর। সর্বনিয়ন্তা জগৎপিতা, সর্বময় সৃষ্টিকর্ত্তা এলাহি। তোমার অনন্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সষ্টাংগে প্রণিপাত সহিত তোমারই সহায়ে 'আমার জীবনী' জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভু, সহায় হও। সত্য তত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে লিখনি সংকোচিত কর। সদাসর্বদা পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।---দয়াময়। 'এসলামের জয়' প্রকাশ আশা পূর্ণ করিয়াছ। 'হজরত ইউসোফ, যন্ত্রস্থ—শেষ আশাই—'আমার জীবনী'—করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি অধমের মনের আশা পূর্ণ করিও।

মাননীয় পাঠকগণ সমীপে

প্রিয় পাঠকগণ। 'আমার জীবনী' প্রকাশ কথা হঠাৎ মনে হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। এ সংকল্প বহুদিনের। এ আশা একযুগেরও অধিককালের। কাল চক্রে----চক্রে অবস্থার গতিকে, আজ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশা পথে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন----প্রমাণ। ''উদাসীন পথিকের মনের কথা'' পুস্তকে দ্বিতীয় তরংগে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন। কি লিখা আছে। বাংলা ১২৯৭ সালে আমার জীবনীর বিষয় আলোচনা হইয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন। আজ কোন্ দিন? ১লা আশ্বিন ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৯ বৎসর পূর্বের সঙ্কল্প।.........

আমার জীবনে শত শত ত্রুটি শত শত জাহেলী (মূর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব। আর, একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি। আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্ববসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অবিকল বাংলা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি কঠোরতায় কেহ শুনিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব।

১ উপক্রমণিকা।

আমার জীবনী।

আমি কে?

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম কিছুই হইল না,—আভাস ইংগিতেও কিছু

বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জনমানবহীন বিজন বনে, কত দিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশীথ সময়ে নির্জন গৃহে, শয়ন শয্যায়, দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে, নির্জ্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরনদী তটে, বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি,—জানিতে পারিলাম না—আমি কে? - - - - - -

২ মাথা একটি। মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়। - - -

৩ হাত পা আছে—অকর্ম্মার এক শেষ। মসজিদে যাইতে কষ্ট বোধ হয়। - - -

কর্ণ মহোদয়.........সৎ কথা সৎ উপদেশ...চাহেন না...মনের কথা আর কি বলিব। সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।...

কম নহে, বাল্য জীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুনাইব। সংগে সংগে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব।......

সত্যাশ্রয়ে সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেশ্য। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির সংকল্প।.......

৪ ...লোকাচারে যাহা বলে—পুরুষানুক্রমে লৌকিক আচারে ব্যবহারে কথায়, লিখিত পুস্তকে, কুরসীনামায়, গভর্ণমেণ্টের আপিসে আদালতে, ফরিদপুর সব জজ আদালতে ১৯০৬ সালের ৩৯ নং মকদ্দমায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্য দেহের মীমাংসা করিতেছি আমি কে?...

২১ চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় বৃটিশ রাজ সরকারী গেজেটে ১৯০০ খৃ: ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন?

২২ দুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন,...রংগপুর অঞ্চলের কোন ছায়া অবলম্বন করিয়া গাম্বিমিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের পত্রিকা প্রদীপে ..।

৯৪ লাহিনী পাড়ার বাটির পশ্চিম-দ্বারী বৃহৎ ঘর, যে ঘরে আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী শয়ন করিতেন। সেই ঘরে আমার জাতঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যত ভাই-ভগ্নি—ঐ এক ঘরেই সকলের জন্ম, সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় লেখা আছে।...

৯৫ সংস্কৃত কয়েকটি বচন সহ এবং জ্যোতিষি পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ করিব।...সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বাংলা অক্ষরে কম্পোজ করা কঠিন বলিয়াই এবার হইল না, আগামীতে চেষ্টা করিব। যদি বলেন, এরূপ জন্ম-পত্রিকা হইবার কারণ কি?

৯৬ খাঁটি মুসলমান গৃহে এরূপ ঘটিবার কারণ কি? ৬০ বৎসর পূর্বেব বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল, তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি... ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য। জাতীয় ভাব রক্ষায় অমনোযোগী। এ সকল ঘটিবার কারণ? বিধর্মীদিগের প্রবল পরাক্রম, ধন-গৌরব, শাসন, বিচার, রাজ্য-বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মুসলমান শূন্য। যাঁহাদের দ্বারা এ সকল স্থান অলঙ্কৃত, তাঁহারা দেখিতেও ভাল—ক্ষমতাও কম নহে।—তাঁহাদের বাক্স, সিন্দুক টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। বিজাতীয় ভাষার কল্যাণে রাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব, কাজেই নির্জীব নিরক্ষর বঙ্গীয় মুসলমানগণ অনেক কার্যে তাহাদের আদর্শ...। অনেক বড় বড় জমিদার, ধনী মুসলমান,—জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে...দু'দশ হাজার বাহবা গ্রহণ...।

লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে, বাটীর আংগিনার মধ্যে ঘর...আমার জন্ম হয়।

৯৭ আমার যে সময় জন্ম হয়---সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না।---শিশু সন্তান-দিগের জন্য পেচাপেঁচি নির্দ্ধারিত ভূত। জাতঘরে তাহাদেরই

অধিকার, আধিপত্য। জাতঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে আগুন জ্বলিত। শুকন কাষ্ঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ক্ষণকালের জন্য আগুন নিবিবে না। বারান্দার এক পার্শ্বে চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া দিবারাত্র কোরাণ শরীফ পাঠ...। জন্মের পরক্ষণেই সাতবার আজান...। প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস যে আযানের আওয়াজ যতদূর বাতাসে লইয়া যায়, কি স্থির বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ততদূর ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য, দানো, জেন-পরি, অধিকন্তু শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার পরেও বাড়ীর সীমার মধ্যে উচ্চ বংশখণ্ডে গরুর মাথা—মুড়া ঝাঁটা, বাড়ন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। জাতঘরের দরওয়াজার এক পার্শ্বে গরুর মাথা, গোহাড়, কাঁটা, কুমড়ার ডাটা সহ পাতা কপাটের গায়ে চৌকাঠের সংগে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৯৮ জাতঘরের কপাট, জানালার ফাঁক, বেড়ার ছিদ্র—যেখানে যতটুকু ছিল তাহাও বন্ধ করা হইয়াছিল---। বাতাসও যাইবে না। তাহার পর জাতঘরে সমস্ত রাত্রি যে প্রদীপ জ্বলিবে, সে প্রদীপের রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে। এ সকল আয়োজন কেবল পেঁচাপেঁচির ভয়ে।---। পাঁচ দিন গত হইল ষষ্ঠির রাত্র। ---ছয় কুলার রাত্র কহে।---সেই রাত্রে ঘর-দ্বার বন্দ হওয়ার পূর্বে ---ভাল কলম, দোত, কালি, সাদা কাগজ, একখানা কলম কাটা ছুরি, এই কয়েকটা জিনিষ অগ্রে যত্নপূর্বক এক পাত্রে করিয়া অন্য কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর (সরস্বতীর বিদ্যার) ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠি সড়কী তরবার ইত্যাদি শিশুর শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে---ইহাই আশা।

৯৯ ---আকিকা---। কোরবানী।---তাহার মাংস, হাড় হইতে এমনভাবে ছাড়াইয়া লইতে হয় যে হাড়ে আঘাত না লাগে, দাগ না বসে, ভাঙ্গিবার ত কথাই নাই।---

১০২ পিতামাতার খাওয়া নিষেধ।---গাজীর গান হইয়াছিল।---চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি)

১০৩ হইয়াছিল।---প্রবাদ ছিল মুন্সী সাহেব হাতে খড়ি দিলে তাহার দারগাগিরী চাকুরী না হইয়া যায় না। মুন্সী সাহেব বাঙ্গলার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। সে সময়ে বাংলা পত্র, কথাবার্তার ভাষায়---অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লিখা হইত। খত্ পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই।---

১০৪ মুন্সী সাহেবরা বাংলার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমা খরচ, বাকীজায়, দাখিলালিখা, চিঠি পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত।---

১০৫ এক বৎসরের মধ্যেই কোরাণ শরীফের প্রথম পারা (অধ্যায়ের) তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করা শেষ করিলাম। অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুনসী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে?---

পাঠশালায় আসিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া জোরে জোরে কবিতা পড়িতাম, পাঠশালার ছুটীর পূর্বে আমরা সকলে কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম, নন্দী মহাশয় পড়াইতেন।

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
স্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণ,
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ। (ইত্যাদি)

মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম যে কলমটি কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাধিয়া উঠে, বাধিয়া উঠিলেই মহা পণ্ডিত হইব।..গলা টান করিয়া মাথা পিঠের দিকে নিচু করিয়া রাখিতাম যে কলম কপাল হইতে ছুটকিয়া না পড়ে।...

১০৯ কেনী বলিলেন—মীর সাহেব! আপনি আমাদের অর্থাৎ একা আমার নহে সমুদয় ইংরেজ জাতির হিতৈষী। বিশেষ আমরা যে কয়েকজন নীলকুঠি করিয়া এদেশে বাস করিতেছি, আপনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্খী। যথাসাধ্য আমরা সকলে আপনার উপকার, সাহায্য করিতে সর্ববতোভাবে বাধ্য। যে প্রকার সাহায্য আপনি চাহিতেছেন, আমরা করিতেছি। আমি যতদিন বাঁচিব, করিব। আমাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস---আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য উপকার করিবেন। আমাদের নীলকরদিগের---এমন কি ১১১ বৃটিশ জাতের হিত ভিন্ন কখনই অহিতের দিকে অগ্রসর হইবেন না। এই সকল ভাবিয়া···আপনার বড় পুত্রকে---বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান।--- আপনার একটি পয়সা খরচ লাগিবে না। যাওয়া আসার খরচ----থাকার খরচ, পড়ার খরচ সমুদয় আমি দিব।···চার বৎসর মন বেঁধে ছেলেকে আমার কন্যাদের সহিত বিলাত পাঠান। ··

[এই খণ্ডের শেষে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে: মুনসী সাদেক আলীর সহিত আমার জীবনীর কোন সংশ্রব রহিল না। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মীর মহবুব হোসেন---প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন।]

পঞ্চম খণ্ড। ১৩১৫ মাঘ॥

১১২ আমার জীবনীর পাঠক কে?

এইক্ষণে সেই অসীম শক্তিধর জয় জগদীশ নাম করিয়া আপাতত: ১২ খণ্ডে শেষ করিতে পারিলেই লজ্জার দায় হইতে

রক্ষা পাই। ভবিষ্যত অন্য চিন্তা---অন্য বন্দোবস্ত।---শুধু অমুক তারিখে মরিলাম ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয়না। আর সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ চরিত্র কার্যদক্ষতা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়---সরল, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দীপক বেহাগ ললিত, ভৈরবী রাগের গান,---চৌতাল ধামাল ধ্রুপদ, আড়াঠেকা বাজনার সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবনীর ন্যায় জড়িত জীবনী এ পর্য্যন্ত কাহার শুনি নাই---দেখি নাই। ---হইতে পারেন তাঁহারা স্বর্গীয় দেবতা, হইতে পারে তাহারা···কিন্তু...

১১৩ কবীরের বচনের সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি জগতে আসিয়া কেহই অক্ষত শরীরে বাহির হইতে পারেন নাই। কিছু না কিছু ক্ষত হইয়াছে, আর না হয় কিঞ্চিৎ দাগ লাগিয়াছে। আমার জীবনীর---দাগ ধরা,---যাঁহার জীবনী তিনি অক্ষতশরীরে বাহির হইতে পারিবেন না। কারণ তিনি পুণ্যাত্মা নহেন---মহাপাপী। পাপীর জীবন কাহিনী শুনিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে না।···তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। কেহ পাঠ না করিলেও আমরা দুঃখিত নহি।...আর কিছু না হউক, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের বিশেষ কার্য্যে আসিবে। আমার জীবন কাহিনী শুনিয়া কেহ সতর্কও হইতে পারেন··আমার জীবনীর পাঠক কে?---লোক দেখিতে পাই না। প্রমাণ? অধিকাংশ গ্রাহকই নীরব।

১২০ (মা বাবাকে বলছেন) আপনার নিখুঁত কুলে এক হাজার টাকার লোভে কালি মাখাইবেন না। আপনি নাদের হোসেন মুনসীকে জানেন?--- মীর সাহেব আলীর ফেল্ জামিনের মকদ্দমায় যে এক বৎসরের ফাটক হইয়াছিল, মীর সাহেব আলীই আমার নিকট বলিয়াছেন, নাজীর নাদের হোসেন আমার পায়ে বেড়ি না দিয়া লোহার কড়া পরাইয়া দিলেন। নাদের হোসেন যশহরের নাজীর ছিল, সেই সময় গরীবপুরের ফকীর মামুদ

তফরদারের কন্যাকে বিবাহ করে। সেই ফকীর মামুদের নাতিই নাদের হোসেনের পুত্র।—আপনাদের মেয়েকে তরফদারের নাত বৌ করিবেন না। ...দেওয়ার চাইতে বিষ খাওয়াইয়া মেয়েটিকে দুনিয়া হইতে তফাৎ করা ভাল। তৃতীয় মাসে সাম্‌সন্‌নেসার জ্বর ..বিবাহ কথা ফুরাইল।

পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত।...দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম অংশই চিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল... (নীল বিদ্রোহ) .. নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিশ রাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক উদাসীন পথিকের মনের কথা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ত্রুটি, ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটা-ইলেন, উত্তরাধিকারীরাও যে ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসত্ত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নিমক এখনও খাইতেছেন সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতফোঁড়---যে পাতে খান সে পাতই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।...

১২৩ (বাবার উক্তি:)...তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এদেশে থাকিবে। হ্যাঁ, নীলকাজ বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এদেশে থাকিবে। আপনারা যে এক জোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নীল নাও হতে পারে, নীলকর সাহেবরাও আর নীল বুনানী করবেন না। তাঁদের যা কিছু

করা——এই দেশের লোক যারাই করেন।…অন্য কারবার আরম্ভ করবেন। আপনারা যে তাহাদিগকে এ দেশ হতে তাড়াতে ফিকির করছেন তাহা কখনই পারবেন না। নীল না হয় তার যে উপায় থাকে করুন আমি তার মধ্যে আছি। কিন্তু নীলকর ইংরেজ তাড়ান মধ্যে আমি নাই।…

১২৪ এক বৎসর খাঁটিয়া মীর সাহেব আলী এইক্ষণে নীলবিদ্রোহী সময়ে প্রজার দলে মিশিয়াছেন। সাগোলামাজ্জমও প্রজার দলে… কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশে দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। জমিদারেরাই প্রজার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য হওয়াতেই যেন তাঁহাদের আর্ত্তনাদ পরম কারুণিক দয়াময় জগদীশ্বর ইংরেজ নীলকরকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।… প্রজা জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, কত অপমান ভোগ করিয়াছেন, তাহা উদাসীন

১৩৩ পথিক দেখাইয়াছেন।…দৌরাত্ম, অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত না পোঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয় হয় না। প্রজা নীলকুঠির দৌরাত্ম সহ্য করিতে না পারিয়া জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যও করিল----সফলকামও হইল। সমুদয় নীলকুঠি দেউলিয়া----ঋণদায় জমিদারী দালান কোঠা খরিদ করিয়া লইলেন।

১৩৪ নীল বিদ্রোহের পরেই আমার পূজনীয়া জননীর পীড়া। বৎসরকাল …ভোগ করিয়া- - -দেহত্যাগ- - -আমার বয়স ১৪ বৎসর- - -মহ্তেসামের ৪- - -বজলাল হোসেনের- - -দেড়- - -।

- - -সেতার বাদ্য মধ্যে আমার পিতা——বোল বাজাইতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। [বেলগাছির জমিদার] করিমবক্স চৌধুরী সাহেব গত্ বাজাইতে ওস্তাদ ছিলেন।- - -যেদিন কন্যা মরিয়াছেন----কন্যার দাফন কাফন শেষ করিয়া আসিয়াই [পিতা] সেতার লইয়া বসিয়া ছলেন, সারাটি রাত্রি সেতার বাজাইয়াছিলেন।- - -অনবরত দুই চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া বুক বহিয়া পড়িতেছে।- - -

১৩৫ মাতার মৃত্যু দিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।---পিতাও চক্ষের
১৩৬ জল ফেলিতে ফেলিতে, কতক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন।—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই, অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি।---তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই আস নাই। আমিও আমার মনের বলে—আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে---মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।---

ষষ্ঠ খণ্ড। ১৩১৫ ফাল্গুন।

১৪৫ ---পিতা নীরবে দুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন, চক্ষে জলধারা।

১৫১ ...আমাদের দেশের লোকে সে সময়ে সাহেবের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত।---দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে মেড়ুয়াবাদী এক জাতি আছে। তাহারা সকলেই নৌকায় থাকে, নৌকায় শিল পাটা তিশি গম, পাথুরিয়া চুন বোঝাই করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লইয়া যায়।---গৌর নদী হইয়া বহরে বহরে নৌকা যাইত।---মেড়ুয়াবাদী অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় নৌকার বহর উজান মুখে চলিলে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। স্ত্রীলোকের ঘাটে যাওয়া বন্ধ হইত।—

১৬৪ এখন আর আমি বালক নহি—যুবক। বিদ্যাশিক্ষা এখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে।---কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে, বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিডী মিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ্ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা যে ইংরেজী পড়িলে, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়,

অবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথায় চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...

১৬৫ এই সময় আমার কার্য্য বাংলা চিঠিপত্র আর বাঙ্গলার হেঁয়ালী লিখা। আমার প্রথম হেঁয়ালী যথা—

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবংগের বংগ ফেলে
বেছে বেছে খা।।

---ফারসী বিদ্যা---অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি পদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুনসীজিকে সংগে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিষ্য অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।—

১৬৯ পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।

সপ্তম খণ্ড। ১৩১৫ চৈত্র।

১৭৮ যৌবন জোয়ারারম্ভ।

প্রথম প্রবাস।

১৮০ পিতার সংগে পদমদী---। চন্দন নগীতে নবাব মীর মহম্মদ আলী---বৈমাত্র মাতামহী---। যেমন আমরা বলি দেখ নাই, পদমীর লোকে বলে দেহ নাই। ঘোড়াকে বলে গোরা, ঘর স্থানে ঘড়, আবার খর স্থানে খড়। ভাই স্থানে বাই, চক্ষে দেখ না—চহি দেহ না, ভাত-বাত, নারকেল-নারেল, বেল—ব্যাল, তেল—ত্যাল, এইরূপ কাপর, মুরি, ছেরা—নানা কথার পরিবর্তন ভাব দেখিলাম।

১৮১ ...নবাব সাহেব খুব ভালবাসিতেন।... পূজনীয় পিতার সহিত নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করেন।...গান বাজনার মজলিস প্রায়ই হইত...যাওয়ার অধিকার ছিল না। গোপনে দালানের অন্য কক্ষে থাকিয়া...শুনিতাম। স্ত্রীলোকেরা নাচ করিত তাহাও গোপনে গোপনে দেখিতাম।

১৮২ (নবাব বিরোধী মাতামহীর উক্তি)

১৮৮ একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি। আহারান্তে নবাব সাহেব তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বাঁটিতে লাগিলেন।...কি একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক পিছনের কামরা হইতে আসিয়া নবাবের বাম দিকে ঘেঁসিয়া বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফেটিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। কারণ নবাব সাহেব গুরুজন, তাহার পর স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরূপ একত্র এক বিছানায় কখনও বসি নাই।......প্রাণ কাঁপিতে লাগিল।...[নবাব সাহেব]—খেল। দোষ কি? আমার সংগে খেলা করিবে তাতে কোন কথা নাই। তবে নিতান্ত ছোট লোক নীচজাতি বদলোকের সঙ্গে খেলা করা, তা যে খেলাই হউক, এমনকি, বসা-ওঠা নিতান্তই অন্যায়। খেলা করা দেল বহলান ইহাতে কোন দোষ নাই। জানত. খেল।......

৮৯ ...সে খেলাও আবার বিবি ধরা।—এক দুই করিয়া ৭ বার··

৯১ বিবি ধরিলাম।

৯২ ......বাইজি খেমটাওলীদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে।—নবাবই আলাপ...করিতেছেন।

৯৫ ...কোন কথা নাই...তবু ভয়। নির্দ্দোষ হৃদয় সদাসর্বদা নির্ভয়, সুস্থ ও সবল। সেই বজরায় যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েক দিন তাস খেলা করিয়াছি, তাহার চক্ষে চক্ষু মিলাইয়াছি ম৩রটান সেও দেখাইয়াছে, আমিও দেখাইয়াছি। কপাল কুঞ্চনও তাহাই। সময় সময় খেলার

ভাবে নয় বাঁকা—ভ্রূ বাঁকা সেও দেখাইয়াছে আমিও বাধ্য হইয়া দেখাইয়াছি। ঈষৎ হাস্যভাব দুইয়ের দেখাদেখি হইয়াছে। মুচকি হাসি তাহাও ঐ খেলার জন্য, এক কথায় দুই অর্থ—প্রকাশ্য আর গুপ্ত তাস নিক্ষেপ চটাপটী—বল পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে মনে নানা ভাবের উদয় হইয়াছে।....

১৯৭ বাইজীর হাত পা নাড়া, চোখ্ ঠারা, মাথা কাঁপান, দেহ দোলান বক্ষস্পন্দন, কটিচালন যাহাকে নাচ বলে, তাহা দেখিলাম... ।

২০৯ অষ্টম খণ্ড। ১৩১৬ বৈশাখ।

মাষ্টার বাবু বলি এখন দেখুন চন্দ্রপীড় শব্দ—। আমি ছোট পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিলাম,—কাদম্বরী, আর পুস্তকের নাম পড়িয়া দেখিলাম শব্দার্থ প্রকাশিকা। ...চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম

২১০ ...পদমদী অঞ্চলে চিরকাল বাঘ শূকরের ভয়। যে সময়ের কথা সে সময়ে শূকর অপেক্ষা বাঘের ভয় বেশী ছিল।...খরা-পাতিয়া শ্রীকণ্ঠ মাছ ধরিতেছিল...বাঘ ...

২১৫ এই অঞ্চলে তিন প্রকারে বাঘ মারে। ১। বাঁশপাতা ফাঁদ ২। খোঁয়াড় ৩। তীর পাতিয়া।

২৪৪ নবম খণ্ড। ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

...যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনি যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন?...সতীনের যন্ত্রণার আগুনে পী পয়গম্বরের মেয়েরা পর্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারেখারে গিয়াছেন আমরা ত কোন ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জ্বলিয়া ছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা ••?

২৫৭ [কলিকাতা অভিযান]

২৬৪ ...পদমদী যাইয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। নূতন স্কুলে প্রথ শ্রেণীতে... ।

দশম খণ্ড। ১৩১৬ আষাঢ়।

২৭৪ মাষ্টার বাবু প্রতি রাত্রেই নবাবের মজলিসে আসিতেন; গান করিতেন, তাস খেলিতেন, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া থাকিতেন।...অতি
২৭৫ গুপ্তস্থানে বসিয়া আমোদ আহলাদ নাচগান, রগড় রহস্য দেখিতাম। মনোমোহিনীর শয়ন শয্যায় এক পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া প্রমোদ কুঠুরীর সমুদয় অবস্থা দেখিতাম। এই তাস খেলার ফল ভবিষ্যতে মহা বিষময় ফলিল।...সর্ব্বদা মেলামেশার গুণ অতি চমৎকার। নিজে ভুগিয়া ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বুঝিলাম, সর্ব্বদা মেলামেশা একত্র বসা-উঠা, একত্র আহার ইত্যাদি কার্যে যাহাদের সহিত একত্র মেশা যায়, অর্থাৎ যে মিশিতে যায় সে যদি কাঁচা মন, কচি মাথা, দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া মিশিতে যায়—তবে সে পাকা মন, সুদৃঢ় মস্তক এবং সবল হৃদয়ের অনেক গুণ মস্তকের বহু ভাব, পাকা মনের অনেক গুণ সঞ্চয় করিতে পারে।...পাকা পোক্তর কিছু হয় না, মরণ হয় কাঁচার।...

২৭৯ হল কামরায় প্রায়ই বাতি থাকে না।...থাকিলেও এক কোণে সামান্য।...ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই এক প্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই মোলায়েম সুগন্ধিযুক্ত গণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমার হাতে কয়েকটি পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিওনা, সব খাইবে। বেত লাগাব। আমি দেখিব। ওখানে বসিলেই দেখিতে পাইব, তুমি ফেলিয়া দিয়াছ কিনা।

২৮১ অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে এরূপ হইল যে আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে। একটি বৎসর এইভাবে...। পিতৃদেবের আদেশ কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়।

২৮২ বগুলা ষ্টেশনে...কুলি-মজুর, সইস-কোচম্যান মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আমি ত অবাক যে এই সকল লোক এত ভাল কথা বলে।

আমাদিগকে যে কথা সন্ধান, তালাস, খুঁজিয়া মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতঃই অনর্গল বলিয়া যাইতেছে।—এতই মিষ্ট ..এত মর্যাদাপূর্ণ .. ।

২৮৫ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাংলা তেমনই লালিত্যপূর্ণ। তেমনি কণ্ঠস্বর রসপোরা।

২৮৬ কলেজে ভর্তি হইলাম। কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে। কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরব মাত্র নাই। হিন্দু-প্রধান দেশ। ধূতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়নী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাসানেবাল করিলাম। হায় হায়। বাউরী চুল কাটিয়া থাক থাক করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগে সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপিটাও ক'দিন পর সহপাঠিরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। পরণ পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী। চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা—সামসদ্দীন, সতীশ। নাজমাল হক, নজু! বোরহান, বিরু। লতীফ, লতু। মশাররফ, মশা। দায়েম দাঁ৭। মেহদি, মাদি। ফজলল করিম, ফড়িং। এই প্রকার নামে ডাকা হয়।—তেল মাখিয়া বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া হয়। ভিজে কাপড়ে বাসায় আসিয়া কাপড় বদলাইতে হয়।—

২৮৯ একবার কলিকাতায় গেলে মুন্সী নাদের হোসেন পুত্র কারাম মণ্ডলা ওরফে চাঁদ মিয়াঁর সহিত দেখা।—

২৯৫ ইতিমধ্যে নাজির সাহেব আসিয়া ..বলিলেন...আমার বাসা এখানেই আছে, কারাম মণ্ডলাও কালীঘাটের স্কুলে পড়ে, আমার

ইচ্ছা যে আপনিও আমার এই বাসায় থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ুন। আপনার বাবার নিকট আমি লিখিয়া পাঠাইতেছি।..

একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড। ১৩১৬ ফাগুন।

বিজ্ঞাপন।

আমার জীবনী দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ হইয়া আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল।..

আমার নিবেদন

আমি এইক্ষণে জিয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া আছি। দুঃখের কথা কি বলিব, বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার জীবনের জীবনী প্রিয়তমা সহধর্মিনী বিবি কুলসুম পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি আছি এইমাত্র বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার উৎসাহ যত্ন বাসনা সাধ কিছুই নাই। এই সকল কারণে জীবনী প্রকাশে আরও বিলম্ব হইল। আমার দুঃখে যদি কেহ দুঃখ বোধ করেন, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বিবি কুলসুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

অধুনা—জীবন্মৃত
মীর মশাররফ হোসেন
পদমদী। ১০৩

বিদায়।

চির বিদায় নহে। কিছু দিনের জন্য বিদায়।...পূর্বে কত কথা, কত মধু বোল, ১৷০ আনা দিবার বেলায় গোল বাধিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঐ খরচায় বার সংখ্যা দিব। বাধ্য হইয়া প্রকাশে বাধ্য হইলাম।..এই বার সংখ্যা জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারিভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল। অদ্য পর্য্যন্ত (১৩১৬ সালের ভাদ্র মাস) ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাকি রহিল।..

১৩১৬ সন
১লা ফাল্গুন।

বিনয়াবনত—
জীবনী লেখক।

৩০৬ কলেজ এক মাসের জন্য বন্ধ হইল। চাকরটীকে সংগে করিয়া বাড়ীতে আসিলাম. চিকণ ধুতি পরিয়া কোঁচ ঝুলাইয়া সীতি কাটিয়া খোলা মাথায় জীবনে তাঁহার (পিতার) সম্মুখে যাই নাই। এই প্রথম গমন।…কৃষ্ণনগরের কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিনদ সেখ দ্বারা তোমার খাওয়ার জন্য গোমা সের ঝরি পোরা সমশ পিঠে,—আর মুরগীর ডিম যাহা পাঠান হইয়াছিল তোমার বাসায় লইয়া যাইতেই নাকি অনেক ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।…হঁা, তাহারা সকলেই খায়।…হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন রূপই ভিন্ন ভেদ মনে করে না। আমাদের দেশের মত নহে। পিতা বলিলেন আমি বড়ই খুশী হইলাম। হিন্দু মুসলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখের মত আর কোন সুখ নাই। কলিকাতা হইতে নাজীর সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, তোমাকেও তাঁহার বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন। সমুদয় খরচপত্র তিনি দিবেন।··

৩০৯ ..লেখাপড়া'র নাম কাহারও মুখে শুনিনা।..চাঁদমিয়ার মুখেও না। ..কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জ্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন।—আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রীবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আঘ্রাণ মনমজান, প্রাণমাতান ভাব দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী পূজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহরাত্মা।

৩১০ আমার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া বহুক্ষণ যাদু আমার পিছনে লাগিয়াই আছে। যাদু গ্রাম্য লোক, নিরক্ষর নাজির সাহেবের খানসামা, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি কিছু কিছু আছে। সে একটানা... ।

৩১২ ...বড় বিবি যেমন খাপসুরাত তেমনি দেখিতে, আপনার সংগে এমনি মানাইবে যে খোদাতালা যেন দুইজনকে জোড়া মিল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। নাজির সাহেবের তিন মেয়ে—বড় মেয়ের নাম লতিফন, আর মেজটার নাম আজীজন। দুইটির বিবাহই হইবে। লতিফন বিবি ভারী খাপসুরাত,—বগা সুন্দর নয়। মেজেটা বগ ধবধবে সুন্দর।...বড়বিবি...লিখাপড়াতেও তেমনি ভাল। হেরাসতুল্লা মামুজী লিখাপড়া শিখিয়েছেন। মেজটাও পড়ত কিন্তু সে এক বছরে কখগঘ পড়তে পারলেনা। হরফ কয়েকটা চিন্তে পাল্লে না। কখ দুই অক্ষর চিন্তে পারে—লিখতে পারে—কেবল ক। লতীফন বিবি অনেক পড়েছে।... রাতদিন লেখাপড়া নিয়েই আছে। গায়ের রং দুধে আলতা মিশান, চক্ষু দু'টী মোটা কিন্তু লম্বা ছন্দ। ভ্রূ দু'টি ভারী খাপসুরাত। হায়রে চুল; যেমনই চুলের গোছা তেমনি লম্বা পিঠ ছেয়ে মাজা পাছা ঢেকে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত পড়েছে। শরীরের আণ্ডেট কাকে দেখাই, আপনাকে বোঝাই কাকে দেখিয়ে। মানানসই লম্বা, বেঁটে নহে। এমন কোন পুতস্তের পুত নাই, কি কোন মেয়েমানুষ নাই, যে লতীফন বিবির চোখ মুখ নাক হাত পায়ে একটা খুঁত বাহির করিতে পারে। সেলাইয়ের কাজ, উলের কাজ খুব ভাল জানে।

৩১৩ ঘুম হইল না।...ক্রমে চক্ষু নাসিকা বদন বক্ষ হস্তপদ সমুদয় অংগ প্রত্যংগ এমন কি সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশকলাপ ক্রমে হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিতে যুগল আঁখিদ্বয়ের কৃষ্ণরেখা সংযুক্ত নীলাভ তারা দুটি যেন ফুটিয়া আমার হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

৩১৫ আমি সুখী হইব কিনা কোন পক্ষই দেখিতেছেন না। নাজীর সাহেব টাকাকড়ি না দিয়া তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের একটি ছেলেকে ফাঁদে আটকাইতে পারিলেই তাঁহার আশা পূর্ণ।....আমি এখন বিবাহ না করিয়াই বা কি করি?...

৩১ - (যাদু:) হুজুর কাল রাত্রে আমাদের সকল চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে তোমরা মীর সাহেবকে কেহই মীর সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারিবা না। বড় দুলামিয়াঁ বলিয়া ডাকিও আজ হইতে আপনি আমাদের বড় দুলামিয়াঁ।...

৩১৯ যদিও বিবাহ হইতে এখনও তিন মাস বিলম্ব...মুক্তারপুর চলিয়া যান।...

৩২৫ আমি শুইলাম। চাদর খানা পরিষ্কার—ধুইয়া আইসার পর আর ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু বালিশটা খাঁটি নয়। বালিশের খোল ধবধবে। কিন্তু কাহার যেন মাথার নীচে ছিল। স্ত্রীলোকের মাথার সুঘ্রাণ তেলের অতি উত্তম ঘ্রাণ...ভাবিলাম, এ কার বালিশ আমাকে মাথায় দিতে দিয়াছে ? কর্ত্রীর বালিশ ?

৩২৬ তাহা দিবে না। তাঁর মাথার চুলের গন্ধ এরূপ সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে না। ফজলেহক মিয়াঁর স্ত্রীর বালিশ। তাও নহে, তিনি শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়াছেন, অমনি মাথার বালিশটি ছাড়িয়া দিয়াছেন অসম্ভব। ফজলেহক মিয়াঁর মধ্যম ভগ্নি, সে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাইবে কেন ? তাহার নিদ্রা ভংগ করিবে কেন? বাড়ীর লোকেও জানে পূর্ব হইতেই চিঠিপত্র আসিয়াছে, খবরাখবর হইয়াছে—সকলে জানে আসিতেছে।—যার যেখানে ব্যথা সেখানেই তার হাত। বালিশ আর কাহার নহে...

৩৩০ যে মুখ খানি খুব ফুটফুটে সুন্দর, দুই ঠোঁটের দুই দিক বহিয়া পানের লালা পড়িয়া রক্ত হইয়াছে, দূর হইতে মুখের কেত ভালরূপ দেখা গেল না, তত্রাচ যাহা নজরে পড়িল—নাক যেন একেবারেই নাই। মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত তিনিই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, আর হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছেন...। (যাদু :—) ছেলে মানুষের মত তাঁহার ব্যবহার নহে, তাঁহার ভাবি সাহেব তাহার চাইতে বয়সে বেশী কিন্তু বুদ্ধি

বিবেচনায় একেবারে হালকা, বড়ই হালকা. ভারিত্ব নাই। বড় বুবুজানের মত ধীর গম্ভীর নহেন। ভাবি সাহেব বড়ই হাস্-কুটে..আর বড় বুবুজান, বাবা। তাঁহার মাতা এই সকল দেখে মেয়েকে ভয় করেন।...সামান্য কথায় যেমন শাজিলা বুবুজানেরা হাসিয়া কুটীকুটী হন, বড় বুবুজান তেমন নহেন।...যেদিন আমরা এসেছি তার পরদিনই...বড়মিয়াঁ আপনার কষ্টের কথা, পায়ে ফোস্কার কথা, সারাটা দিন না খাওয়ার কথা যখন তাঁহার মায়ের কাছে বলিলেন, তখন মা বিবি ত খুব আপসোস কর্ত্তে লাগলেন......।

৩৩২ মেজ বুবুজান··হেসে আটখানা হলেন। বড় বুবুজান...হাসলেন না। উঠে চলে গেলেন। ভাবি সাহেব কত টাট্টা বিদ্রূপ করলেন। আর বেশী হাসি হয়েছিল আপনার শোবার বালিশ লইয়া। মেজ বুবুজান শুয়ে শুয়ে কেচ্ছা শুনিতেছিলেন। চাহিলে বলিলেন আমার বালিশ কেউ নিও না, বলিয়াই বালিশের উপর বসিয়া রহিলেন। তাহার পর মা বিবি ভাবি সাহেবের নিকট..চাহিলেন যে বাহিরের একটা ভদ্র সন্তান আসিয়াছে তোমার মাথার বালিশই হউক, কি অন্য একটা বালিশ দাও। আমার .আছে কিন্তু বড়ই ময়লা---। ভাবি সাহেব বলিলেন, আমার বালিশের ওয়ার ময়লা। আজ আবার তিনি আসিয়াছেন তাহার জন্য একটিমাত্র ফরসা ওয়ারের, বলেন ত সেইটাই দিই। মা বিবি··· ভাব বুঝিয়া বড় বুবুজানকে জানাইলেন।···বাক্স খুলিয়া নূতন ধোয়া চাদর, আর আপন মাথার বালিশ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন।...নূতন ওয়ার বাক্স হইতে বাহির করিয়া আরেক বালিশে পরাইয়া নিজে রাখিলেন···। মা বিবি বড় বুবুজানের কথায় কার্য্যে কোন কথা কহেন না। তিনি জানেন বড়মিয়াঁ অপেক্ষা, বড় বুবুজানের বুদ্ধি বেশী। নাজির সাহেবও সময় সময় বলিতেন যে লতিফনের বুদ্ধি বিবেচনা ফজলে-হকের নাই, বিদ্যাও নাই, কি করিব। বুবুজান নিজের মাথার বালিশ...। আমি ভাবিলাম নূতন ওয়ার বাহির বাটীতে আপনার

জন্য দিবেন। আমি পূর্ব্ব বালিশ হাতে করিয়া ভাবিতেছি। কি করি, বেশী কথা বলিলে তিনি চটিয়া যান, কি করি? আমি বিলম্ব করিতেই আমাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিশ বিছানা লইয়া যা—আমি কেবল বলিয়াছি, ঐ বালিশ? আর যাবে কোথা? আগুন হয়ে বলে উঠলেন—তোর বালিশ। না আমার? তোর সে কথায় কাজ কিরে গোলাম...। আমি বলি...তাঁহার হাতের লেখা আমাকে দেখাতে পার।..পরদিন যাদু আমার পা টিপিতে আসিয়া একখানা টুকরা কাগজ আমার বালিশের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল।·· অক্ষরগুলি পরিষ্কার গোটা গোটা জড়ান নহে।---"কাকে বিষ্ঠা খায়—অনর্থক ডাকে। পেটে কিছু রাখে না। ছোট লোক মূর্খ যা ইচ্ছে তাই খায় পেটে রাখে না। কথা ভাল, কিন্তু সমাজ ভেদে দোষ-গুণের প্রভেদ। মূর্খের দলে বদনাম। ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শয্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের আশা। যেখানেই পাইবেন, সেখানেই রাখিবেন। পাইব।—

কেহ নয়।
কালি কলম।"

৩৩৫ (লতীফন বিবি যাদুকে:)---যা। এখন যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা। তিনি যখন চাহেন নাই তোকে দিব কেন? আর তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। এসেছেন বিদেশে, পরের বাড়ীতে আপন দোত কলম লিখার সরঞ্জাম ছেড়ে এলেন কেন?---এ বাড়ীতে যে লিখা পড়ার নাম নাই---তিনি জানেন না? আমি দিব না। কখনই দিন না। চলে যা, কিছু পাবি না।---ফজলেহক---বলিলেন ---আপনার লিখাপড়া করা অভ্যাস---লতীফনের কাছে ভাল ভাল বাংলা কেতাব আছে, তাহা দেবে না। কেতাব কাহাকেও দেয় না।---

৩৩৭ "---আপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বিদেশ, আপন লোক কেহই সঙ্গে নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই—সকলেই

পর—এ কয়েকটা কথা মন হইতে চিরকালের জন্য দূর করিবেন। এখানে সকলই আপনার, পর কেহই নাই। আপনার জীবনের সঙ্গিনী আপনার সুখ দুঃখের ভাগিনী যে, সেই এখানে আছে। জগতে এমন মায়া মমতা—এরূপ ভালবাসা, সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই ও হইবে না—সেই এ বাড়িতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ—বহুকালের কথা। আপনার নিকটে বলিতে লজ্জা হয়—'সবুরে মেওয়া ফলে'। আপনার উপরে—আপনার হস্তে যে আত্মমন, দেহ, জাতী কুল, মানমর্য্যাদা সমর্পণ করিবে সেই

৩৩৮ এখানে আছে।—প্রতিদিন এক পথে বেড়াবেন না। এই গ্রামে আবাল বৃদ্ধ সকলেই আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে পান, সেখানেই রাখিবেন।

আপনারই

ন"

- - -লিখিলাম—

"প্রথম ছত্রে 'প্র৷' লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর—'প' লিখিয়া কাটিয়াছেন। আমার মন সন্দেহ যুক্ত নয়, খাঁটী মন। যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি, ঠিক করিতে পারিলাম না।- - -আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে? পিতামাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন।- - -ভাঙ্গিয়া দেন- - -। এই যে এক ভয়ানক প্রথা—ইহার জন্যই আমার প্রাণ সর্বদা কাঁদে।

তোমারই আমি।"

৩৩৯ রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল, যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।...

মধ্যম কন্যার বিবাহ জন্যেও ঘটক ছুটাছুটি করিতেছে।..... পানীসারা গ্রামে মীর হোসেন আলীর সহিত মধ্যম কন্যার বিবাহ স্থির হইল।---সকলেই বলে মধ্যম কন্যাটা হাবা—এক প্রকার পাগল। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, মনে হিংসা পোরা, দেখিতে খুব সুন্দরী—অর্থাৎ গায়ের রং খুব পরিষ্কার সাদা ধবধবে। বেআক্কেল—পশুর সমান।---

৩৪২ বালিশ উঠাইয়া চাদর উঠাইতেই দেখি---প্রথম লিখা আছে, মাথা খাও পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি ভাবে পড়িও না—আজ মন খুলিয়া লিখিলাম। আর শীঘ্র লিখিব না।—দুইবার পড়িও।

"ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমি তোমার তুমি আমার। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। ধর্ম্ম সূত্রে বাঁধা পড়ি নাই, তুমিও বাঁধা পড় নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় ভালরূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি। তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ জগতে থাকিতে তুমি অন্য কাহারও হইতে পার না। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি স্থির করিয়াছি, তোমায় ছাড়া আমিও অন্য কাহারও হইতে পারি না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল খাঁটী এবং বলবত। আমার কথা উলট পালট করিবার সাধ্য কাহারও নাই। "যদি" কথায় যেমন কথায় বাধা পড়ে, "কিন্তু" কথায় কথাটা উলটাইয়া দেয়। তোমার আমার কথায় যদিও "যদি"ও বসিতে পারে না, "কিন্তু"ও আসিতে পারে না। তত্রাচ বলিয়া রাখি। তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও, দাসীর এই ভিক্ষা।

তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয় আমাকে বামে বসাইতে তোমার সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা—ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা—জীবনেও তুমি জীবনান্তেও—তুমি আমার

—মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়ে শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও তুমি আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমি আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ। তাহা বলিতে পার। কারণ আমি তোমাকে প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখি। যখনি দেখি, বোধ হয় তুমি যেন
২৪৩ কি ভাবিতেছ। তুমি পুরুষ তোমার ভাবনা কিসের। আর যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভুল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে জানাইও। আমিও ভাবিব। কারণ আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। ধর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও কেন? আমি কি তোমার মনের মধ্যে আঁকা নাই? যে চক্ষে দেখিতে চাও সে চক্ষের উপরে শূন্যভাবে আমার ছায়া সর্ববদা তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে। তোমার থাকিবে না কেন।"

৩৪৪ [আজ বুধবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বিয়ে হবে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯মে ১৮৬৫। গায়েহলুদ আচারাদি প্রসংগে লতীফনের নির্দেশ ছিল কেউ যেন মীর সাহেবকে অনাত্মীয়ের মতো এই আচারের বাইরে ফেলে না রাখে।
৩৪৯ লতীফনের মাতার অনুরোধে মীর সাহেব অন্দর মহলে গেলেন]...আমার সম্মুখে দেয়ালে একখানা বৃহৎ আয়না টাংগানো আছে—দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটে বারান্দায় একটি কামরা বোধ হয় দুই হাত ব্যবধান···। দ্বারে বৃহৎ একখানি পর্দ্দা ঝুলিতেছে... মাথা তুলিয়া নিজের ছায়া সম্মুখের দর্পণে দেখিতেছি,...আমার পিছনের দ্বার কপাট বন্ধ। আরসীতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ঝিলিমিলি আছে, বন্ধ করা। পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল... মা...করিতেছেন।...
৩৫২ পর্দ্দার ভিতর হইতে চিঠি পড়া শেষ হইল। কে পড়িল বুঝিতে পারিলাম না।—"—তোমার মা নাই—তুমি আমার পেটের

২৫৪ সন্তান তুল্য।" আমার চক্ষে জল আসিল।—ফজলেহক মিয়া আমার কথা শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার গমন দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণের দিকে আমার নজর পড়িতেই, অপরূপ এক নারীমূর্ত্তির ছায়া নজরে পড়িল। পিছনের সে খড়খড়িযুক্ত কপাট সরিয়া গিয়াছে। ঠিক চৌকাট নিকটে যুবতী যেন আমার পশ্চাৎদিকে দাঁড়াইয়াছে। অতি শুভ্র একখানা রুমাল দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল—চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অংকিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণ মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ঈষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসি নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। আমার মুখের উপর চক্ষু পড়িয়াই আছে। আমি সময় সময় মুখ হইতে পদতল পর্য্যন্ত একবার চক্ষু ফিরাইয়া আবার সেই মুখখানির প্রতি চাহিতেছি। প্রতিমা ঘরের দেবীদিগের চক্ষুভাব যেরূপ স্থির, ধীর—এও সেই প্রকার। আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি। আর কথা কহিতেছি।

আমি এমনি হতভাগ্য যে আমার স্ত্রীকে আমি একখানা সামান্য চিরুণী পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ায় দেখিতেছি, যুবতী দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেছে, সেই তর্জ্জনী অংগুলী ললাটে স্পর্শ করিল। তখনি উভয় হস্ত উভয় পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া অতি মোলায়েমের সঙ্গে সুচিক্কণ রেশমী বসনে আবৃত বক্ষঃস্থলে বামহস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া আমার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল। পর্দ্দার মধ্য হইতে বলিতেছেন ··

৩৫৫ এদিকে আমি আমার দুই হস্ত উঠাইয়া আমার হৃদয়োপরি চাপিয়া ধরিলাম, একটু পরেই দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দর্পণস্থ ছায়াকেই বক্ষের ধন অর্পণ করিলাম।...পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল । দেখিতেছি দর্পণের ছায়া যেন সরিতেছে। বিবাহের চিহ্ন—হাতে সূত্র বাঁধা—হাতে একখানা পত্র খামে মোড়া ..আঁটা। ছায়া যেন ক্রমেই অগ্রসর..একেবারে আমার পৃষ্ঠে তাহার বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম ভাবে স্পর্শ করিল, অতিব্রস্তে বাহুদ্বয় দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া পত্র আমার সম্মুখে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। আর দক্ষিণ দিকে ঘাড় নোওয়াইয়া আমার কানে ২ তিনটি কথা বলিয়াই প্রস্থান, চাহিয়া দেখি, দর্পণে চাহিয়া দেখি আমার পশ্চাদ্‌দিকের দ্বার বন্ধ।...

৩৫৬ আহা যে সময় তাহার সুকোমল হস্তদ্বয় দ্বারা বাঁধিয়া এক হাত আমার কান্দের উপর, অন্য হাত দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আমার বক্ষোপরি উভয় হাতের সম্মিলন করিয়া মাথা নোওয়াইয়া রেশমী ফুলদার বসন সজ্জিত বক্ষ আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া সুগন্ধিপূর্ণ অনুরাগ রঞ্জিত মুখখানি আমার কানের সহিত সংযোগ করিয়া যাহা বলিবার বলিল । মাথার কেশগুচ্ছ সেই বালিশের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, সমুদয় শেষ, দ্বার বন্ধ। এ কি ঘটিল।

...."স্বামীন। আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকারেই বিবাহ সিদ্ধ হয় দুইজন সাক্ষীর দরকার আর একটা প্রধান কথা মোহরআনা। ..শুক্রবার অবশ্যই হইবে। বিবাহ কথায় সকলেই খুসী হয় । আমার যদিও পূর্ব্বে একভাব ছিল, গতরাত্র হইতে আর একভাব হইয়াছে। কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন।..

৩৫৭ স্বপ্ন সকল মিথ্যা বলি কোন সাহসে? আমার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন। আমার জন্য ভাবিও না। তোমার জন্যই আমার বেশী

ভাবনা তোমার নিকট আমার কোন কথাও গোপনীয় নাই। গোপনীয় ভাব নাই।..কেবল লোকাচার আচার ব্যবহার কয়েকটি কাজ বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার। আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্থ হও, এ কথা আমার প্রাণে সহিবে না। তোমার জন্য আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর কি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বনে জংগলে ঘুরিয়া বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রিয় প্রাণ! প্রাণের ভালবাসা স্বামী। গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার আমার বিবাহ হইতেছে। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া ..। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন ব্যাঘ্র আসিয়া এক লম্ফে আমার ঘাড় ভাংগিয়া লইয়া গেল। তুমি বাঘের পিছনে ২ দৌড়িয়াছ। বাঘ যেন শেষে মানব রূপ ধারণ করিল। কদাকার ভযানক মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশীথ রাত্রে তুমি যে গান করিয়া থাক বাড়ীর লোক কেউ জানে না। কেহ শুনিতে পায় না। যে সময়ে তুমি গান কর সে সময় কাহারও চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি।... তোমার কামরা আর আমার শয়ন কক্ষ অতি নিকট তাহা তুমি জান না।

"স্বপ্নে দেখা দিয়ে আজি প্রভাতেতে কান্দাইলে" গানের শেষ চরণ..ঘুম ভাংগিয়া গেল। তুমি নিশ্চয়ই জানিও আমার মন ডাকিয়া বলিতেছে আমাদের কপালে সুখ নাই। চারিদিকে বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ হয়---কোন ভয়ের কারণ নাই। তুমি সাবধানে থাকিও হঠাৎ পাগলের মত কোন কার্য করিও না। সত্যই যদি আমাকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার জন্য উতলা হইও না। এই আমার অনুরোধ। মংগলমতে বিবাহ শুক্রবার গত না হইলে আমি বিবাহের বসন ভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর সাজিয়া বাহির বার দিও।

তোমার চিরসংগিনী

স্ত্রী

পুনঃ আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকি, তুমি আমাকে দেখ নাই। উপায় করিব বলিয়াছিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিছু করিতে হয় নাই, পিতার পত্রই তাহার মূল। মাতার আন্তরিক যত্নেই আমার প্রতিজ্ঞা সফল।"

৩৬০ শুক্রবার...।

৩৬১ ২য় বর বয়সে প্রবীণ, দাড়ী গোপ মাথার চুল সমুদয় সাদা। মাঝে মাঝে এক আধটি কাল চুল, পূর্বে যে কাল ছিল তারই প্রমাণ করিতেছে। দাঁতগুলি যাহা ছিল তাহার মধ্যে অনেকেই নাই, কিন্তু সম্মুখের দু'টি দাঁতের মধ্যে একটি একেবারেই নাই, ২য়টি তামার তারের বাঁধন ছাঁদনে অন্য দাঁতের সংগে পেঁচাও বন্ধনে এক প্রকার খাড়া দেখায় বটে কিন্তু কথার আঘাতে বাতাসের ঘায়ে অস্থির। যেন পড় পড় বোধ হয়। বুক হইতে পেট পর্যন্ত বেহদ্দ মোটা—গায়ের কাপড় পেটের উপর ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। •• একটী স্ত্রী...তাহার পর 'খাদেমা' একজন আছেন। বয়স তো 'আল্লা হাফেজ'···।

৩৬২ বড় বরের বিবাহ মন্ত্র পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি সে সময় আমিনদ্দীন মামা সাহেবকে দেখিয়া অস্থির চিত্তে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছি। তিনিও কাঁদিতেছেন। আমি আমার মামাকে দেখিয়া অন্যমনস্ক। আমার কানে পাত্রী নাম যেন উকিলে বলিল— লতীফননেসা- - -শুনিয়া যেন শুনিলাম না। হোসেন আলীর সহিত—লতিফনের নাম কেন হইল?—উকিল সাক্ষী পড়াইতে আসিলেন।—স্বীকার উক্তি অম্লান চিত্তে মুখে উচ্চারণ করিলাম। পাত্রীর নাম তারা উলট পালট করিবেন, তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই।—নামের সময় আজীজননেসা শুনিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া বালিশে মাথা ঠেকাইয়া রহিলাম।—

৩৬৪ ওদিকে বাড়ীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল। ডাক্তার আনিতে তখনিই দুই তিন দিকে লোক ছুটিল।—কে বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে।...

৩৬৬ পিতা বলিয়া দিয়াছেন...আমার অমতে বিবাহ। আমি
৩৬৭ সেখানে যাইব না। পুত্র-বধুর মুখ দেখিব না।....মাতামহী বলিয়াছেন...আমি তাহাকে ঘরে আনিব। বাজার হইতে অস্থান কুস্থান যেখান হইতে যে জাতীয় মেয়ে সে ভালবাসিয়া স্ত্রী বলিয়া আনিবে আমি তাহাকে আদর যত্ন করিব ভালবাসিব।...বিবাহের পর মুখ-দর্শন স্ত্রী-আচার হয় নাই। ..শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্র ১১টার সময় বাড়ীর মধ্যে আবার সোরগোল হাংগামা...শেষে শুনিলাম বড় জামাই বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া বসিয়াছেন পর্দ্দার আড়ালে পাত্রী ··পাত্রীর মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিলেন···দাতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে,নিশ্বাস বন্ধ...জামাই বাবু ঐ অবস্থা দেখিয়া... বাহিরে...আসিয়াছেন।···শেষে বলিলেন, উপরি ভাব হইয়াছে। হয় জেন নয় ভূতের আসর হইয়াছে। আমার বাটীতে দুই দিনের জন্য লইয়া যাই—কবিরাজ দ্বারা ভুতুড়ে রোজার দ্বারা ইহার দাওয়াই জড়িবুটী মন্ত্র তন্ত্র তাবিজ না করিয়া দিলে আরাম হইবে না।···

৩৭২ বড় বিবি 'এজেন' দেন নাই। সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ নারাজিতে বিবাহ হইয়াছে। ··

৩৭৬ ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিল ঐ আইনার মধ্যে নজর করুন। নজর করিতেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ··থাকিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিলাম।... ··কলিজার কাঁপনি...। গৌরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ও ওষ্ঠ চিবুক নিতান্তই কদাকার নাসিকা এক প্রকার নাই বলিলেও হয়, ভ্রূর রেখা আছে মাত্র।···চক্ষু মুদ্রিত সুতরাং চক্ষের ভাব দেখিতে আমার ভাগ্য হইল না।...দয়াময় আমার কপালে ইহাই ছিল। ··

৩৭৭ আমি তন্ত্র মন্ত্রের বড়ই ভক্ত ছিলাম। ভুত নামান, তুড়মি খেলা, সাপ ধরা ইত্যাদি কার্য্য আমি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম।... যাহারা ঐ সকল মন্ত্রেতন্ত্রের বলে

যাদু ইত্যাদির খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, বুদ্ধি শক্তির চালনা ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও হয়,
৩৭৮ তাঁহারা মনে মনে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমি একজন মহা গুণিন। যাদুমন্ত্রে মহাপণ্ডিত।...

৩৮২ বড় বিবির পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক অধিক পরিমাণে বেশী হইয়াছে। অধিকন্তু জ্বর, পেটের বেদনা, বাঁচাই মুস্কিল।...

৩৮৩ আজ আবার বাটীর মধ্যে চলিলাম।...

৩৮৪ বিছানা বালিশ নিতান্তই অপরিষ্কার। সমুদয় ঘরে আবর্জ্জনা ছড়ান। এখানে আগুনের ছাই, ওখানে পোড়া কাষ্ঠ খণ্ড কয়লা মুখে করিয়া পড়িয়া আছে। জল খাবার গ্লাস, অন্য ২ খাদ্যের জন্য থালা বাটী যাহা ঘরে আসিয়াছে তাহাও স্থানে স্থানে কোনটা সোজা ভাবে....কোনটা কলসীর সম্মুখে কতক স্থান জলে ডুবিয়া আছে। দুই তিনটা পাটী কটু ভাবে...কোন স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে.. আগুনের তাওয়ার.. ছাই... জলপোরা নারকলী হুকা গড়াইয়া...দুর্গন্ধময়...কলকেটি ছুটিয়া দুহাত তফাতে.. হুক গুল.. কেহ আহার করিয়াছে.. উচ্ছিষ্ট এঁটো ভাত...কাঁটা, চিংড়ির ঠেং, বেগুনের ডাটা, অর্দ্ধপেসিত লংকার খোসা, দুই একটা বীজ সহ ঐ ভাতের মধ্যে পড়িয়া লাল, লোহিত, পীত, হরিত রঙ্গের বাহার দিতেছে। .. রোগীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে...ধাক্কা লাগিয়া তেলের বাটি অর্দ্ধ চক্রাকারে .. দুইটি মুরগী তাওয়ায় বসিয়া আপন আপন আণ্ডায় তা দিতেছে।... কোণেই ভাঙ্গা ইট, গুড়া সুরকির এক গাদা...। (আমি:) "..ঘর পরিষ্কার হইতে থাকুক..."—

৩৮৬ (বিকারের ঘোরে লতীফন:) "...সেই দুপারে আমি কিছু খাব না তবু জোর করে কাল আলকাতরা মাখা খানিক কি যেন জোর করে আমার মুখের মধ্যে দিয়া মুখ চাপিয়ে ধরেছিল... প্রাণ

যায়। নিশ্বাস ফেলিতে পারিনা। কি করি ওগো আমার প্রাণ যায় কি করি। দায় ঠেকিয়া গিলিলাম। গন্ধ এমন দুর্গন্ধ যে আর বলতে পারি না। আমাকে অষুধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ছেলে কোলে করে সেই মীরের আসল বিবি চুপি চুপি আসিয়া বলে গেল আপনি কল্লেন কি? চামচিকা আর কাকলাস পোড়ান, হাড় বাছা লবণতেল মাখান চাটনী—আর তোমার বঁচওয়া নাই।... তোমার মরণ হবে। তিন সপ্তাহ মধ্যে তুমি মরে যাবে।···

৩৮৮ এ বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার এই ঘরের বিছানা, আবর্জ্জনা ময়লা কাহারও চক্ষে পলনা। দুর্গন্ধ...কথাটা কই কাহার মাথায় আসিল না?···(হঠাৎ মাথার উপর আমার দক্ষিণ হাতের কফিণ ধরিয়া—) এ কে? আমার মাথায় গোলাপ দিচ্ছে।··· ভগ্নি। যিনি আমার ব্যারাম আরাম করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তিনি কৈ? এখন তাঁহাকে দেখিতে আমার কোন বাধা নাই। দুইদিন পরেই বুঝিবে।···তুমি?...এখন আমি তোমার ভগ্নি।...তুমি আমার ভাই। যদি যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে··· পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পার...।"

৩৮৯ আমি চিকিৎসা করি। আহার ঔষধ ব্যবস্থা সমুদয় আমার আদেশের উপর নির্ভর।···আমার পড়া তেল [মাথায়] দিবেন...।

৩৯৭ যে মুখে কখনও হাসি দেখি নাই একটু হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন—তুমি পড়িয়া দিয়াছ? কাহার নামে পড়িয়াছ! আমি তখন তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে বসিয়া মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে দেখি তিনি ঘুমিয়া গিয়াছেন।...ঘর হইতে বাহির হইতেই, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—দেখ! তোমার নিকট আমার বলিবার কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করিও তোমার মুখখানি মনে করিতে করিতে যেন আমার মৃত্যু হয়।··· আমার অন্তিম সময় না দেখিয়া এখান হইতে যাইও না।' তুমিও কি এদের সংগে পাগল হইয়াছ। ভুত-প্রেত আমার ব্যারাম ভাল

করিবে? না তুমি ভাল করিতে পার? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমার মনে সম্ভ্রম লজ্জা কিছুই নাই। আমার কথায় আশ্চর্যবোধ কর না। আমার জীবন যৌবন প্রাণ সকলি তোমাকে দিয়া বসিয়াছি,...আর কোন ভাবনা আমার নাই। সময়ে আরো কয়েকটি কথা বলিব। শুনেছি ভূতুড়ে কবিরাজ এসেছে সন্ধ্যার পর ভূত আনিবে। সে সময়ে তুমি সেখানে থেক।...মনের একটা সাধ ছিল,—সরে এস, কানে কানে বলি। মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিব।...তুমিই আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী ...।

৩৯১ সন্ধ্যার পর ফুল পাতা ভূত আনা।...

৩৯২ গুপ্তভাবে আমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়াছে।... আমার সহিত ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে সংমিলন হওয়ায় আমাদের বিদ্যার নিয়মানুসারে...বিধি অনুসারে আমি তাহাদের যাহা, তাহারাও আমার তাহা ...প্রকাশ্যে লোকে যাহাই দেখুক। আর যাহাই বুঝুক।...

৩৯৭ কথা বলা দীপও দপ করিয়া নিবিয়া যাওয়া, ভূতেরও প্রস্থান—আমি ছাড়া সকলেই হতজ্ঞান।...

৩৯৯ লতিফন বিবি তার মাতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। কখনও জ্ঞান, কখনও অজ্ঞান, সকলের চক্ষুই জলপূর্ণ...লতীফন বিবি বলিতেছেন...মা।... আমি চলিলাম, আমাকে তার মুখখানি দেখাও। মরিবার সময় আরামে মরিতে পারিব।...মা... কৈ? তোমরা কেহই ছোট দুলা মিয়াঁকে ডাকিলে না?...

৩৯৯ লতিফন বিবি জিহবা বাহির করিয়া জলের সংকেত করিতেই...তুমি
৪০০ আসিয়াছ? দেও জল দেও, আমার মুখে উঠাইয়া দেও, কোন লজ্জা নাই। আমি জগৎ ছাড়িয়াছি, কাহার ভয়?...

৪০১ তুমি আমাকে যত চিঠি লিখিয়াছ সমুদায় একত্র করিয়া কাপড়ে মুড়িয়া তাবিজ করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর এই বক্ষের উপরে ঝুলাইয়া

রাখিতাম ···আমার লিখা পত্র তোমার নিকট···যত্নেই আছে আমি জানি। যদি তোমার ভাগ্যে কখনও ভালবাসা বুদ্ধিমতি স্ত্রী হয়··· তাহাকে আমার ঐগুলি পড়িয়া শুনাইও।—মা! দোহাই তোমার ধর্ম্মের! তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি দোহাই তোমার খোদা রসুলের মিথ্যা বলিও না। মামু হেরাসতুল্যা দোহাই আপনার মাতা-পিতার, আপনি সাক্ষী, ভাই উকিল, মাতা আমার নিকট বসিয়া, হাসান আলীর সহিত বিবাহ, আমি এজেন দিয়াছিলাম, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম? আপনারা কি আমার উক্তি লইয়া উকীল হইয়া ছিলেন ?...বলুন যদি ধর্ম্ম মানেন।...আমি স্বীকার হই নাই।...

৪০৩ মা! আজিজন সহিত আমার স্বামীর বিবাহ দিয়াছ? বিবাহ দিয়াছ সে নামের বিবাহ। আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইতে পারে না। হারাম্ হারাম্ আমি মরিব কিন্তু—আজিজন কখনই সুখী হইবে না। হইতে পারে না।—

৪০৫ আমি তোমার। সকলি তোমার। আমার মরা লাশ অন্য কাহাকেও দেখিতে দিও না। তুমি দেখিও কারণ তুমি আমার ভাই। প্রাণের ভাই।---এস এগুয়ে এস, সময় হইয়াছে ;—যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি—তোমার জানুর উপর মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা,...স্বামী! প্রাণের স্বামী! আমি চলিলাম।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লা। পড়িতে পড়িতে চক্ষু তারা নামিল।—মুখ বিকৃত হইল না। মাত্র ঠোঁট দুখানি একটু তর তর করিয়া নড়িয়া উঠিল।—

মৃতদেহের গোর করণ সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইল না, লতিফন যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহা সকলই সম্পন্ন হইল।—